গল্পে

# শ্রীশ্রীচণ্ডী



স্বামী যুক্তানন্দ

# গল্পে
# শ্রীশ্রী চণ্ডী



স্বামী যুক্তানন্দ

# GALPE SRI SRI CHANDI
## —SWAMI YUKTANANDA


ISBN : 978-93-84965-19-8

প্রকাশক :
স্বামী সারস্বতানন্দ
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
২১১, রাসবিহারী এভিনিউ
বালিগঞ্জ, কোলকাতা-৭০০ ০১৯

প্রথম প্রকাশ : শ্রীশ্রীমহালয়া-১৪১৪

দ্বিতীয় প্রকাশ : শ্রীশ্রীবাসন্তী দুর্গাপূজা-১৪২১

মুদ্রণ সংখ্যা – ২০০০

মূল্য : ৫০.০০ টাকা

মুদ্রক :
শ্রীসুমিত সরকার
ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা-৭০০ ০০৯



আচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ
প্রতিষ্ঠাতা - ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

# উৎসর্গ

যিনি
সম্যক্ শক্তির
মূর্ত বিগ্রহ; জাতিকে
দ্রঢ়িষ্ঠ-বলিষ্ঠ-বীর্যবান করতে—
যিনি শক্তি-সাধনার প্রবর্তন করেছেন,
বলেছেন সঙ্ঘবদ্ধ হতে, শক্তিশালী হতে,
মহাশক্তিস্বরূপিণী মা দুর্গার শক্তিতে শক্তিমান হতে;—
যিনি হিন্দুকে শিখিয়েছেন দেবীকে শক্তির
উপচারে আরাধনা করতে;—
শক্তিবাদের সেই শ্রেষ্ঠ যুগ-
পুরুষের শ্রীচরণে
প্রণতি নিবেদন
করে বলি—

ওঁ ধর্মরাজ্য স্থাপকায় শিব-শক্তি স্বরূপিণে।
আচার্যাণাং বরিষ্ঠায় প্রণবানন্দায় তে নমঃ।।

আর তাঁরই ইচ্ছায়, তাঁরই কৃপায় ও
তাঁরই শক্তিতে রচিত এই
গ্রন্থখানি অর্পণ করি
তাঁরই রাতুল
শ্রীচরণে—
ইতি
দীন সন্তান

ওঁ

# আশীর্বাদ

হিন্দুদের নিকট শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতই অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ আরো একটি শাস্ত্রগ্রন্থের নাম 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'। গ্রন্থটিতে বর্ণিত সর্বশক্তিস্বরূপিণী দেবতাদের দুর্গতিহারিণী জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা কিভাবে অসুরদের বিনষ্ট করে জগতে শান্তি স্থাপন করেছেন তেমন কথা যেমন আমাদের আকৃষ্ট করে, তেমনি কিভাবে মায়ের সাধনা ও আরাধনা করে সাধক অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভ করতে পারেন সে কথাতেও আমরা আকৃষ্ট হই।

হিন্দুর নিকট অতি পবিত্র এই শাস্ত্রগ্রন্থের উপাখ্যানগুলি নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার করুণায় আমার স্নেহাস্পদ স্বামী যুক্তানন্দ "গল্পে শ্রীশ্রীচণ্ডী" রচনা করেছে জেনে সুখী হলাম। গ্রন্থটি পাঠক সাধারণের নিকট জনপ্রিয় হবে—এমন আশা রাখি।

সর্বশক্তিমান শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীজগন্মাতা গ্রন্থকারের শিরে স্বতঃ আশীর্বাদ বর্ষণ করুন—এই প্রার্থনা তাঁদের শ্রীচরণে।

ইতি

নিত্যশুভানুধ্যায়ী

স্বামী [illegible signature]

সভাপতি

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

তাং - ১৩/০৯/২০০৭

নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

# নিবেদন

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী যুক্তানন্দজী "গল্পে শ্রীশ্রীচণ্ডী" নামক নতুন গ্রন্থটি আমাদের উপহার দিয়ে সকলের ধন্যবাদার্হ হলেন। তিনি যে পৌরাণিক ও ধর্মীয় আখ্যান-উপাখ্যান নিয়ে সহজবোধ্য ও তথ্যপূর্ণ আলোচনার দ্বারা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন মানুষের মন-প্রাণকে সমৃদ্ধ করতে উৎসাহী তার পরিচয় আমরা তাঁর পূর্ব-রচিত কয়েকটি গ্রন্থে পেয়েছি। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বিষয়বস্তুর অবতারণার ফাঁকে ফাঁকে অনেক উপাদেয় কাহিনী বিবৃত হয়েছে, যেখানে আমাদের মাতৃদেবতার নানা মাহাত্ম্য উদ্ভাবিত হয়েছে, সেগুলিকে সহজ ভাষায় ও সুললিত ভঙ্গীতে এমন ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে যা সকল শ্রেণীর পাঠককে আকর্ষণ করে।

শ্রীশ্রীচণ্ডী ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের, বিশেষভাবে বঙ্গপ্রদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ—যা অন্যত্র দুর্গাসপ্তশতী নামে বেশী প্রসিদ্ধ। কিন্তু গ্রন্থনামের পার্থক্য বা বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রীশ্রীচণ্ডীর সংস্করণগুলির মধ্যে পাঠভেদ যা কিছু থাক না কেন, শ্রীশ্রীচণ্ডী হিন্দুধর্মের সর্বমান্য গ্রন্থ। এখানে ভগবতী দুর্গার কৃপাকে সুন্দর ইতিহাসের সাথে মিশ্রিত করে অনেক গূঢ় সাধন-রহস্য বর্ণিত হয়েছে। কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সঙ্গমে যে মন্দাকিনীধারার উৎপত্তি তা নিয়ে যে দুর্গামাহাত্ম্য শ্রুতিসুখকর শ্লোক সমূহের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, তা ভক্তদের কাছে বাঞ্ছাকল্পতরু- স্বরূপ। সকাম ও নিষ্কাম উভয় প্রকার ভক্তই এই দেববন্দিত গ্রন্থটি পাঠ ক'রে যথাক্রমে মনের অভীষ্ট ও দুর্লভতম বস্তু এবং দুর্লভ মোক্ষ লাভ ক'রে কৃতার্থ হন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে যে পরমেশ্বরী মহামায়ার দেবীলীলা বর্ণিত হয়েছে, তাঁকে আরাধনা করলে আরাধনাকারীকে তিনি ভোগ্যবস্তু, স্বর্গ ও অপবর্গ অর্থাৎ পুনর্জন্মরহিত মোক্ষ সব কিছুই দান করেন। মহর্ষি মেধসের পরামর্শে ঐশ্বর্যকামী রাজা সুরথ দেবীর আরাধনা করে অখণ্ড সাম্রাজ্য লাভ করেছিলেন ; আর বৈরাগ্যবান্ সমাধি নামক বৈশ্য দেবীকে আরাধনার ফলে অসীম জ্ঞান এবং তার দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আজও আশীর্বাদপূর্ণ ও মন্ত্রময় শ্রীশ্রীচণ্ডীর আশ্রয়ে কতো না আর্ত, অর্থলাভেচ্ছু, জ্ঞানপিপাসু তথা

প্রেমিক ভক্ত দেবীর কৃপাধন্য হচ্ছেন এবং নিজ নিজ শারীরিক ও আত্মিক উন্নতি লাভ করে চলেছেন তার ইয়ত্তা নেই। নিন্দুকেরা বলবেন, এসব বাজে কথা, একখানি গ্রন্থ পাঠের দ্বারা কোনরকম মনোরথ পূর্ণ করা অবাস্তব ব্যাপার। অবিশ্বাসীদের প্রতি একটি প্রশ্ন—যদি তোমাদের কথা সত্য হয়, তাহলে এই ঘোর অশান্তির যুগেও এবং হাজার হাজার বৎসর ধরে নগরে, গ্রামে, মন্দিরে, মঠে, তীর্থক্ষেত্রে, এমন-কি নিজ নিজ গৃহে অগণিত মানুষ চণ্ডীপাঠ করেন কিসের আশায়? কেন তাঁরা প্রার্থনা করেন—

**দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।**
**প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য।।**

(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১/৩)

—হে দেবি দুর্গে! তুমি পীড়িতের বেদনার উপশম কর, তুমি অখিল জগতের জননী, তুমি আমাদের উপর প্রসন্না হও। হে জগজ্জননি, তুমি বিশ্বকে রক্ষা করো; তুমি স্থাবর-জঙ্গম সকলেরই অধীশ্বরী। জানি না, এই প্রশ্নের কোনও বিশ্বাসযোগ্য উত্তর আছে কি-না।

নিয়মিত বিধি অনুসারে চণ্ডীপাঠ, চণ্ডীর আখ্যান -উপাখ্যানের মর্মার্থ উপলব্ধি, চণ্ডীপাঠের উদাত্ত ধ্বনির দ্বারা পাঠক ও শ্রোতার অন্তরে অনুরণন—এসব যেন কোনও এক দিব্য-লোকের আস্বাদ এনে দেয়। চণ্ডীর উপাখ্যান গুলিকে স্বামী যুক্তানন্দজী স্পষ্ট, সরল ও প্রামাণিক রূপে উপস্থাপিত করে সংস্কৃত অনভিজ্ঞ বাঙলা- ভাষীদের পরম উপকার সাধন করেছেন। সহজ গদ্যে বর্ণনা করা হলেও তিনি মূল কাহিনীকে কখনই দূষিত করেননি, বা অতি-রঞ্জিত করেননি। 'গল্প বলা' একটা মূল্যবান শিল্প (Art); সাধুসন্ন্যাসী, জ্ঞানী বা অতি সাধারণ মানুষদের সঙ্গে নানা সময় নানা রকমে সমাজকল্যাণমূলক ও ধর্মীয় কথোপকথন করতে করতে অন্যান্য শ্রদ্ধেয় স্বামীজীদের মত স্বামী যুক্তানন্দজীও গল্প বলার শিল্পকে নিপুণভাবে আয়ত্ত করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই নিপুণতারই উজ্জ্বল প্রমাণ। গল্পগুলিতে চিত্রিত চরিত্রগুলির স্থৈর্য, বীর্য, কারুণ্য প্রভৃতি গুণগুলি যেন গল্পের পাত্রসমূহকে আমাদের সামনে জীবন্তরূপে ও বিশ্বাসযোগ্য ভাবে হাজির করেছেন। পাঠকদের সুবিধার জন্য শ্লোকের কোথাও কোথাও মহত্ত্বপূর্ণ পাঠান্তর সংযোজিত হয়েছে। অর্গলা, কবচ, কীলক

প্রভৃতি গূঢ়ার্থক শব্দগুলির শাস্ত্রানুসারী ব্যাখ্যা দিয়ে স্বামীজী ভক্ত-পাঠকদের জিজ্ঞাসা পূর্ণ করেছেন।

মধু-কৈটভ, মহিষাসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি দেবদ্রোহী বীরদের ক্রিয়াকলাপ এমন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে সকলশ্রেণীর পাঠক রসাস্বাদ করতে পারে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে যে সব গল্প বিবৃত আছে সেগুলির মূল সুর একটিই, তা হ'ল ভগবতী দুর্গামাতার অসীম তেজস্বিতার আড়ম্বরপূর্ণ বিন্যাসের মধ্য দিয়ে দেবীর চরণে প্রেমপূর্ণ ভক্তির ডালা সাজানো। স্বামী যুক্তানন্দজী একজন নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত বলেই শ্রীশ্রীচণ্ডীর গল্পগুলি এমন সুন্দর ভাবে বলতে পেরেছেন, যার দ্বারা পাঠকেরও ভক্তিপূর্ণ অন্তর ঐ সব গল্পের মধ্যে নিমজ্জিত হবে এবং প্রতিটি গল্পের সারমর্ম বা মূল উপদেশ গ্রহণ করতে সমর্থ হবে। মূল সংস্কৃতে রচিত শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠে যাঁরা অসমর্থ তাঁরাও যদি শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে জগদম্বা দুর্গাকে স্মরণ ক'রে 'গল্পে শ্রীশ্রীচণ্ডী' পাঠ করেন তাহলে মায়ের কৃপায় তাঁরা মূল চণ্ডীপাঠের ফল কিছু পরিমাণে অবশ্যই লাভ করবেন এবং পাপবিমুখ শুদ্ধান্তঃকরণের দ্বারা ঋদ্ধিমান হবেন। ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধালু জনসমাজের আত্মিক উন্নতির জন্য স্বামী যুক্তানন্দজীর এই পবিত্র উদ্যমকে আমরা সাধুবাদ জানাই। আশা রাখি, ভবিষ্যতে এই রকম আরও দুর্মূল্য উপহার পেয়ে মানুষ ধন্য হবে।

সহ-সভাপতি, এশিয়াটিক সোসাইটি,
কলকাতা
প্রাক্তন সংস্কৃত বিভাগীয় প্রধান
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা

# পরিচায়িকা

প্রলয় কাল।

ঊর্ধ্বে, অধেঃ চতুর্দিকে কেবল শূন্য, অনন্ত প্রসারিত মহাশূন্য। সেই প্রলয় ও সৃষ্টির সন্ধিক্ষণে নিস্তব্ধ সভাপীঠের নিঃসঙ্গ অধিষ্ঠাতা কে? তা হল বস্তুহীন, কায়াহীন, অদৃশ্য, অবিরল অন্ধকার। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে—

**তম আসীতমসা গূঢ়মাগ্রে-**

**হপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্। ২৩/২৯**

তৎকালে যা ছিল তাও ছিল না। যা আছে তাও ছিল না। পৃথিবী ছিল না। অতি দূর বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? সর্ব প্রথম অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই বর্জিত ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিল। সেই গাঢ় তমসাকে, সেই অননুমেয় অন্ধকারকে কোনও অভিধা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু এই তমসার বুকে রয়েছে সৃষ্টির সংহত উদ্ভাস। প্রত্যক্ষের অগোচর নিঃশব্দ, নিঃসীম, নিঃসঙ্গ সেই অন্ধকারের মধ্যে একার্ণব সলিলে অনন্ত শয়নে শায়িত ভগবান বিষ্ণু। তিনিও যোগনিদ্রায় অভিভূত। পৃথিবী প্রলীন হওয়ায় পালনকর্তা ভগবান বিষ্ণুর কাজ বন্ধ। তিনি নিষ্ক্রিয়। তাঁর নাভিপদ্মে পদ্মযোনি ব্রহ্মা। ক্রমে-ক্রমে প্রজাপতি ব্রহ্মার অন্তরে সৃষ্টির বাসনা জাগছে। সৃষ্টিই জীবন। কিন্তু জীবন তো মৃত্যুহীন হতে পারে না। জীবন আর মৃত্যু তো মহামায়ার দুই স্তন-যুগল। মধু ও কৈটভ মৃত্যুরূপী হয়ে দেখা দিল ব্রহ্মার সামনে। তারা সৃষ্টিকে গ্রাস করতে চায়। ভীত সন্ত্রস্ত ব্রহ্মা যেন জীবন-শিশু। মধু-কৈটভ মৃত্যুর প্রতীক হয়ে জীবনকে তাড়না করে। তাকে গ্রাস করতে চায়। শিশু যেমন ভয় পেলে মাকে ডাকে, তিনিও মাতৃস্তব শুরু করলেন। তামসী দেবী পরিতুষ্টা হলেন। চন্দ্র-সূর্যহীন চরাচর ব্যাপী নিরন্ধ্র অন্ধকারে তামসী দেবী মিলে মিশে রইলেন। এ হল মায়ের প্রথম আবির্ভাব মুহূর্ত।

ব্রহ্মের বহু হবার বাসনা হল। 'একো অহং বহু স্যাম'। এক থেকে বহু হল। 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা'। পুরাণে আছে, পরমাত্মা ভগবান সৃষ্টির কাজের জন্য নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করলেন। দক্ষিণ অর্ধাঙ্গ পুরুষ, বাম

অর্ধাঙ্গ প্রকৃতি। যেন একটি চণকের দুটি অংশ। উপরে মায়ারূপ আবরণ। সেই মায়ারূপ আবরণ ভেদ করলে শিব-শক্তি বা পুরুষ-প্রকৃতির যুগকৃদ্ধণ স্বরূপ। সূত সংহিতায় বলা হয়েছে—

**সা দেবী পরমা দেবী শিবাভিন্না শিবঙ্করী**
**শিবাভিন্না ত্বয়াহীনঃ শিবেঽপি নিরর্থক।**
**যথা শিবস্তথা দেবী যথা দেবী তথা শিবঃ।**

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের একটি মন্ত্রে প্রথম দুর্গাদেবীর নাম পাওয়া যায়। এই দেবী অগ্নিবর্ণা। তপস্যার দ্বারা জোতির্ময়ী। ইনি বৈরোচনী।

**তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং।**
**বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।।**
**দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে।**
**সুতরসি তরসে নমঃ সুতরসি তরসে নমঃ।।**

হে সংসার তারিণি, সংসার সাগর পার হবার জন্য তোমাকে প্রণাম।

মহাভারতে ব্যাসদেব বলেছেন,

**কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ।**
**সংহরন্তং প্রজাঃ কালং কালঃ শময়তে পুনঃ।।**
**কালোহি কুরুতে ভাবান সর্বান্ লোকে শুভাশুভম্।**
**কালঃ সংক্ষিপতে সর্বাঃ প্রজাঃ বিসৃজতে পুনঃ।।** (১/১/২০৯-২১০)

কাল সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করেন। প্রাণীদের সংহরণকারী কালকে আবার কালই দমন করেন। বিশ্বের শুভাশুভ সব ভাব কালেরই সৃষ্টি। প্রলয়কালে কালই সমস্ত সংহরণ করেন। আবার সৃষ্টি সময়ে কালই সমস্ত সৃজন করেন। এই কালই মহাকালী। কালীর আদিরূপ। জগৎ নিত্য পরিবর্তনশীলা। অস্থির ও নশ্বর। পরিবর্তনশীল এ জগতের অন্তরালে আছেন অচিন্তনীয় মহাশক্তি মহামায়া। তিনি নিত্যা ও অপরিবর্তনীয়া। ইনি ধৃতিরূপিণী, বিশ্বেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী।

**বিশ্বেশ্বরী ত্বং পারিপাসি বিশ্বম্**
**বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।** (চণ্ডী ১১/৩৩)

দেবী কালিকার প্রধানত দু'টি রূপ। (১) দক্ষিণা কালী (২) বামাকালী।

এ ছাড়াও আছেন শ্যামাকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, সিদ্ধকালী, গুহ্যকালী। দেবীর রূপভেদে সাধনা, উপচার ও আঙ্গিকেও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। কালী ভোগ ও মোক্ষ দু'ই প্রদায়িনী। দক্ষিণা কালী ভোগ ও মুক্তি দায়িনী। কিন্তু বামাকালী কেবল ভববন্ধন মুক্তিদায়িনী। দক্ষিণা কালী বরদা, কল্যাণী। শ্যামা কালী তাঁর নামান্তর। দক্ষিণার বীজ মন্ত্র একাক্ষরী। দেবী কালীকার বীজমন্ত্র হ্রীং এবং ক্রীং, যুক্ত হয়েছে বৈদিক ওঁ এবং কীলকও।

মা কালী চিররহস্যাবৃতা। সে রহস্যের আবরণ উন্মোচন সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত। কেবলমাতৃসাধকতা উপলব্ধি করেন। প্রতীকত্বের আবরণ উন্মোচন করলে সেই ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তির উপলব্ধি হয়।

মাকে নিয়ে কত-কত প্রশ্ন সাধারণের মনে। তার সমাধান তো সহজ নয়।

কালী চতুর্ভূজা কেন?

চারটি দিক—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ। এই চারিদিক হল মায়ের হস্ত স্বরূপ। সর্ব ব্যাপিনী মা সর্বদিক ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্গলোক— পৃথিবী, আকাশ, মহাকাশ — স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই সর্বব্যাপিনী মহামায়া আবৃত্ত করে আছেন।

মা কেন কালো হলেন?

কবির উত্তর —

শুনেছি মার বরণ কালো
সে কালোতে ভুবন আলো।

মানুষের মন অজ্ঞানতায় পূর্ণ। হিংসা, দ্বেষ, শঠতা, প্রবঞ্চনা, কাম, ক্রোধ, রিরিরংসা দ্বারা মন কলুষিত। শাস্ত্রে অজ্ঞতাই হল অন্ধকার। জ্ঞান হল আলোকোজ্জ্বল। কালী তাঁর সন্তানদের মনে অজ্ঞানতার কালিমা মোচন করেন। তাই তিনি কৃষ্ণবর্ণা। তাঁর পায়ের তলায় চন্দ্র সূর্যের আলোক-প্রবাহ। তাই—

কালোমেয়ের পায়ের তলায় আলোর নাচন।

মা অরূপা। ভক্তগণকে কৃপা করার জন্যই তিনি রূপ ধারণ করেছেন। দেবী ভাগবতে বলা হয়েছে—

সেয়ং শক্তির্মহামায়া সচ্চিদানন্দরূপিণী।

রূপং বিভর্ত্যরূপা চ ভক্তানুগ্রহহেতবে।।

মহামায়া স্বয়ং প্রকাশমানা হতে পারেন না। তিনি চৈতন্যের সহায়তায় প্রকাশ পেয়ে থাকেন। তিনি অচৈতন্যের নিকট অন্ধকারসদৃশ। কৃষ্ণবর্ণাও। যিনি, প্রলয়কালে সবকিছুকে গ্রাস করেন তিনিই কালী। কৃষ্ণবর্ণে শ্বেতপীত রক্ত সমস্ত বর্ণ বিলীন হয়। সেরূপ সর্ব প্রাণীও কালীতে প্রবিষ্ট হতেছে। এ জন্য নির্গুণা নিরাকারা কাল-শক্তির বর্ণ কালো বলে মনে করা হয়।

মাতৃ প্রতিমা বিবসনা কেন?

মা বিবসনা নন। তিনি দিগ্‌বসনা। চতুর্দিকই তাঁর অম্বর। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁর গর্ভে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁর বিরাট অবয়ব। তিনি সর্ব পরিব্যাপ্তা বিশ্বরূপিণী। জগতে তাঁর চেয়ে বৃহৎ কোনও বস্তু নয়। সুতরাং আবরণ রূপ সীমারেখায় তাঁকে আবৃত্ত করবে কে? জগতে তিনিই একমাত্র ও অদ্বিতীয়া। বিশ্বসংসার তাঁরই বিশাল দেহ। নিজেকে কেহ লজ্জা পায় না। এজন্য মা বিবসনা। বিশাল দেহা মায়ের স্তুতি হল—

সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তি সমন্বিতে।

মায়ের ত্রিনয়নের কারণ কি?

দু'নয়ন হল সাধারণ, যা দিয়ে বাহ্য জগৎ দেখা যায়। তৃতীয় নয়ন হল জ্ঞাননেত্র। কবি বলেন—

'চন্দ্র-সূর্য আর হুতাশন যে মায়ের ত্রিনয়ন'। মায়ের কৃপায় তৃতীয় নয়ন বা জ্ঞানচক্ষু ফুটে উঠে। তখন অতীন্দ্রিয় জগতের দিব্যরূপ ও দিব্য মায়ার খেলা সাধকের দৃষ্টি গোচর হয়। এই দৃশ্য ও অদৃশ্য ইন্দ্রিয় জগৎ ও অতীন্দ্রিয় জগৎ মহামায়াতে প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানচক্ষুকে বুঝাবার জন্যই মা ত্রিনয়নী।

মা কালী কল্যাণী, করুণাময়ী। তিনি কেন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হলেন? কেন তিনি অসুরের রক্তমাংস ভক্ষণ করলেন?

কাম-ক্রোধ-দ্বেষ-হিংসা এগুলি হল মানবিক প্রবৃত্তি। এর জন্যই মানুষ শোক-দুঃখ-অশান্তি-অতৃপ্তি ভোগ করে। অসুর হল এই মানবিক রিপুর প্রতীক। রক্তবীজ হল মনের ভোগাকাঙ্ক্ষা। এর নিবৃত্তি করা কঠিন। একটি শেষ হতে না হতেই অন্য একটি আকাঙ্ক্ষা মনে উদিত হয়। মা কালী অসুরনাশিনী।

তিনি ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ করে সেই অসুররূপী মনোবৃত্তিগুলিকে সংহার করেন।

কালী খড়গধারিণী কেন?

খড়গ জ্ঞানের প্রতীক। জ্ঞানরূপ খড়গ দিয়ে মা কালী কামক্রোধ রূপ অসুর নিধন করেন। খড়্গ সত্ত্ব-রজ-তম তিনগুণেরও প্রতীক। চণ্ডীতে বলা হয়েছে — চণ্ডিকে, তোমার খড়্গ আমাদের কল্যাণ করুক। তোমাকে আমরা প্রণাম করি—

'শুভায় খড়্গা ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্'। ১১/২৮

এই খড়্গ দেবীকে প্রদান করেছিলেন কাল।

দেবীর পদদ্বয় শিববক্ষে আর উরুতে কেন? মাতা সঙ্কুচিতা হয়ে জিহ্বায় কামড় দিয়েছেন কী কারণে?

রণক্ষেত্র। শুম্ভ-নিশুম্ভের সঙ্গে দেবী অম্বিকার মহারণ। ক্রোধান্বিতা দেবীর মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ। ললাটে ভ্রূকুটি কুটিল রেখা। হঠাৎ দেবীর সেই ললাট দেশ থেকে কালী আবির্ভূতা হলেন। তিনি বিকট শব্দে দশ দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ করে অসুর সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। এবার দিক্-বিদিক জ্ঞানশূন্যা হয়ে শত্রুসৈন্য ভক্ষণ করতে লাগলেন। মাহুতসহ হস্তিসকল, অশ্বারোহীসহ যোদ্ধা, সারথি সহিত রথ ও রথারোহী দেবী মুখ বিবরে নিক্ষেপ করে দন্ত দ্বারা চর্বণ করতে লাগলেন। মনে হল এবার সৃষ্টি যাবে রসাতলেঁ। এই ভয়ঙ্করী মৃত্যুরূপাকে কে শান্ত করবে? তিনি যে চারদিক শ্মশান করে এগিয়ে আসছেন। সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংসের পথে। সৃষ্টি রক্ষার উপায় কি? দেবতারা দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন। সৃষ্টি রক্ষা করো প্রভু শঙ্করীকে সংযত কর। না হলে সৃষ্টি যে বাঁচে না।

শিব এগিয়ে এলেন। শূলপাণি আশুতোষ শব হয়ে পড়ে রইলেন সেই মহাশ্মশানে, যেখানে তাণ্ডব নৃত্যে ধ্বংস-যজ্ঞে মেতে উঠেছেন মৃত্যুরূপা চামুণ্ডা। মারণ-যজ্ঞে দেবী তখন উন্মত্তা। শিবসুন্দরকে তিনি দেখতে পেলেন না। দেবীর দ্রঢ়িষ্ঠ পদদ্বয় উঠে এল শিববক্ষে আর উরুতে। শান্ত শিবের স্পর্শে দেবী হলেন স্থিরা। দেখলেন তাঁর পদতলে জগন্নিবাস প্রভু শঙ্কর। কাল— কামিনী আপন চরণ তলে দেখলেন—

'মহাকাল পেতেছে শয়ন।'

দেবী সঙ্কুচিতা হলেন। বুঝি লজ্জায় জিভ কাটলেন।

শক্তি সাধক দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন—প্রলয় কালে মহাকাল সব কিছুকে খায়। কালী সেই কালকেই খেয়ে ফেলেন। এজন্যই মরণ দলনে দলিত কাল দেবীর চরণতলে শায়িত।

মায়ের হাতে মুণ্ড, গলায় মুণ্ডমালা, কোমরে হাতের কটিবন্ধ কেন?

মা কালী বিশ্বোদরী। ব্রহ্মাণ্ড-জননী। সুর তাঁর সন্তান। অসুরও তাঁর সন্তান। মা আদর করেন, সোহাগ করেন। শাসনও করেন। বিপথগামী সন্তানদের শাসন করে দণ্ড দিয়েছেন। কল্যাণী জননী তাঁর সন্তানের চিহ্ন তাদের অঙ্গের বিভিন্ন অংশ তাঁর দেহাবরণ করে নিয়েছেন।

পার্বতী জগন্মাতা। শিব জগৎ পিতা। শক্তি বা প্রকৃতি মহাদেবী। মহাদেব শক্তিমান। প্রকৃতি ও পুরুষের যুগনদ্ধ রূপ বিশ্ব সৃষ্টির মূলীভূত কারণ। শিব কৃত্তিবাস, ফণিভূষণ, শ্মশানবাসী। শুদ্ধ সত্ত্বময়। সচ্চিদানন্দ শ্মশানবাসী শিব যখন প্রকৃতিকে স্বীকার করেন তখন তাঁর থেকে এক অনির্বচনীয় মহাশক্তির সৃষ্টি হয়। এই মহাশক্তিই মহামায়া। সৃষ্টি-স্থিতি- প্রলয়ের কারণরূপা। শক্তি ব্যতীত শিব থাকেন না। শিব ব্যতীত শক্তি থাকেন না। যা দেবী তাই শিব। যা শিব তাই দেবী।

**শক্তিঃ সাক্ষাৎ মহাদেবঃ স শক্তিমান।**
**তয়োর্বিভূতিলেশো বৈ সর্বামতচ্চরাচরম্।।**

দেব্যুপনিষদে আছে—

দেবতাগণ দেবীর নিকট সমবেত হলেন। তাঁদের জিজ্ঞাস্য—দেবী কে?

দেবী বললেন —

"আমি ব্রহ্মরূপিণী। আমার দ্বারাই প্রকৃতি পুরুষাত্মক জগৎ উৎপন্ন হয়েছে। আমি শূন্য ও অশূন্য। আনন্দ ও অনানন্দ। বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানও আমিই।"

বিচিত্ররূপিণী মায়ের তত্ত্ব ও কাহিনীর শেষ নেই। মুনি, ঋষি, পণ্ডিতেরাও মায়ের অন্ত পাননি। আমি সীমিত বুদ্ধি দিয়ে অরূপা আবার অনন্তরূপধারিণী মায়ের বর্ণনা করব এ স্পর্ধা রাখি না।

সংঘসন্তান স্বামী যুক্তানন্দের রচিত "গল্পে শ্রীশ্রীচণ্ডী" গ্রন্থ সমগ্র পাঠ করেছি। লেখক শ্রীশ্রীচণ্ডী এবং এর প্রাসঙ্গিক অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। মাতৃসাধক মাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। সমগ্র গ্রন্থে তার সুন্দর ও মনোরম চেষ্টা দেখা যায়। শুধু তাই নয় মায়ের শিশু স্বামী যুক্তানন্দ কত মাতৃনির্ভর! তাঁর শ্রীশ্রীজগন্মাতার প্রতি গভীর ভক্তি ও ভালবাসা তাঁকে নারী জাতির প্রতিও শ্রদ্ধাশীল করেছে। এ জন্য সকল নারীর মধ্যেই তিনি মাতৃরূপ দর্শন করেছেন। তাঁর উপলব্ধি হয়েছে—

**স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃসকলা জাগৎসু। ১১/৬**

এ দেশের নারীদের তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

দেবী সম্বন্ধীয় প্রায় সমস্ত কাহিনীই তিনি তাঁর গ্রন্থে উপস্থাপিত করেছেন। এ গ্রন্থ পাঠ করে নারী পুরুষ সকলেই উপকৃত হবেন।

গ্রন্থের ভাষা স্বচ্ছ। সাবলীল। কোথাও দুর্বোধ্যতার অবকাশ নেই। গুরুত্বপূর্ণ জটিল বিষয়ও ভাষা-শিল্পের গুণে সুস্পষ্ট ও সহজ বোধ্য হয়েছে। সুমার্জিত ভাষা, সংহত ভাব ও মুক্ত-শুদ্ধ রসরুচির জন্য গ্রন্থটি পাঠক সমাজের কাছেও সমাদৃত হবে।

**ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।**
**পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।**

অবাঙ্‌মনসোগোচর পূর্ণকে রূপ দিতে চেয়েছেন স্বামী যুক্তানন্দ। তিনিও আমাদের সকলের নমস্য।

ডঃ আশা দাশ

এম.এ., পি.এইচ.ডি. সাহিত্য-ভারতী।
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান
পালি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্বকর্মা পূজা
১লা আশ্বিন, ১৪১৪।
কোলকাতা।

# লেখকের কথা

জানি না, কেন বা কোন কারণে একসময় অন্তরে ইচ্ছা হয়েছিল—শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপর একটি গ্রন্থ রচনার। সে ইচ্ছা উৎসস্থলেই সুপ্ত হয়ে গিয়েছিল—বাস্তবায়ন আর হয়নি। কিন্তু একদিন যখন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতির্ময় নন্দ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র ও সাহিত্যিক শ্রীচৈতন্যময় নন্দ প্রস্তাব দেন "গল্পে শ্রীশ্রীচণ্ডী" লিখুন, তখন মনের সেই সুপ্ত বাসনাই যেন জাগ্রত হয়ে উঠল। ভাবলাম এ-কি চৈতন্যময়বাবুর কথা, না সেই চৈতন্যময়ী শ্রীশ্রীমায়েরই আদেশ? তিনিই কি চৈতন্যময়বাবুর মুখ দিয়ে একথা বলিয়ে নিলেন?

তবুও মনে এল সংশয়—যে ভুক্তি-মুক্তি প্রদায়িনী সর্বশক্তি স্বরূপিণী মায়ের অপার, অনন্ত, অসীম লীলা-রহস্য দেবতা, মুনি, ঋষি, যোগী, জ্ঞানী কেউই যথাযথভাবে অনুভবে সক্ষম হননি; স্বয়ং বিধি-বিষ্ণু-রুদ্রও যাঁর মায়ায় মোহিত হয়ে পড়েন—তাঁর সম্পর্কে আমি কি লিখব, আমি কি জানি, কতটুকুই বা জানি-বুঝি সেই শ্রীশ্রীজগজ্জননী মায়ের লীলা সম্বন্ধে? তাই স্বাভাবিক কারণেই হলাম হতোদ্যম। তখনই যেন আবার মনে হল—

শক্তি-সাধনার মূর্ত বিগ্রহ শ্রীশ্রীঠাকুর চেয়েছেন—হিন্দুজাতি আবার শক্তি-সাধনার বলে বলীয়ান হয়ে উঠুক, শক্তিমান হোক, হিন্দুর জাগরণে বিস্মিত হোক বিশ্ববাসী। তার শত্রুরা হোক সংযত। এবং সেজন্যই তিনি জাতিকে শক্তি-সাধনার মন্ত্রে দিয়েছেন দীক্ষা, শিখিয়েছেন সর্বশক্তিস্বরূপিণী অসুর বিনাশিনী মা দুর্গা, মা কালীর পূজা করতে হবে শুধুমাত্র পুষ্প-বিল্বপত্র আর চোখের জলেই নয়, চাই বীর্যের পূজা, চাই মা যে সকল অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিতা সেই সকল অস্ত্রহাতে বীরত্বব্যঞ্জক পূজারতি, শিখিয়েছেন সঙ্ঘবদ্ধতার কথা;—সে কথাই তো শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলা হয়েছে। সুতরাং শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বর্ণিত দেবী কর্তৃক সেই নয় অসুরকে বধের কাহিনীই হবে গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। যার মধ্য দিয়ে হিন্দুজাতি আবার সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হওয়ার পথ পাবে। তবে তত্ত্বের গভীরে গিয়ে সেই উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করা চলবে না।

সেভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীজগন্মাতার শ্রীচরণে কৃপাভিক্ষা করে গ্রন্থের কাজে প্রবৃত্ত হই। গ্রন্থে দু'এক ক্ষেত্র ছাড়া কোথাও তত্ত্বের অবতারণা করা না হলেও উপাখ্যানগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কথা, সাধক কমলাকান্ত, সাধক রামপ্রসাদ ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল এবং

সঙ্ঘ সঙ্গীত-চয়নিকা গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু মাতৃসঙ্গীত সংযোজিত হয়েছে। তাতে গ্রন্থের উদ্দেশ্য যেমন অবশ্যই ব্যাহত হয়নি, তেমনি গ্রন্থের বৈচিত্র্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রন্থের উপাখ্যানগুলি যেমন গ্রন্থান্তরের সাহায্যে বিশদভাবে বলার চেষ্টা করা হয়েছে, তেমনি দেবীর ধ্যান, দেবীর বাহন, অর্গলা-স্তোত্র, কীলক স্তব, দেবীকবচ, দেবী সূক্তও সংযোজিত হয়েছে। বলা হয়েছে সুরথ সমাধির প্রতি দেবীর কৃপাপ্রদান প্রসঙ্গে প্রাধানিক রহস্য, বৈকৃতিক রহস্য এবং মূর্তি রহস্যের সরল অনুবাদও। পরন্তু প্রাসঙ্গিকভাবেই কেন শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ করব সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠের ফলও বলা হয়েছে।

গ্রন্থ রচনায় যে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নিকট ঋণ সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণীয় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী মহারাজ এবং পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অরুণানন্দজী মহারাজ সম্পাদিত শ্রীশ্রীচণ্ডীদ্বয়, মনীষী সন্ন্যাসী পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজীর 'চণ্ডীচিন্তা'। এছাড়া গানগুলির কথা তো আগেই বলা হয়েছে। আর গ্রন্থপ্রকাশে যাঁদের নিকট একান্তভাবেই কৃতজ্ঞ তন্মধ্যে ডঃ আশা দাস—যাঁর লিখিত পরিচায়িকা গ্রন্থের গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করেছে এবং ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি ভূমিকা লিখে গ্রন্থের বিষয়বস্তু তুলে ধরেছেন। গ্রন্থ প্রসঙ্গে যাঁর কথা বিশেষভাবেই উল্লেখ করতে হয়, তিনি হলেন শ্রীআশীষ রায় (ডাইরেক্টর-স্টাডমেড প্রাঃ লিঃ)—যিনি গ্রন্থের সম্পূর্ণ আর্থিক ব্যয় বহন করে গ্রন্থ প্রকাশের পথকে নিষ্কণ্টক করেছেন। এছাড়াও ডঃ অমর কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ দেবব্রত দাস ও ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ মহাশয়ও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি গীতাপ্রেস গোরক্ষপুরের নিকটও। কারণ তাঁদের প্রকাশিত দশমহাবিদ্যা ও নবদুর্গা বই থেকেই এই গ্রন্থে প্রকাশিত ছবিগুলি নেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, যাঁদের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচনা তাঁরা যদি গ্রন্থটি পাঠে উপকৃত হন, তবে শ্রম সার্থক বলে মনে হবে।

ইতি -

বিনয়াবনত -

**স্বামী যুক্তানন্দ**

# বিষয় সূচী

পৃষ্ঠা নং


যুদ্ধজয়ে শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীশ্রীকালিকা স্তুতি ........ ১
যুদ্ধজয়ে শ্রীঅর্জ্জুনের শ্রীশ্রীদুর্গা স্তব ........ ৩
শ্রীশ্রীচণ্ডীকাদেবীর ধ্যান ........ ৫
অর্গলাস্তোত্রম্ ........ ৯
মাকে করো পরম আপন ........ ১১
আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় 'দেবী কবচম্' ........ ১৫
দেবীর বাহনটি কে? ........ ২২
শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করব কেন? ........ ২৪
কে সেই মহামায়া? ........ ৪০
মধু-কৈটভবিধ্বংসী মাকে প্রণাম ........ ৫০
দৈত্যদর্পনিসূদিনী মা দুর্গা ........ ৬২
মা মহিষাসুরমর্দিনীকে প্রণাম ........ ৭৯
দেবি, তোমারে প্রণাম করি ........ ৮৩
প্রপন্নার্তিহারিণী দেবি প্রসন্না হও ........ ৮৯
বধিলেন দেবী সে ধূম্রলোচনে ........ ১০০
চণ্ডিকাকে চামুণ্ডার চণ্ড-মুণ্ডের মুণ্ডপ্রদান ........ ১০২
রক্তপায়িনী মায়ের রক্তবীজ বধ ........ ১০৬
নিশুম্ভনাশিনি শুভদায়িনি—মা ........ ১১৩
এই জগতে একমাত্র আমিই বিরাজিতা ........ ১১৯
হে নিখিল বিশ্বজননি, তুমি প্রসন্না হও ........ ১২৪
জগন্মাতার করুণায় সফল মনোরথ সুরথ-সমাধি ........ ১৩৩
নবরূপে দেবী শ্রীশ্রীচণ্ডিকা ........ ১৪৩
দশরূপে মা মহামায়া ........ ১৫৮
শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠে অপরাধের জন্য দেবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কেন? ..... ১৬৮

# গল্পে শ্রীশ্রীচণ্ডী

## যুদ্ধজয়ে শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীশ্রীকালিকা স্তুতি

লঙ্কায় রাম-রাবণের ঘোরতর যুদ্ধের সময় শ্রীরামচন্দ্র নিম্নলিখিত স্তবে মহাশক্তি সমন্বিতা মা কালীকে প্রসন্ন করেন—

নমস্তে সর্ব্বাণী, ঈশানী ইন্দ্রাণী
ঈশ্বরী ঈশ্বরজায়া।
অপর্ণা অভয়া, অন্নপূর্ণা ছায়া।
মহেশ্বরী মহামায়া।।
উগ্রচণ্ডা উমা আশুতোষ বামা,
অপরাজিতা উর্ব্বশী।
রাজ-রাজেশ্বরী, রমা রণ করি।
শঙ্করী শিবে ষোড়শী।।
মাতঙ্গী বগলে, কল্যাণী কমলে,
ভবানী ভুবনেশ্বরী।
সর্ব্ব বিশ্বোদরী, শুভে শুভঙ্করী,
ক্ষিতি ক্ষেত্র ক্ষেমঙ্করী।।
সহস্র সহস্তে, ভীমে ছিন্নমস্তে,
মাতা মহিষমর্দ্দিনী।
নিস্তারকারিণী, নরক-বারিণী,
নিশুম্ভ-শুম্ভ-ঘাতিনী।
দৈত্য-নিকৃন্তনী, শিব সীমন্তিনী,
শৈলসুতা সুবদনী।
বিরিঞ্চি-বন্দিতা, হিমশৈলসুতা,
দিগম্বরের ঘরণী।।

দেবী দিগম্বরী, দুর্গে দুর্গ অরি,
কালিকে করালবেশী।
শিবে শবারূঢ়া, চণ্ডীচন্দ্রচূড়া।
ঘোররূপা এলোকেশী।
সর্ব্বসুশোভিনী, ত্রৈলোক্য-মোহিনী।
নমস্তে লোলরসনা।
দিগ্‌বিবসনা, সর্ব্ব শবাসনা।
বিশ্ব বিকটদশনা।।
সারদা বরদা, সুভদা সুখদা,
অন্নদা মোক্ষদা শ্যামা।
মৃগেশ বাহিনী, মহেশ ভবানী।
সুরেশবন্দিনী বামা।।
কামাখ্যা রুদ্রাণী, হরা হররাণী
হররমা কাত্যায়নী।
শমন-ত্রাসিনী, অরিষ্ট-নাশিনী,
দয়াময়ী দাক্ষায়ণী।
হের মা পার্ব্বতী, আমি দীন অতি,
আপদে পড়েছি বড়।
সর্ব্বদা চঞ্চল, পদ্মপত্র জল।
ভয়ে ভীত জড়সড়।।
বিপদে আমার, না হয় তোমার,
বিড়ম্বনা করা আর।
মম প্রতি দয়া, কর গো অভয়া,
ভবার্ণবে কর পার।।
(কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে)

—ঃঃ—

# যুদ্ধজয়ে অর্জুনের শ্রীশ্রীদুর্গাস্তব

**নমস্তে সিদ্ধসেনানি ! আর্য্যে ! মন্দরবাসিনী !!**
**কুমারি কালি কাপালি কপিলে কৃষ্ণপিঙ্গলে !।। ১**

সিদ্ধসেনানি, হে আর্যে, মন্দরবাসিনী, কুমারি, কালি, কাপালি, কপিলে, কৃষ্ণপিঙ্গলে, তোমাকে নমস্কার করি।।"

**ভদ্রকালি, নমস্তভ্যং মহাকালি, নমোঽস্তু তে।**
**চণ্ডি! চণ্ডে! নমস্তভ্যং তারিণি ! বরবর্ণিনি !।।২**

হে ভদ্রকালি ! তোমাকে নমস্কার। মহাকালি, তোমাকে নমস্কার। চণ্ডি, চণ্ডে, তারিণি, বরবর্ণিনি, তোমাকে নমস্কার।।

**কাত্যায়নি! মহাভাগে ! করালি ! বিজয়ে ! জয়ে !।**
**শিখিপুচ্ছধ্বজধরে। নানাভরণভূষিতে ।। ৩**

কাত্যায়নি, মহাভাগে, করালি, বিজয়ে, জয়ে, ময়ুরপুচ্ছের ধ্বজধারিণি, নানাভরণভূষিতে, তোমাকে নমস্কার।।

**অট্টশূলপ্রহরণে ! খড়্গখেটকধারিণি !।**
**গোপেন্দ্রস্যানুজে ! জ্যেষ্ঠে ! নন্দগোপকুলোদ্ভবে !।। ৪**

মহাশূলাস্ত্র, খড়্গ ও মুদ্গরধারিণি, কৃষ্ণানুজে, জগৎপ্রাচীনে, নন্দগোপকুলোদ্ভবে, তোমাকে নমস্কার।।

**মহিষাসৃক্‌প্রিয়ে ! নিত্যং কৌশিকি ! পীতবাসিনী !।**
**অট্টহাসে ! কাকমুখি ! নমস্তেঽস্তু রণপ্রিয়ে !।। ৫**

সর্ব্বদা মহিষরক্তপ্রিয়ে, কৌশিকি, পীতবসনে, অট্টহাসে, কাকবদনে, রণপ্রিয়ে, তোমাকে নমস্কার।।

**উমে ! শাকম্ভরি ! শ্বেতে ! কৃষ্ণে ! কৈটভনাশিনি !।**
**হিরণ্যাক্ষি ! বিরূপাক্ষি ! সুধূম্রাক্ষি ! নমোঽস্তু তে !।। ৬**

উমে, শাকম্ভরি, শ্বেতে, কৃষ্ণে, কৈটভনাশিনি, পীতনয়নে, বিরূপাক্ষি, অতিধূম্রনয়নে, তোমাকে নমস্কার।।

**বেদশ্রুতিমহাপুণ্যে ! ব্রহ্মণ্যে ! জাতবেদসি !।**
**জম্বু-কটকচৈত্যেষু নিত্যং সন্নিহিতালয়ে !।। ৭**

বেদশ্রুতিমহাপুণ্যে, দেবহিতে, প্রাচীনজ্ঞানধারিণী, সর্বদা জম্বুদ্বীপস্থ দুর্গদেবতালয়বাসিনি, তোমাকে নমস্কার।।

**ত্বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাম্।**

**স্কন্দমাতর্ভগবতি ! দুর্গে ! কান্তারবাসিনি !।। ৮**

কার্তিকেয়জননি, ভগবতি, দুর্গে, মহারণ্যবাসিনি, তুমি বিদ্যার মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা এবং প্রাণিগণের মহানিদ্রা।।

**স্বাহাকারঃ স্বধা চৈব কলা কাষ্ঠা সরস্বতী।**

**সাবিত্রী বেদমাতা চ তথা বেদান্ত উচ্যসে।। ৯**

জ্ঞানীরা তোমাকে স্বাহা, স্বধা, কলা, কাষ্ঠা, সরস্বতী, বেদমাতা, গায়ত্রী এবং উপনিষদ্ বলে থাকেন।।

**স্তুতাসি ত্বং মহাদেবী ! বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা।**

**জয়ো ভবতু মে নিত্যং ত্বৎপ্রসাদাদ্রণাজিরে।। ১০**

মহাদেবী, আমি পবিত্র-চিত্তে তোমার স্তব করলাম। তোমার অনুগ্রহে সমরাঙ্গনে সর্ব্বদাই যেন আমার জয় হয়।।

**কান্তারভয়দুর্গেষু ভক্তানাম্ আলয়েষু চ।**

**নিত্যং বসসি পাতালে যুদ্ধে জয়সি দানবান্।। ১১**

তুমি সর্বদাই মহারণ্যে, ভয়স্থানে, দুর্গমদেশে, ভক্তগণের গৃহে এবং পাতালে বাস কর আর যুদ্ধে দানবদের জয় করে থাক।

**ত্বং জম্ভনী মোহিনী চ মায়া হ্রীঃ শ্রীস্তথৈব চ।**

**সন্ধ্যা প্রভাবতী চৈব সাবিত্রী জননী তথা।। ১২**

তুমি রতি, মোহিনী, মায়া, লজ্জা, লক্ষ্মী, সন্ধ্যা, দীপ্তি, সাবিত্রী ও জগতের জননীস্বরূপা।।

**তুষ্টিঃ পুষ্টির্ধৃতির্দীপ্তিশ্চন্দ্রাদিত্যবিবর্দ্ধিনী।**

**ভূতির্ভূতিমতাং সংখ্যে বীক্ষ্যসে সিদ্ধচারণৈঃ।।**

দেবি! তুমি তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, চন্দ্র ও সূর্যের উজ্জ্বলতাকারিণী দীপ্তি এবং সম্পন্নদিগের সম্পৎ। যোগিগণ ও পরিব্রাজকগণ ধ্যানে তোমাকেই দেখে থাকেন।।

অর্জ্জুনের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী আকাশমার্গে অবস্থান করে বললেন—

**"স্বল্পেনৈব তু কালেন শত্রূন্ জেষ্যসি পাণ্ডব !।"**

—হে পাণ্ডব! অচিরেই তুমি শত্রুগণকে জয় করবে। এই কথা বলেই বরপ্রদা দেবী সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হলেন।

—ঃঃ—

# শ্রীশ্রীচণ্ডিকাদেবীর ধ্যান

মহাশক্তি মহামায়া—তিনি পরমেশ্বরী। তত্ত্বতঃ তিনি নিরাকারা, নির্গুণা আবার যেহেতু তিনি ভক্তবৎসলে তাই ভক্ত বা সন্তানের কল্যাণে তিনিই হন সাকারা, তিনিই হন সগুণা। আমরা যে পবিত্র ও মহান্ শাস্ত্রটি পাঠ করার সঙ্কল্প নিয়েছি, সেই শাস্ত্রে পরমেশ্বরী মা অম্বিকা সাকারা হয়েই মধু-কৈটভ, মহিষাসুর, চণ্ড-মুণ্ড, রক্তবীজ, শুম্ভ-নিশুম্ভাদি অসুরগণকে বিনাশ করেছেন বলে বলা হয়েছে। তাই, যে দেবীর লোককল্যাণ-কারিণী ভাগবতী লীলা আমরা জানতে প্রবৃত্ত হয়েছি তাঁর স্বরূপ ও তাঁর চরিত্র সম্পর্কে একটি ধারণা পেলে তাঁর শ্রীচরণে মনকে নিবিষ্ট করতে সুবিধা হয় না-কি? হয়তো সে কারণেই ত্রিকালদর্শী শাস্ত্রপ্রণেতাগণ এই শ্রীশ্রীচণ্ডীর শুরুতেই দেবী চণ্ডিকার ধ্যানমন্ত্রটি লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরাও এখন প্রথমেই সেই ধ্যান-মন্ত্রটি পাঠ করে যিনি অনন্ত-অসীম, যিনি গুণহীন হয়েও আবার অনন্ত গুণের বারিধি তাঁর সম্পর্কে যথাসাধ্য ধারণায় সচেষ্ট হই।

(১)

ওঁ বন্ধূক-কুসুমাভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীম্
স্ফুরচ্চন্দ্রকলা-রত্ন-মুকুটাং মুণ্ডমালিনীম্।
ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নতঘটস্তনীং
পুস্তকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ বরঞ্চাভয়কং ক্রমাৎ।।
দধতীং সংস্মরেন্নিত্যমুত্তরাম্নায়মানিতাম্।

(২)

কালীং রত্ন-নিবদ্ধ-নূপুর-লসৎ-পাদাম্বুজামিষ্টদাং
কাঞ্চী-রত্নদুকূল-হারললিতাং নীলাং ত্রিনেত্রোজ্জ্বলাম্।
শূলাদ্যস্ত্রসহস্রমণ্ডিত-ভুজামুদ্বক্ত্র-পীনস্তনীং
আবদ্ধামৃতরশ্মিরত্নমুকুটাং বন্দে মহেশপ্রিয়াম্।।

(৩)

যা চণ্ডী মধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী যা মাহিষোন্মূলিনী
যা ধূম্রেক্ষণচণ্ডমুণ্ডমথনী যা রক্তবীজাশনী।

শক্তিঃ শুম্ভনিশুম্ভদৈত্যদলনী যা সিদ্ধিদাত্রী পরা
সা দেবী নবকোটীমূর্তিসহিতা মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী।।

(৪)

মধ্যে সুধাব্‌ধিমণিমণ্ডপ-রত্ন-বেদী-
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্‌।
পীতাম্বরাং কনকভূষণমাল্যশোভাং
দেবীং ভজামি ধৃত-মুদ্গারবৈরিজিহ্বাম্‌।।

অর্থাৎ—যাঁর বর্ণ বন্ধুক পুষ্পের মত, যিনি শিবের উপর সংস্থিতা, উদীয়মান চন্দ্রকলা যাঁর মুকুটের রত্নরূপে বিরাজ করে, যিনি নরমুণ্ড-মালাশোভিতা ও উন্নত ঘটের ন্যায় স্তনযুগল সংযুক্তা, যাঁর তিনটি নয়ন ও পরিধানে রক্তবসন, যিনি তাঁর চার হাতে যথাক্রমে পুস্তক, রুদ্রাক্ষমালা এবং বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা ধারণ করেন, সেই আগমশাস্ত্র-প্রতিপাদ্যা মহাদেবীকে নিত্য উত্তমরূপে ধ্যান করবে।

যাঁর শ্রীপাদপদ্মযুগল রত্নখচিত নূপুরে সুশোভিত, যিনি মনের অভীষ্ট পূরণকারিণী, যিনি মেখলা, রত্নময় বস্ত্র ও মণি-হার-পরিহিতা, যিনি নীলবর্ণা ত্রিনয়নোজ্জ্বলা, যিনি সহস্রভুজে শূলাদি অস্ত্র ধারণ করেন ও ঊর্ধ্বমুখ স্তন যুগলে শোভিতা এবং যিনি অমৃতবর্ষিণী রশ্মিযুক্ত রত্নখচিত মুকুট ধারণ করেন— সেই মহেশপ্রিয়া কালীকে বন্দনা করি।

যে চণ্ডিকাদেবী মধুকৈটভাদি দৈত্যের বিনাশ করেছেন, যিনি মহিষাসুর মর্দিনী, যিনি ধূম্রলোচন-চণ্ড-মুণ্ডাসুরের সংহার-কর্ত্রী; যিনি রক্তবীজ-ভক্ষণকারিণী, যাঁর মহাশক্তি শুম্ভনিশুম্ভাসুরকে নাশ করেছে ও শ্রেষ্ঠ সিদ্ধিদাত্রী এবং নবকোটী সহচরী পরিবৃতা, সেই জগদীশ্বরী দেবী আমাকে পালন করুন।

সুধাসমুদ্রের মধ্যস্থলে মণিমণ্ডপ-রত্নবেদীতে অবস্থিত সিংহাসনে সমাসীনা, উত্তম পীতবর্ণা, পীতবস্ত্র পরিহিতা, স্বর্ণালঙ্কার ও মাল্যশোভিতা এবং যাঁর হাতে মুগুর ও যিনি শত্রুর জিহ্বাকে ধারণ করে রয়েছেন সেই দেবীর ধ্যান করি।

—ঃঃ—

# অর্গলাস্তোত্রম্

আমরা সব সময়ই চাই রূপ, চাই জয়, চাই যশঃ, চাই আমাদের শত্রুর বিনাশ, চাই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, চাই সৌভাগ্য আরোগ্য কল্যাণ, চাই পাপ-তাপের নাশ, সর্বব্যাধির বিনাশ, চাই ধন,সম্পদ মনোমত ভার্যা ইত্যাদি কত কিছুই। কিন্তু সব কিছু কি আমরা পাই?— পাই না। কারণ আমরা চাইতে জানি না, পাওয়ার উপায়টি ঠিকমত অনুসরণ করি না। কোন কিছু পেতে হলে তার জন্য যে চেষ্টার দরকার তা অবশ্যই হতে হয় কায়-মন-বাক্যে বা সর্বান্তঃকরণে। তা না হলে কি কোন কিছু পাওয়া যায়? কিন্তু এই কায়-মন-বাক্যে বা সর্বান্তঃকরণে হওয়ার ক্ষেত্রেও আছে বাধা। বাধা কি? বাধা আমাদের মন—আমাদের চঞ্চল মনই সেই বাধা। সেই তো কায়-মন-বাক্য এই তিনকে এক হতে দেয় না। এজন্য সাধকদের কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে এই তিনকে এক করতে হয়। তবেই তাঁরা সিদ্ধ হন, সফল হন। শুক্ল যজুর্বেদের শিবসঙ্কল্পসূক্তে সেই নির্দেশই পাই।

সাধক যখন নিবিষ্ট মনে ঘরে বসে মায়ের ধ্যান করে চলেছেন, তখন ঘরের দরজা-জানালা খোলা থাকায় বাইরের কোলাহল তাঁর ধ্যানে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। সে-সময় সেই কোলাহলকে দূরে সরিয়ে দিতে সাধক ঘরের দরজা-জানালা একেবারে খিল দিয়ে বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ধ্যানের গভীরে ডুবে যান, মায়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান।

এই উপায়টি মাতৃকরুণা প্রার্থী প্রতিটি সাধকেরই নিকট উদাহরণ স্বরূপ। সাধনার পথে সাধকের সব থেকে বড় বাধা তার চঞ্চল মন। ওই মনই যত অনর্থের সৃষ্টি করে। গীতাতেও বলা হয়েছে 'চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ' এবং 'মনশ্চঞ্চলম্ অস্থিরম্'। সেই চঞ্চল মনকে শান্ত ও সংযত করতে না পারলে মায়ের করুণা লাভ, সাধনায় সিদ্ধি সবই অসম্ভব।

সাধকের সাধন-জীবনে সফলতার ক্ষেত্রে, মায়ের করুণা পাওয়ার ক্ষেত্রে অর্গলা-স্তোত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও উপায়স্বরূপ। স্তোত্রটি কিভাবে সাধনার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে তা তার নামকরণের মধ্যেই বলে দিয়েছেন—মহর্ষি মার্কণ্ডেয়। অর্গল কথাটির অর্থ হল খিল বা বাধা। অর্থাৎ সাধক যখন তাঁর হৃদি-সিংহাসনে মাকে যত্নসহকারে বসিয়ে স্তোত্র সহকারে নিবিষ্ট মনে মায়ের পূজা করে চলেছেন, তখন হৃদিমন্দিরের দরজাটি থাকবে অর্গল বা খিল

দেওয়া। আর মনের চঞ্চলতা থাকবে সেই দরজার বাইরে। তাহলেই সাধক নিরাপদে, নিশ্চিন্ত মনে মায়ের সাধনা করে হবেন পূর্ণ সফল কাম। মাতৃপ্রসাদে তাঁর আকাঙ্ক্ষার ভাণ্ডারটি হবে পরিপূর্ণ। তাহলে যে দেবী চামুণ্ডে সমগ্র বিশ্ববাসীর সন্তাপ হরণ করেন, যিনি সর্বব্যাপিকে, যিনি প্রলয়কালীন রাত্রিস্বরূপা, যিনি সর্বত্র জয়যুক্তা ও সর্বোৎকৃষ্টা, যিনি জন্ম-মৃত্যুকেও নাশ করেন, যিনি মঙ্গলদায়িনী, দুর্গতিনাশিনী, মোক্ষদায়িনী, করুণাময়ী, বিশ্বধারিণী স্বাহা অর্থাৎ দেবতাদের তোষণকারিণী, স্বধা অর্থাৎ পিতৃলোকের পোষণকারিণী, যিনি মধু-কৈটভকে বিনাশ করেছেন ও ব্রহ্মাকে বরপ্রদান করেছেন, যিনি মহিষাসুরকে বিনাশ করে ভক্তদের সুখ দিয়েছেন, যিনি ধূম্রলোচন-রক্তবীজ-শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি অসুর শক্তিকে সংহার করে জগতে শান্তি-কল্যাণ ও আনন্দ প্রতিষ্ঠা করেছেন; সেই দৈত্যদর্পনাশিনী, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্তৃক সংস্তুতা দেবীর শ্রীচরণে আমাদের মনোভিলাষ পূর্ণ করার জন্য মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রদর্শিত পথে আমরাও দেবীর নিকট প্রার্থনা করব।

অর্গলা-স্তোত্র প্রসঙ্গে পণ্ডিতদের মত হল, সাধকের প্রার্থনায় পরিতুষ্টা মা তাঁকে ভুক্তি বা মুক্তি উভয়েই প্রদান করেন, যেমন তিনি দিয়েছিলেন মহারাজ সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে। সুরথ পেয়েছিলেন ভুক্তি বা রাজ্যভোগের বর আর সমাধি পেয়েছিলেন মুক্তি, মোক্ষ বা ব্রহ্মপদ।

সাধকের সাধনার পথে মা তাঁকে প্রথমেই করেন সর্বৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ। সে হয় অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির অধিকারী। যাঁরা ঐশ্বর্যেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে থাকেন তাঁদের আর মোক্ষ বা ব্রহ্মপদ লাভ হয় না। অর্গলাস্তোত্রে যে দেহি দেহির কথা বলা হয়েছে তার এটি একটি পূর্ণাঙ্গ অবস্থা। কিন্তু এগুলি গুণাতীত অবস্থা নয়। তাই যে সাধক গুণাতীত অবস্থা চান, ব্রহ্মপদের আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁকে ওই ঐশ্বর্যকে অগ্রাহ্য করে মায়ের নিকট আরও দেহি দেহি করেই সেই মোক্ষ বা ব্রহ্মপদ আদায় করে নিতে হয়—যা পাঠকের ত্রিগুণরহিত, দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা। সেখানে আর দুঃখ নেই, শোক নেই, আসা নেই, যাওয়া নেই, চাওয়া নেই, পাওয়া নেই এমন একটি অবস্থা। কিন্তু মনে রাখতে হবে সাধনার প্রথম ফল ওইগুলি যেন সাধকের মনকে প্রলুব্ধ বা অভিভূত করতে না পারে সেজন্য হৃদি মন্দিরে দিতে হবে অর্গল।

তাহলে এবার আমরা মায়ের প্রসন্নতালাভে নিবিষ্ট মনে পাঠ করি—

# অর্গলাস্তোত্রম্

ওঁ হ্রীঁং নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ওঁ মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ওঁ জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপ হারিণি*।
জয় সর্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোঽস্তু তে।। ১
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে।। ২
মধুকৈটভবিধ্বংসি** বিধাতৃ-বরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।। ৩
মহিষাসুরনির্ণাশি ভক্তানাং সুখদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।। ৪
ধূম্রনেত্রবধে দেবি ধর্মকামার্থদায়িনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।। ৫
রক্তবীজবধে দেবি চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।। ৬
নিশুম্ভশুম্ভনির্ণাশি ত্রৈলোক্যশুভদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।। ৭
বন্দিতাঙ্ঘ্রিযুগে দেবি সর্বসৌভাগ্যদায়িনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।। ৮
অচিন্ত্যরূপচরিতে সর্বশত্রুবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।। ৯
নতেভ্যঃ সর্বদা ভক্ত্যা চাপর্ণে দুরিতাপহে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।। ১০
স্তুবদ্ভ্যো ভক্তিপূর্বং ত্বাং চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।। ১১
চণ্ডিকে সততং যুদ্ধে জয়ন্তি পাপনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।। ১২
দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।। ১৩

---

* পাঠান্তর — ভূতাপসারিণি ইতি বা।
** মদুকৈটভিদ্রাবি ইতি বা পাঠঃ।

বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।। ১৪
বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।। ১৫
সুরাসুরশিরোরত্ন-নিঘৃষ্টচরণাম্বুজে*।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।। ১৬
বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।। ১৭
দেবি প্রচণ্ডদোর্দণ্ড-দৈত্যদর্পনিসূদিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।। ১৮
প্রচণ্ডদৈত্যদর্পঘ্নে চণ্ডিকে প্রণতায় মে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।। ১৯
চতুর্ভুজে চতুর্বক্ত্র-সংস্তুতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।। ২০
কৃষ্ণেন সংস্তুতে দেবি শশ্বদ্ভক্ত্যা সদাম্বিকে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।। ২১
হিমাচলসুতানাথ-সংস্তুতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।। ২২
ইন্দ্রাণীপতিসদ্ভাব-পূজিতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।। ২৩
দেবি ভক্তজনোদ্দাম-দত্তানন্দোদয়েঽম্বিকে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।। ২৪
ভার্যাং[১] মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।। ২৫
তারিণি দুর্গসংসার-সাগরস্যাচলোদ্ভবে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।। ২৬
ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মহাস্তোত্রং পঠেন্ নরঃ।
সপ্তশতীং সমারাধ্য বরমাপ্নোতি দুর্লভম্।। ২৭

ইতি অর্গলাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

---

* পাঠান্তর চরণেঽম্বিকে ইতি বা।
১। পাঠান্তর—ভক্তিং

# মাকে করো পরম আপন

## (কীলক স্তব)

"কীলক" কথাটির আভিধানিক অর্থ হল—হুড়কো, খিল, গোঁজ, খোঁটা ইত্যাদি। এগুলি দিয়ে কি হয় তা অবশ্যই আমাদের অজানা নয়। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে থাকার জন্য বা ঘুমোবার জন্য আমরা ঘরে হুড়কো বা খিল লাগিয়ে দিই। আবার আমরা দেখি গরু, ছাগল, প্রভৃতি প্রাণীকে গোঁজ বা খোঁটায় বেঁধে দিয়ে ওই গরু বা ছাগলের মালিক নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় অর্জুন বলেছেন—

**চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।**

**তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।।** ৬/৩৪

অর্থাৎ—হে কৃষ্ণ। মন অতি চঞ্চল, প্রবল এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষেপ উৎপাদক। একে বিষয়-বাসনা থেকে নিবৃত্ত করা অত্যন্ত কঠিন। সেজন্য তাকে নিরোধ করা আকাশস্থিত বায়ুকে পাত্র বিশেষে আটকে রাখার মতই দুঃসাধ্য বলে মনে করি।

মনের এই যে অবস্থাটি অর্জুন বলেছেন—তা সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। খুব কম সংখ্যক মানুষ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে যাঁরা অভ্যাস ও বৈরাগ্যের মধ্য দিয়ে ওই বায়ুর মত চঞ্চল মনকে শান্ত ও সংযত করেছেন। কিন্তু সকলে তো তা পারেননি। তাহলে যে মন সতত চঞ্চল, বহির্মুখী সেই মন নিয়ে কি মায়ের সাধনা হবে? মায়ের করুণা পাওয়া যাবে? — যাবে না। মায়ের করুণা কেন, চঞ্চল মন নিয়ে ছোট-বড় কোন কাজেই সফল হওয়া যায় না। এমনকি যে চণ্ডীপাঠে মায়ের করুণা সহজলভ্য তাও পাওয়া যাবে না। তাই মহাজ্ঞানী ঋষি মার্কণ্ডেয় মাতৃ-কৃপাপ্রার্থী সাধকদলের কল্যাণের জন্য সপ্তশতী শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠের পূর্বে এমন একটি ব্যবস্থা করলেন যার দ্বারা সাধকের মনের চঞ্চলতা দূর হয়ে হবে শান্ত। বহির্মুখী মন অন্তর্মুখী হয়ে হবে মায়ের শ্রীচরণে লগ্ন। সেই ব্যবস্থাটি কি? সেই ব্যবস্থাটিই হল শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠের পূর্বে কীলকস্তব পাঠ করা। এই স্তব পাঠ করলে পাঠকের মন হুড়কো বা খিল দেওয়া ঘরের মতো নিজের মধ্যেই শান্ত-সংযত হয়ে অবস্থান করে।

তখন সাধক শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ বা মায়ের সাধনা করে সাফল্যের দিকে এগিয়ে যান। অর্থাৎ সাধক মন্ত্রসিদ্ধির কাজে যে-সকল বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এই কীলকস্তব সে সকল বাধাকে দূর করে দেয়। এটিও শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তোত্র। এই কীলকস্তবের ঋষি হলেন মহাদেব। ঋষি মার্কণ্ডেয় তাঁর শিষ্যদের এই স্তবটি বলতে গিয়ে মহাদেবকে বার বার প্রণাম করে বলেছেন—বিশুদ্ধ জ্ঞান যাঁর দেহস্বরূপ, তিন বেদ যাঁর দিব্য চক্ষুস্বরূপ, যিনি মোক্ষলাভের কারণ এবং যাঁর ললাটে অর্ধচন্দ্র শোভিত, সেই মহাদেব শিবকে বার বার প্রণাম করি।

এরপর বলছেন—কীলকস্তব সকল মন্ত্রসিদ্ধির বিঘ্ননাশকারী বলে জানবে। যিনি সর্বদা এই কীলকস্তব পাঠ করেন তিনিও মঙ্গল লাভ করেন। এই চণ্ডীস্তোত্র দ্বারা ভক্তি পূর্বক দেবীর স্তব করলে উচ্চাটনাদি অভিচার কর্মসমূহ সিদ্ধ হয়। সেই ব্যক্তির কার্য সিদ্ধিলাভে মন্ত্র, ঔষধ বা অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। মন্ত্রজপ ব্যতীত কেবল এই স্তোত্র পাঠেই তাঁর সকল উচ্চাটনাদি কার্য সফল হয়। অল্প আয়াসসাধ্য চণ্ডীপাঠেই সকল অভিলাষ সিদ্ধ হয় কি-না লোকের মধ্যে এরকম সন্দেহ আশঙ্কা করেই দেবাদিদেব মহাদেব সকলকে আহ্বান করে বললেন — এই সপ্তশতী স্তোত্রই সকলের পক্ষে পরম কল্যাণপ্রদ। তারপর তিনি দেবী চণ্ডিকার এই স্তবটি গোপন করে রাখলেন। যথাবিধি সাধনশীল ব্যক্তির মত এই স্তবপাঠক এই স্তোত্র (সপ্তশতী) পাঠে সুপুণ্যের দ্বারা দেবীকে লাভ করেন। অতএব তাঁর যে সকল কল্যাণই হয়, এতে কোন সংশয়ই নেই। যিনি কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী বা চতুর্দশীতে সমাহিত চিত্তে বিধিপূর্বক এই স্তোত্র পাঠ করেন বা শোনেন, তাঁর প্রতি দেবী প্রসন্না হন—অন্য কোনভাবেই নয়। এরকম কীলকের দ্বারাই মহাদেব চণ্ডীকে কীলিত বা বেষ্টিত করেছেন। যে ব্যক্তি এই কীলকস্তব পাঠ পূর্বক চণ্ডীকে কীলক শূন্য করে অর্থাৎ চণ্ডীতে প্রাণ মন এক করে প্রত্যহ শুদ্ধভাবে চণ্ডীপাঠ করেন, তিনি পরজন্মে নিশ্চয়ই দেবীর গণ, সিদ্ধ বা গন্ধর্ব হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কোন কাজে অপটুতা থাকে না। তাঁর কোথাও ভয় থাকে না। তিনি কখনও অপমৃত্যুর অধীন হন না এবং মৃত্যুর পরে মোক্ষলাভ করেন। অর্থবোধসহ এই কীলকস্তব পাঠ করা উচিত। তা যিনি না করেন তাঁর চণ্ডী পাঠের ফল নষ্ট হয়। এরকম সম্পূর্ণভাবে জেনেই পণ্ডিত ব্যক্তিরা কীলক স্তব পাঠের শেষে অর্থবোধ পূর্বক চণ্ডীপাঠ করেন। নারীগণের

সৌভাগ্যাদি যা কিছু দেখা যায় সে সকলই এই চণ্ডীপাঠের ফলে লাভ হয়। সুতরাং এই শুভ স্তোত্র (চণ্ডী) নিত্য পাঠ করা উচিত।

ঋষি আরও বলছেন—চণ্ডীপাঠ ধীরে ধীরে করলে লাভ হয় সামান্য এবং উচ্চৈঃস্বরে চণ্ডীপাঠ করলে ফললাভ হয় অনেক বেশি। তবে চণ্ডীপাঠ উচ্চৈঃস্বরেই করা কর্তব্য। যদি শ্রীশ্রীচণ্ডীর কৃপাতেই লোকের ঐশ্বর্য, সৌভাগ্য, আরোগ্য, শত্রুনাশ এবং পরম মোক্ষলাভ হয়ে থাকে, তবে কেন লোকে তাঁর স্তব অর্থাৎ শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করে না? যে লোক অন্তরে নিরন্তর দেবী চণ্ডিকার স্মরণ করেন, তাঁর হৃদয়ের সকল কামনা পূর্ণ হয় এবং তাঁর হৃদয়ে দেবী সর্বদাই বিরাজ করেন।

প্রথমে মহাদেবকৃত সিদ্ধিলাভে বিঘ্ন বিনাশী এই কীলক স্তব পাঠ করে শ্রীশ্রীচণ্ডীকে কীলকহীন করে অর্থাৎ শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভাবে একান্ত তন্ময় হয়ে সমাহিত চিত্তে অর্থবোধ সহকারে শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করা কর্তব্য।

তাহলে এবার আমরাও মায়ের শ্রীচরণে মনকে পরিপূর্ণরূপে নিবিষ্ট করার জন্য কীলক স্তব পাঠ করি। তারপরেই তাহলে শুরু করব গল্পে শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করতে।

## অথ কীলকস্তবঃ

### ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

### মার্কণ্ডেয় উবাচ

ওঁ বিশুদ্ধজ্ঞান-দেহায় ত্রিবেদী-দিব্যচক্ষুষে।
শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তিনিমিত্তায় নমঃ সোমার্ধধারিণে।। ১
সর্বমেতদ্ বিজানীয়ান্ মন্ত্রাণামপি কীলকম্।
সোঽপি ক্ষেমম্ অবাপ্নোতি সততং জপ্য-তৎপরঃ।। ২
সিধ্যন্ত্যুচ্চাটনাদীনি কর্মাণি সকলান্যপি।
এতেন স্তুবতাং দেবীং স্তোত্রবৃন্দেন ভক্তিতঃ।। ৩
ন মন্ত্রো নৌষধং তস্য ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে।
বিনা জপ্যেন সিধ্যেত্তু সর্বম্ উচ্চাটনাদিকম্।। ৪
সমগ্র্যাণ্যপি সেৎস্যন্তি লোকে শঙ্কামিমাং হরঃ।

কৃত্বা নিমন্ত্রয়ামাস সর্বমেবমিদং শুভম্।। ৫
স্তোত্রং বৈ চণ্ডিকায়াস্তু তচ্চ গুহ্যং চকার সঃ।
সমাপ্নোতি সুপুণ্যেন তাং যথাবন্নিয়ন্ত্রণাম্।। ৬
সোঽপি ক্ষেমম্ অবাপ্নোতি সর্বমেব ন সংশয়ঃ।
কৃষ্ণায়াং বা চতুর্দশ্যাম্ অষ্টম্যাং বা সমাহিতঃ।। ৭
দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি নান্যথৈষা প্রসীদতি।
ইত্থং রূপেণ কীলেন মহাদেবেন কীলিতম্।। ৮
যো নিষ্কীলাং বিধায়ৈনাং চণ্ডীং জপতি নিত্যশঃ।
সঃ সিদ্ধঃ সঃ গণঃ সোঽথ গন্ধর্বো জায়তে ধ্রুবম্।। ৯
ন চৈবাপাটবং তস্য ভয়ং ক্বাপি ন জায়তে।
নাপমৃত্যুবশং যাতি মৃতে চ মোক্ষম্ আপ্নুয়াৎ।। ১০
জ্ঞাত্বা প্রারভ্য কুর্বীত হ্যকুর্বাণো বিনশ্যতি।
ততো জ্ঞাত্বৈব সম্পূর্ণমিদং প্রারভ্যতে বুধৈঃ।। ১১
সৌভাগ্যাদি চ যৎ কিঞ্চিদ্দৃশ্যতে ললনাজনে।
তৎ সর্বং তৎপ্রসাদেন তেন জপ্যমিদং শুভম্।। ১২
শনৈস্তু জপ্যমানেঽস্মিন্ স্তোত্রে সম্পত্তিরুচ্চকৈঃ।
ভবত্যেব সমগ্রাপি ততঃ প্রারভ্যমেব তৎ।। ১৩
ঐশ্বর্যং তৎপ্রসাদেন সৌভাগ্যারোগ্যমেব চ।
শত্রুহানিঃ পরো মোক্ষঃ স্তূয়তে সা ন কিং জনৈঃ।। ১৪
চণ্ডিকাং হৃদয়েনাপি যঃ স্মরেৎ সততং নরঃ।
হৃদ্যং কামম্ অবাপ্নোতি হৃদি দেবী সদা বসেৎ।। ১৫
অগ্রতোঽমুং মহাদেবকৃতং কীলকবারণম্।
নিষ্কীলঞ্চ তথা কৃত্বা পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ।। ১৬
ইতি কীলকস্তবঃ সমাপ্ত।

---

* স-প্রাপ্নোতি ইতি বা পাঠঃ।

## আত্মরক্ষায় শ্রেষ্ঠ উপায় "দেবীকবচম্"

ঋষি মার্কণ্ডেয় ভগবান ব্রহ্মার কাছে যে উপায়ে জগতের সকল লোকের মঙ্গল হতে পারে অথচ পরম গোপনীয় এবং যা অন্য কারও কাছে বলা হয়নি তা বলার জন্য অনুরোধ করলে ভগবান ব্রহ্মা তাঁকে বলেন—দেবীর পবিত্র কবচই অতি গোপনীয় এবং সকল জীবের পক্ষে হিতকারী। তারপর তিনি বলতে থাকেন—প্রথম শৈলপুত্রী, দ্বিতীয় ব্রহ্মচারিণী, তৃতীয় চন্দ্রঘন্টা, চতুর্থ কুষ্মাণ্ডা, পঞ্চম স্কন্দমাতা, ষষ্ঠ কাত্যায়নী, সপ্ত কালরাত্রি, অষ্টম মহাগৌরী এবং নবম হলেন সিদ্ধিদাত্রী—এঁরা হলেন নবদুর্গা।

যারা অগ্নিতে, যুদ্ধক্ষেত্রে, শত্রুমধ্যে অথবা বিষম সঙ্কটে পড়ে দেবীর শরণাগত হয়, তাদের রণসঙ্কটে কোন অমঙ্গল হয় না এবং তাদের শোক ও দুঃখময় কোন বিপদ হয় না। যারা নিত্য দেবীকে ভক্তিভাবে স্মরণ করে তাদের সম্পদ বৃদ্ধি হয়। দেবী তাদের রক্ষা করেন—এতে কোন সংশয় নেই।

শবারূঢ়া চামুণ্ডা, মহিষারূঢ়া বারাহী, গজারূঢ়া ইন্দ্রাণী, গরুড়বাহনা বৈষ্ণবী, মহাবীর্যা নারসিংহী, মহাবলশালিনী শিবদূতী, বৃষারূঢ়া মাহেশ্বরী, ময়ূরবাহনা কৌমারী, পদ্মাসনা পদ্মহস্তা হরিপ্রিয়া দেবী লক্ষ্মী, বৃষবাহনা শ্বেতবর্ণা ঈশ্বরী দেবী এবং হংসারূঢ়া সর্বালঙ্কারে শোভিতা ব্রাহ্মী—এই একাদশ মাতৃকা সর্ব যোগৈশ্বর্যশালিনী দিব্যহারযুক্তা এবং শ্রেষ্ঠ মুক্তা, বিবিধ রত্ন ও নানা অলঙ্কারে শোভিতা। ক্রোধান্বিতা ও রথারূঢ়া দেবীগণ ইন্দ্রনীল, মহানীল ও পদ্মরাগাদি মণিসমূহ দ্বারা বিভূষিতা হয়েছেন দেখা যাচ্ছে। এই দেবীগণ দৈত্যগণের দেহনাশ, ভক্তগণকে অভয় প্রদান এবং দেবতাদের মঙ্গলের কারণে শঙ্খ, চক্র, গদা, শক্তি, হল, মুষল, খেটক বা ঢাল, তোমর, পরশু, পাশ, কুন্তাস্ত্র, খড়্গ, ত্রিশূল, উৎকৃষ্ট ধনু এবং আরও বহুরকম অস্ত্র ধারণ করেন।

দেবীর শ্রীচরণে প্রার্থনা, হে মহাঘোর পরাক্রমশালিনী,

মহারুদ্ররূপিণী তোমাকে নমস্কার করি। হে মহাবলসমন্বিতে, মহা-উৎসাহযুক্তে, মহাভয়-বিনাশিনী, হে দুর্দর্শনীয়ে, শত্রুদের ভয়-বর্ধনকারিণী দেবী, আমাকে পরিত্রাণ কর।

এরপরই পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ প্রভৃতি কোন দিক থেকেই আমাদের বিপদ যেন না আসে, কেশাগ্র থেকে নখাগ্র পর্যন্ত যেন সুরক্ষিত থাকে সেজন্য দেবীর নিকট বিভিন্ন প্রার্থনা করা হয়েছে।

এই দেবীকবচের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে সুধীজন যেখানেই যায়, সে সেখানেই অর্থলাভ ও সর্বকালে বিজয় লাভ করে। সেই ব্যক্তি যা কিছু কামনা করে সবই নিশ্চিত রূপে লাভ করে। এবং জগতে পরম অতুলনীয় ঐশ্বর্যও তার আয়ত্তে আসে। এই কবচ দ্বারা আবৃত হয়ে মরণশীল মানুষ নির্ভয়, যুদ্ধে অপরাজিত এবং ত্রিভুবনে পূজনীয় হয়ে থাকে। দেবীর এই কবচ দেবগণেরও দুর্লভ। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত ও সংযত হয়ে নিত্য ত্রিসন্ধ্যা এই দেবীকবচ পাঠ করে, সে দৈবী সম্পদ লাভ করে ও ত্রিভুবনে অপরাজিত হয় এবং অপমৃত্যু বর্জিত হয়ে পূর্ণ একশ বছর বেঁচে থাকে। তার লূতা-বিস্ফোটকাদি অর্থাৎ পৃষ্ঠব্রণাদি ব্যাধি নষ্ট হয়। স্থাবর, জঙ্গম ও কৃত্রিম কোনরকম বিষ তাঁর ক্ষতি করতে পারে না।

এই পৃথিবীতে অভিচার-কার্যবিষয়ক যে সকল মন্ত্র ও যন্ত্র আছে, যে ব্যক্তি এই দেবীকবচ শ্রদ্ধাসহকারে নিত্য পাঠ করে তাকে ওই সকল অভিচার কোনরকম অনিষ্ট করতে পারে না। তাকে দেখে ভূচর, খেচর, অপদেবতা, ক্ষুদ্র দেবতা, সহজা সহোদর, সাপ, মালা, ডাকিনী, শাকিনী, আকাশচারিণী ভয়ানক মহাশব্দকারিণী ডাকিনিগণ, গ্রহগণ, ভূত, পিশাচ, যক্ষ, গন্ধর্ব, রাক্ষস, ব্রহ্মদৈত্য, বেতাল, কুষ্মাণ্ড এবং ভৈরব প্রভৃতি পালিয়ে যায়। যে লোক সবসময় এই কবচ দ্বারা সুরক্ষিত হয় তার যশ ও কীর্তি বাড়ে। অতএব সর্বকামনা পূর্ণকারী এই কবচ সর্বদা ভক্তিযুক্ত চিত্তে পাঠ করা উচিত।

তাহলে এখন আমরা শ্রদ্ধা সহকারে দেবীকবচ পাঠ করি—

# অথ দেবীকবচম্।

ওঁ অস্য দেবীকবচস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দো চামুণ্ডা দেবতা
শ্রীশ্রীদেবীপ্রীত্যর্থং সপ্তশতীপাঠাঙ্গজপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ওঁ মার্কণ্ডেয় উবাচ

ওঁ যদ্ গুহ্যং পরমং লোকে সর্ব্বরক্ষাকরং নৃণাম্।
যন্ন কস্যচিদাখ্যাতং তন্মে ব্রূহি পিতামহ।। ১

ব্রহ্মোবাচ

অস্তি গুহ্যতমং বিপ্র সর্বভূতোপকারকম্।
দেব্যাস্তু কবচং পুণ্যং তৎ শৃণুষ্ব মহামুনে।। ২
প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী।
তৃতীয়ং চন্দ্রঘণ্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্।। ৩
পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা।
সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্।। ৪
নবমং সিদ্ধিদাত্রী চ নব দুর্গাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
উক্তান্যেতানি নামানি ব্রহ্মণৈব মহাত্মনা।। ৫
অগ্নিনা দহ্যমানাস্তু শত্রুমধ্যগতা রণে।
বিষমে দুর্গমে চৈব ভয়ার্তাঃ শরণং গতাঃ।। ৬
ন তেষাং জায়তে কিঞ্চিদ্ অশুভং রণসঙ্কটে।
আপদং ন চ পশ্যন্তি শোকদুঃখভয়ঙ্করীম্*।। ৭
যৈস্তু ভক্ত্যা স্মৃতা নিত্যং তেষাম্ ঋদ্ধিঃ প্রজায়তে।
যে ত্বাং স্মরন্তি দেবেশি রক্ষসি তান্ন সংশয়ঃ।। ৮
প্রেতসংস্থা চ চামুণ্ডা বারাহী মহিষাসনা।
ঐন্দ্রী গজসমারূঢ়া বৈষ্ণবী গরুড়াসনা।। ৯
নারসিংহী মহাবীর্যা শিবদূতী মহাবলা।
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া কৌমারী শিখিবাহনা।। ১০

---

* নাপদং তস্য পশ্যামি শোকদুঃখভয়ং ন হি ইতি বা পাঠঃ।

লক্ষ্মীঃ পদ্মাসনা দেবী পদ্মহস্তা হরিপ্রিয়া।
শ্বেতরূপধরা দেবী ঈশ্বরী বৃষবাহনা।। ১১
ব্রাহ্মী হংসসমারূঢ়া সর্বাভরণভূষিতা।
ইত্যেতা মাতরঃ সর্বাঃ সর্বযোগসমন্বিতাঃ।। ১২
নানাভরণশোভাঢ্যা নানারত্নোপশোভিতাঃ।
শ্রেষ্ঠৈশ্চ মৌক্তিকৈঃ সর্বা দিব্যহারপ্রলম্বিভিঃ। ১৩
ইন্দ্রনীলৈর্মহানীলৈঃ পদ্মরাগৈঃ সুশোভনৈঃ।
দৃশ্যন্তে রথমারূঢ়া দেব্যঃ ক্রোধসমাকুলাঃ।। ১৪
শঙ্খং চক্রং গদাং শক্তিং হলঞ্চ মুষলায়ুধম্।
খেটকং তোমরঞ্চৈব পরশুং পাশমেব চ।। ১৫
কুন্তায়ুধং ত্রিশূলঞ্চ শার্ঙ্গম্ আয়ুধম্ অনুত্তমম্।
দৈত্যানাং দেহনাশায় ভক্তানাম্ অভয়ায় চ।। ১৬
ধারয়ন্ত্যায়ুধানীত্থং দেবতানাঞ্চ হিতায় বৈ।
নমস্তেঽস্তু মহারৌদ্রে মহাঘোরপরাক্রমে।। ১৭
মহাবলে মহোৎসাহে মহাভয়বিনাশিনি।
ত্রাহি মাং দেবি দুষ্প্রেক্ষ্যে শত্রূণাং ভয়বর্ধিনি।। ১৮
প্রাচ্যাং রক্ষতু মাম্ ঐন্দ্রী আগ্নেয্যাম্ অগ্নিদেবতা।
দক্ষিণেঽবতু বারাহী নৈর্ঋত্যাং খড়্গধারিণী।। ১৯
প্রতীচ্যাং বারুণী রক্ষেদ্ বায়ব্যাং মৃগবাহিনী*।
উদীচ্যাং পাতু কৌবেরী ঐশান্যাং শূলধারিণী।। ২০
ঊর্ধ্বং ব্রহ্মাণী মে রক্ষেদ্ অধস্তাদ্ বৈষ্ণবী তথা।
এবং দশ দিশো রক্ষেচ্চামুণ্ডা শববাহনা।। ২১
জয়া মাম্ অগ্রতঃ পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ।
অজিতা বামপার্শ্বে তু দক্ষিণে চাপরাজিতা।। ২২
শিখাং মে দ্যোতিনী রক্ষেদ্ উমা মূর্ধ্নি ব্যবস্থিতা।
মালাধরী ললাটে চ ভ্রুবৌ রক্ষেৎ যশস্বিনী।। ২৩

---

* বায়ুদেবতা ইতি বা

নেত্রয়োশ্চিত্রনেত্রা চ যমঘণ্টা তু পার্শ্বকে।
ত্রিনেত্রা চ ত্রিশূলেন ভ্রুবোর্মধ্যে চ চণ্ডিকা।। ২৪
শঙ্খিনী চক্ষুষোর্মধ্যে শ্রোত্রয়োর্দ্বারবাসিনী।
কপালং কালিকা রক্ষেৎ কর্ণমূলে তু শঙ্করী।। ২৫
নাসিকায়াং সুগন্ধা চ উত্তরোষ্ঠে চ চর্চিকা।
অধরে চামৃতা বালা জিহ্বায়াঞ্চ সরস্বতী।। ২৬
দন্তান্ রক্ষতু কৌমারী কণ্ঠদেশে তু চণ্ডিকা।
ঘণ্টিকাং চিত্রঘণ্টা চ মহামায়া চ তালুকে।। ২৭
কামাক্ষী চিবুকং রক্ষেৎ বাচং মে সর্বমঙ্গলা।
গ্রীবায়াং ভদ্রকালী চ পৃষ্ঠবংশে ধনুর্ধরী।। ২৮
নীলগ্রীবা বহিঃকণ্ঠে নলিকাং নলকূবরী।
স্কন্ধয়োঃ খড়্গিনী রক্ষেদ্ বাহূ মে বজ্রধারিণী।। ২৯
হস্তয়োর্দণ্ডিনী রক্ষেদ্ অম্বিকা চাঙ্গুলীষু চ।
নখান্ সুরেশ্বরী রক্ষেৎ কুক্ষৌ রক্ষেন্ নরেশ্বরী।। ৩০
স্তনৌ রক্ষেন্ মহাদেবী মনঃশোকবিনাশিনী।
হৃদয়ে ললিতা দেবী উদরে শূলধারিণী।। ৩১
নাভৌ চ কামিনী রক্ষেদ্ গুহ্যং গুহ্যেশ্বরী তথা।
মেঢ্রং রক্ষতু দুর্গন্ধা পায়ুং মে গুহ্যবাহিনী।। ৩২
কট্যাং ভগবতী রক্ষেদূরূ মে মেঘবাহনা।
জঙ্ঘে মহাবলা রক্ষেজ্ জানূ মাধবনায়িকা।। ৩৩
গুল্ফয়োর্নারসিংহী চ পাদপৃষ্ঠে তু কৌশিকী।
পাদাঙ্গুলীঃ শ্রীধরী চ তলং পাতালবাসিনী।। ৩৪
নখান্ দংষ্ট্রাকরালী চ কেশাংশ্চৈবোর্ধ্বকেশিনী।
রোমকূপেষু কৌমারী ত্বচং যোগেশ্বরী তথা।। ৩৫
রক্তমজ্জাবসামাংসান্যস্থিমেদাংসি পার্বতী।
অন্ত্রাণি কালরাত্রী চ পিত্তঞ্চ মুকুটেশ্বরী।। ৩৬

পদ্মাবতী পদ্মকোষে কফে চূড়ামণিস্তথা।
জ্বালামুখী নখজ্বালাম্ অভেদ্যা সর্বসন্ধিষু।। ৩৭
শুক্রং ব্রহ্মাণী মে রক্ষেচ্ছায়াং ছত্রেশ্বরী তথা।
অহঙ্কারং মনো বুদ্ধিং রক্ষেন্মে ধর্মধারিণী।। ৩৮
প্রাণাপানৌ তথা ব্যানম্ উদানঞ্চ সমানকম্।
বজ্রহস্তা তু মে রক্ষেৎ প্রাণান্ কল্যাণশোভনা।। ৩৯
রসে রূপে চ গন্ধে চ শব্দে স্পর্শে চ যোগিনী।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব রক্ষেন্ নারায়ণী সদা।। ৪০
আয়ু রক্ষতু বারাহী ধর্মং রক্ষতু পার্বতী।
যশঃ কীর্তিঞ্চ লক্ষ্মীঞ্চ সদা রক্ষতু বৈষ্ণবী।। ৪১
গোত্রম্ ইন্দ্রাণী মে রক্ষেৎ পশূন্ রক্ষেচ্চ চণ্ডিকা।
পুত্রান্ রক্ষেন্ মহালক্ষ্মীর্ভার্যাং* রক্ষতু ভৈরবী।। ৪২
ধনেশ্বরী ধনং রক্ষেৎ কৌমারী কন্যকাং† তথা।
পন্থানং সুপথা রক্ষেন্ মার্গং ক্ষেমঙ্করী তথা।। ৪৩
রাজদ্বারে মহালক্ষ্মীর্বিজয়া সর্বতঃ স্থিতা।
রক্ষাহীনন্তু যৎ স্থানং বর্জিতং কবচেন তু।। ৪৪
তৎ সর্বং রক্ষ মে দেবি জয়ন্তি পাপনাশিনী।
সর্বরক্ষাকরং পুণ্যং কবচং সর্বদা জপেৎ।। ৪৫
ইদং রহস্যং বিপ্রর্ষে ভক্ত্যা তব ময়োদিতম্।
পাদমেকং ন গচ্ছেত্ তুযদীচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ।। ৪৬
কবচেনাবৃতো নিত্যং যত্র যত্রৈব গচ্ছতি।
তত্র তত্রার্থলাভশ্চ বিজয়ঃ সার্বকালিকঃ।। ৪৭
যং যং চিন্তয়তে কামং তং তং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
পরমৈশ্বর্যমতুলং প্রাপ্স্যতে ভূতলে পুমান্।। ৪৮

---

* সাধু-ব্রহ্মচারিগণ ভার্যাস্থলে ভক্তি বলিবেন।
† কন্যাস্থানীয়া শিষ্যা-সাধু-ব্রহ্মচারীদের এরূপ অর্থ গ্রহণীয়।

নির্ভয়ো জায়তে মর্ত্যঃ সংগ্রামেষ্বপরাজিতঃ।
ত্রৈলোক্যে তু ভবেৎ পূজ্যঃ কবচেনাবৃতঃ পুমান্।। ৪৯
ইদন্তু দেব্যাঃ কবচং দেবানামপি দুর্লভম্।
যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।। ৫০
দৈবী কলা ভবেত্তস্য ত্রৈলোক্যে চাপরাজিতঃ।
জীবেদ্ বর্ষশতং সাগ্রম্ অপমৃত্যুবিবর্জিতঃ।। ৫১
নশ্যন্তি ব্যাধয়ঃ সর্বে লূতা-বিস্ফোটকাদয়ঃ।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব কৃত্রিমঞ্চৈব যদ্ বিষম্।। ৫২
অভিচারাণি সর্বাণি মন্ত্রযন্ত্রাণি ভূতলে।
ভূচরাঃ খেচরাশ্চৈব কুলজাশ্চোপদেশিকাঃ।। ৫৩
সহজাঃ কুলজা মালা ডাকিনী শাকিনী তথা।
অন্তরীক্ষচরা ঘোরা ডাকিন্যশ্চ মহারবাঃ।। ৫৪
গ্রহভূতপিশাচাশ্চ যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-রাক্ষসাঃ।
ব্রহ্মরাক্ষস-বেতালাঃ কুষ্মাণ্ডা ভৈরবাদয়ঃ।। ৫৫
নশ্যন্তি দর্শনাৎ তস্য কবচেনাবৃতো হি যঃ।
মানোন্নতির্ভবেদ্ রাজ্ঞস্তেজোবৃদ্ধিঃ পরা ভবেৎ।। ৫৬
যশোবৃদ্ধির্ভবেৎ পুংসাং কীর্তিবৃদ্ধিশ্চ জায়তে।
তস্মাজ্জপেৎ সদা ভক্তঃ কবচং কামদং মুনে।। ৫৭
জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্বা তু কবচং পুরা।
নির্বিঘ্নেন ভবেৎ সিদ্ধিশ্চণ্ডীজপ-সমুদ্ভবা।। ৫৮
যাবদ্ ভূমণ্ডলং ধত্তে সশৈলবনকাননম্।
তাবৎতিষ্ঠতি মেদিন্যাং সন্ততিঃ পুত্রপৌত্রিকী।। ৫৯
দেহান্তে পরমং স্থানং যৎ সুরৈরপি সুদুর্লভম্।
প্রাপ্নোতি পুরুষো নিত্যং মহামায়াপ্রসাদতঃ।। ৬০
তত্র গচ্ছতি গত্বাসৌ পুনশ্চাগমনং ন হি।
লভতে পরমং স্থানং শিবেন সমতাং ব্রজেৎ।। ৬১
ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে শ্রীহরিহরব্রহ্ম-বিরচিতং দেবীকবচং সমাপ্তম্।

# দেবীর বাহনটি কে?

দেবীর বাহন কে হতে পারেন?

দেবী চণ্ডিকা-পরমেশ্বরী। তিনি সর্বশক্তিসমন্বিতা। সুতরাং তাঁকে যিনি বহন করবেন তিনি তো সাধারণ হলে চলে না। তিনিও নিশ্চয় হবেন বিরাট। তাঁরও শক্তি হবে অনন্ত। তেজো-বীর্য হবে অফুরন্ত। তা না হলে মহাদেবীর বাহন তিনি হবেন কি করে। দেবীর বাহন সিংহ কি চরিত্রের, কি তাঁর রূপ, কেমন আকৃতি এসব কথাই সেজন্য বলে দেওয়া হয়েছে তাঁর ধ্যানমন্ত্রে। সেখানে বলা হয়েছে—

**গ্রীবায়াং মধুসূদনোঽস্য শিরসি শ্রীনীলকণ্ঠঃ স্থিতঃ**
**শ্রীদেবী গিরিজা ললাটফলকে বক্ষঃস্থলে শারদা।**
**ষড়্‌বক্ত্রো মণিবন্ধসন্ধিষু তথা নাগাস্তু পার্শ্বস্থিতাঃ**
**কর্ণৌ যস্য তু চাশ্বিনৌ মা ভগবান্ সিংহো মমাস্ত্বিষ্টদঃ।। ১**
**যন্নেত্রে শশিভাস্করৌ বসুকুলং দন্তেষু যস্য স্থিতং**
**জিহ্বায়াং বরুণস্তু হুঙ্কৃতিরিয়ং শ্রীচর্চিকা চণ্ডিকা।**
**গণ্ডৌ যক্ষযমৌ তথৌষ্ঠযুগলং সন্ধ্যাদ্বয়ং পৃষ্ঠকে**
**বজ্রী যস্য বিরাজতে স ভগবান্ সিংহো মমাস্ত্বিষ্টদঃ।। ২**
**গ্রীবাসন্ধিষু সপ্তবিংশতিমিতান্যৃক্ষাণি সাধ্যা হৃদি**
**প্রৌঢ়া নির্ঘৃণতা তমোঽস্য তু মহাক্রৌর্যৈঃ সমাঃ পূতনাঃ।**
**প্রাণে যস্য তু মাতরঃ পিতৃকুলং যস্যাস্ত্যপানাত্মকং**
**রূপে শ্রীকমলা কচেষু বিমলা তে স্যু রবেঃ রশ্ময়ঃ।। ৩**

ধ্যানমন্ত্রে দেখা যাচ্ছে—দেবীর বাহন সিংহের গলদেশে আছেন শ্রীমধুসূদন বা বিষ্ণু। মাথায় আছেন নীলকণ্ঠ বা শিব, ললাটে রয়েছেন দেবী পার্বতী, সিংহের বক্ষস্থলে দেবী দুর্গা, মণিবন্ধে কার্তিকেয়। দুই পাশে নাগগণ, কর্ণযুগলে অশ্বিনী কুমারদ্বয় বিরাজ করছেন। না শুধু তাই নয়, আরও আছেন। তাঁর নয়ন যুগলে চন্দ্র ও সূর্য। তাঁর দাঁতগুলিতে বসুগণ। তাঁর জিহ্বাতে বরুণ। গর্জনে শ্রীদুর্গা চণ্ডিকা। দুই গণ্ডে যক্ষ ও

যম, দুই ওষ্ঠে দুই সন্ধ্যাদেবী এবং পৃষ্ঠে বজ্রধারী দেবরাজ ইন্দ্রের অবস্থান। তাছাড়াও আছেন তাঁর গলদেশে সাতাশটি নক্ষত্র এবং হৃদয়ে সাধ্য নামক দেবগণ। সিংহের তমঃ ভাব বা তামসিক ভাবের প্রকাশ হয় তাঁর অত্যধিক নিষ্ঠুরতায়। তাঁর সেই অত্যন্ত নিষ্ঠুরতাকে পূতনার নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পূতনা মানে দানব কংসের যে শক্তি স্তনে বিষ মাখিয়ে শিশু কৃষ্ণকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। দেবীর বাহন সিংহের নিষ্ঠুরতা সেই পূতনার মত বলা হচ্ছে। আরও বলা হয়েছে যাঁর প্রাণবায়ুতে মাতৃগণ, অপান বায়ুতে পিতৃগণ; যিনি রূপে লক্ষ্মীদেবী এবং সূর্যের কিরণ তুল্য কেশরগুলিতে দেবী বিমলা বিরাজ করছেন, সেই দেবীর বাহন সিংহকে ভগবান বলা হয়েছে। তিনি সাধারণ সিংহ নন। বাস্তবিকই তো তিনি অনন্য সাধারণ না হলে, অনন্ত শক্তিসম্পন্না মাকে বহন করবেন কি করে, তাঁর কাজের যোগ্য বিবেচিত হবেন কি ভাবে। তাই দেখা যাচ্ছে দেবীর বাহন সিংহ সকল শ্রেষ্ঠ দেবতার বলে বলীয়ান ও তেজে তেজীয়ান। তাঁকে আমরা প্রণাম করি। তাঁর কাছে আমাদের প্রার্থনা তিনি যেন আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ করেন।

# শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করব কেন?

মানুষ কি চায়? এ প্রসঙ্গে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ বলেছেন—'মানুষ চায়—শান্তি, শক্তি ও মুক্তি।' এই শান্তি, শক্তি ও মুক্তি লাভের উপায় কি? তার উত্তরও তিনি দিয়েছেন—'ভিতর ও বাহিরে সংগ্রাম দ্বারা।' আরও বলছেন — 'যেখানে সংগ্রাম নাই, সেখানে সাধনাও নাই।' তিনি এই সংগ্রাম বলতে বলেছেন সাধনাকে। বাস্তবিকই তো বিনা সাধনায় জগতে কি কেউ কোন কিছু লাভ করতে পারে? পারে না। যে-কোন কিছু পেতে হলে সাধনা করতেই হবে। সে সাধনা ক্ষুদ্রও হতে পারে—আবার বৃহৎও হতে পারে। সাধারণভাবে হতে পারে, আবার অসাধারণভাবেও হতে পারে। অল্পায়াসে হতে পারে, আবার বহুদিনের বহু কষ্টের ফলেও হতে পারে। তাই, তিনি সাধনাকেই সংগ্রাম বলেছেন। সে-কথাও যুক্তিপূর্ণই। কারণ, যে কোন বস্তু লাভ অনায়াসে যখন হয় না, তার জন্য যেমন চেষ্টা, যত্ন, উদ্যোগ প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন কার্যকে সফলতা লাভের দৃঢ় সঙ্কল্প। চাই কার্য সফল করতে পারার মত দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। সুতরাং সেটি তো অবশ্যই সংগ্রাম। সে সংগ্রাম ভিতরে যেমন হয়, তেমনি বাহিরেও হয়। কারণ কোন কাজ করতে গেলে মনের ভাবনা অনেক সময় অনেক রকম হতেই পারে। সেখানে সর্বদা ছলনাময় মনের সঙ্গে লড়াই করে চঞ্চল মনকে ঠিক রাখতে সংগ্রাম করতে হয়। এটি ভিতরের সংগ্রাম। আর যে-কোন কাজ করতে গেলে বাইরের থেকে বহু বাধা বিঘ্ন আসে। সেগুলিকেও সাধকের জয় না করে এগিয়ে যাওয়ার উপায় থাকে না।

সব মানুষই সেভাবেই সাধনা করেন। সাধনার পথে এগিয়ে যান। সফলও হন। কিন্তু এই সাধনা শুধুমাত্র একমুখী হলেই সফল হয় না। অর্থাৎ শুধুমাত্র পুরুষাকারের পথ ধরেই হয় না। সেখানে চাই দৈবানুগ্রহ বা শ্রীশ্রীগুরুর কৃপাও। আবার শুধুমাত্র দৈবনির্ভর হয়ে থাকলেও কার্যে

সফলতা, সাধনায় সিদ্ধি আসে না। চাই নিজের চেষ্টা-যত্ন-উদ্যোগ-উৎসাহ। চাই বীরত্ব-পুরুষত্ব। চাই আত্মশক্তিতে আস্থা— না হলে চলে না। সাধকেরা, জ্ঞানীরা সে-কথাই বলেন। এ বিষয়ে চাণক্য শ্লোকেও আছে—

**উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্যাণি ন মনোরথৈঃ।**
**ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।।**
**অর্থাৎ— উদ্যমেই কার্য সিদ্ধি, সঙ্কল্পেতে নয়।**
**সুপ্ত-সিংহ মুখে মৃগ নাহি প্রবেশয়।।**

কর্ণের মতো বীরযোদ্ধা মহাভারতে ক'জন ছিলেন? কিন্তু দৈব তাঁর অনুকুলে না থাকায় তিনি পরাজিত হয়েছেন। শুধুমাত্র পুরুষাকারের এই একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। আবার শুধুমাত্র দৈবনির্ভর হলেও যে কার্যসিদ্ধি হয় না তার একটি ছোট্ট উদাহরণ দিলে বোধ হয় ভাল হয়।

কোন গ্রামের এক চাষী তার জমির ফসল কেটে গরুর গাড়ীতে করে নিয়ে চলেছে। যাওয়ার সময় একটি ছোট্ট খালের কাদায় গাড়ীটির একটি চাকা বসে যায়। গরুগুলি টেনে তুলতে চেষ্টা করেও পারল না। চাষী দেখে-শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে, আর ভগবানকে ডাকতে থাকে — হে ভগবান, আমার গাড়ীটি এই খাল থেকে তুলে দাও। এভাবে চাষী অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করা সত্ত্বেও তাকে সাহায্য করতে ভগবান কেন, কেউই এল না। কিছুক্ষণ পর তারই গ্রামের আর একজন চাষী সেই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় চাষীকে ওইভাবে মাথায় হাত দিয়ে বসে কাঁদতে দেখে ও তার গাড়ীটিকে ওইভাবে কাদায় আটকে থাকতে দেখে সে জিজ্ঞাসা করে—কি হয়েছে? তখন সে সব শুনে বলে আরে ভাই গরুগুলি তো গাড়ীটি টানছেই। তার সঙ্গে তুমিও একটু গাড়ীর পেছন থেকে ঠেলে দিলেই তো হয়ে যায়। এই বলে সে গাড়ীর পিছনে একটু ঠেলে দিল, অমনি গাড়ীটি কাদা থেকে উঠে গেল। এবার দ্বিতীয় চাষী বলল তুমি যদি নিজে চেষ্টা করতে এবং ভগবানকে ডাকতে তাহলে

ভগবান নিশ্চয় তোমাকে সাহায্য করতেন, কিন্তু যেহেতু তুমি নিজে চেষ্টা করোনি সেজন্য ভগবানও তোমাকে কোনো সাহায্য করেননি।

যা হোক, সমাজের প্রায় সব মানুষকেই আমরা যেসব কাজ করতে দেখি, তারা যেমন নিজেরা চেষ্টা করে, তেমনি দৈবনির্ভরতা, গুরুনির্ভরতাও তাদের থাকে। এ-বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রেও বলা হয়েছে 'নচ দৈবাৎ পরং বলম্'—অর্থাৎ দৈব হতে শ্রেষ্ঠ বল আর কিছু নেই। তাঁকে তারা মানে। তারা মানে বলেই বিভিন্ন মন্দিরে যায়, পূজা দেয়, মানৎ করে। সে কারণেই দেশে এত মন্দির গড়ে উঠেছে। মন্দিরগুলিতে এত মানুষের সমাগম হচ্ছে.....ইত্যাদি।

কিন্তু এখানে একটা কথা—দেশে এত মন্দির আছে, দেবতা আছেন। সেখানে এত মানুষের ভীড় জমে, তারা পূজা দেয়, মানৎ করে। কিন্তু তাদের সকলেরই কি মনের অভিলাষ পূর্ণ হয়? মনে হয়, হয় না। হয় না বলেই জগতের মানুষের এত দুঃখ-দুর্দশা। তাহলে হয় না কেন? সেটিই প্রশ্ন। না হওয়ার কারণ যতদূর মনে হয়—আমরা যাঁর পূজা করি, যাঁর নিকট আমাদের অন্তরের আকাঙক্ষা পূরণের জন্য ছুটে ছুটে যাই, মানৎ করি, তাঁর পরিচয় হয়তো ঠিকমত জানি না বা আদৌ বুঝি না তাকে কিভাবে পূজা করলে তিনি প্রসন্ন হন। আবার জেনেও হয়তো ঠিক মত তাঁর পূজা না হওয়াও একটি কারণ অবশ্যই হতে পারে। তবে যুক্তি দেখিয়ে অনেকেই বলতে পারেন দেবতার যথাযথভাবে পূজা দিলেই কি দুঃখ-দৈন্য-বিপদ-আপদ সব কেটে যাবে? না কারও মৃত্যু হবে না? না যে যা চাইবে সবাই সব পেয়ে যাবে? এ নিয়ে যুক্তি-তর্ক অনাবশ্যক। তবে যে-কোন কার্যসিদ্ধির জন্য ঠিক মত প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ দৈব নির্ভরতায় যে মানুষ সফল হয় তার বহু প্রমাণ আছে। কিন্তু একথাও ঠিক যে, মানুষ যে সকল দেবতার কাছে মনের অভিলাষ পূরণের জন্য ছুটে যায়, তাঁদের পরিচয় অনেকেই ঠিকমত জানে না। ঠিকমত পদ্ধতিতে পূজাও হয়তো হয় না। এমনকি

মনের যে ব্যাকুলতা তাতে ঘাটতিও অসঙ্গত নয়।

সে যাক্। আমরা যেসকল দেবতার পূজা করি যাঁদের কাছে আমাদের প্রার্থনা পূরণের প্রত্যাশা করি—তাঁদের মধ্যে অন্যতমা হলেন শ্রীশ্রীদুর্গা বা শ্রীশ্রীকালীও। বাঙালীর আকর্ষণ অবশ্যই মা কালীর প্রতিই বেশি। যেজন্য অনেকে বলেন—'যেখানে বাঙালী সেখানেই কালী'—কথাটি মিথ্যা নয়।

এখন যদি আমরা আমাদের মা কালীর পূজা বা মা দুর্গার পূজা প্রসঙ্গেই ধরি, তবে জানতে ইচ্ছা হয়—আমরা কি ঠিক ঠিক জানি মা-র তত্ত্ব? কিভাবে তাঁর পূজা করা প্রয়োজন তা-কি জানি? তিনি আমাদের কি দিতে পারেন বা পারেন না তাও কি জানি? মনে হয় আমরা অধিকাংশই তা জানি না। আমরা যে জানি না তারও একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতেই পারে।

ঘটনাটি ঘটেছিল ২০০৬ সালের আগস্ট মাসে। স্থান—ভারতবর্ষের সংসদীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান—লোকসভা। সভার অধিবেশন তখন চলছে। অধিবেশনে জনৈক সাংসদ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবে বলেন—ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. সিলেবাসের বইতে হিন্দু দেবদেবী সম্পর্কে কুরুচিকর তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সে-ই প্রসঙ্গে এমন অভিযোগও ওঠে যে, দেবী দুর্গা সম্পর্কে ওই বইতে লেখা হয়েছে তিনি নাকি এত সুরা পান করেছিলেন যে তাঁর চোখ লাল হয়ে যায়। ওই সময় সংসদে শাসকদলের অন্তরাত্মাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর সেনাপতি, যিনি সংসদে শাসকদলের নেতা এবং বিশিষ্ট মন্ত্রী তাঁকে লাগিয়ে দিলেন যুতসই জবাব দিতে। সঙ্গে সঙ্গে অনুগত সৈনিক চণ্ডীর ওই শ্লোক বলেই তার ব্যাখ্যা দিয়ে দিলেন—বহু টীকাকারই মধু শব্দের অর্থ সুরা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। বিশাল সংসদে কয়েক শত সাংসদ সেনাপতির যুতসই উত্তরে নিশ্চুপ। বরং বলা যায় বিস্মিতও। কারণ ইনি কত বড় মহাপণ্ডিত! কিন্তু মধু মানে

যে মধুই তা সুরা হতে পারে না সেই ভুলটি ধরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কারও হয়নি। সেখানে অনেক কালীভক্ত বাঙালী থাকলেও, তাঁদেরও সাধ্যে তা কুলায়নি। কারণ কি? কারণ একটাই ভোটে জেতার জন্য মা-কালীর পূজা করলেও বা লোক দিয়ে পূজা দেওয়ালেও কিভাবে মায়ের পূজা করতে হয় বা মা-এর তত্ত্ব কি সেকথা তাঁরা জানেন না, তাঁদের জানার ইচ্ছা হয় না, বা তাঁরা চেষ্টাও করেন না। এই বাস্তব চিত্রই বেশীরভাগ হিন্দুকে এমন-কি বহু বহু বাঙালী হিন্দুদের মধ্যেও দেখা যাবে। যার জন্যই হিন্দুধর্ম, হিন্দুসমাজ, হিন্দুজাতির আজ এই ঘনঘোর দুর্দিন।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, মহাপণ্ডিত (!) ওই সাংসদ সেদিন সংসদের বুকে দাঁড়িয়ে মধু শব্দের অর্থ যে সুরা বললেন তা ঠিক নয়। মধু শব্দের অর্থ মধুই। বাংলা ভাষায় যে শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থটি সর্বাধিক প্রচারিত সেটি লিখেছেন—স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী। গ্রন্থটির প্রকাশক উদ্বোধন কার্য্যালয় কোলকাতা (রামকৃষ্ণ মিশন)। গ্রন্থটি ইংরাজী ১৯৯৯, বাংলা ১৪০৬ সনে ছত্রিশতম সংস্করণ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়, ১৪৯ পাতায় শব্দের যে অন্বয় করা হয়েছে তাতে, 'মধু' শব্দের অর্থ করা হয়েছে—'সুধা', 'আসব'। বঙ্গার্থতে লেখা রয়েছে 'মধুপান করি'।

এই বাংলারই আরেক স্বনামধন্য মনস্বী সন্ন্যাসী ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর নামও বহু লোক জানেন। ওই পণ্ডিত সন্ন্যাসীও তাঁর সপ্তশতী সমন্বিতা 'চণ্ডীচিন্তা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটি বিদ্বৎ সমাজে যথেষ্ট সমাদৃত। প্রথম প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৭০-এ। ২০০৫-এ একাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থকার ওই শ্লোকের অন্বয় করেননি ঠিকই কিন্তু ২১৬ পৃষ্ঠায় তার যে বঙ্গার্থ করেছেন তাতে 'মধুপান করি' কথাটিই আছে। সুরা নয়।

যা হোক সংসদের কথা সংসদেই শেষ হয়ে গেছে। দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ শ্রীশ্রীচণ্ডীতে লেখা 'মধু' শব্দের অর্থ মধুই মনে করেন—সুরা বা মদ নয়। এখন আমরাও মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

তাহলে আমাদের জগজ্জননী মায়ের ঠিক ঠিক মত পূজা করতে হলে, তাঁর কৃপায় আমাদের ধন্য হতে হলে তাঁর সম্পর্কে আগে একটা ধারণা হওয়া সব থেকে বেশি প্রয়োজন। কিন্তু এই ধারণা কিভাবে পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে দেবীর লীলা-মাহাত্ম্য বিষয়ক অনেক শাস্ত্রেই। তবে সব শাস্ত্র পড়া সম্ভব না হলে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত "শ্রীশ্রীচণ্ডী" পড়লেই হবে। সেখানে দেখতে হবে যে দেবীকে আমরা পূজা করতে চাই, যাঁর করুণা পেতে চাই—তিনি কে? তাঁর স্বরূপ কি? তিনি আমাদের কতখানি কল্যাণ করতে পারেন? তাঁর সম্পর্কে আর কে কি বলেছেন? ইত্যাদি কথা।

তাহলে আমরা প্রথমেই শুনি মায়ের মুখে। তিনি নিজে নিজের সম্পর্কে কিঁ বলেছেন?

এ বিষয়ে আমাদের প্রথমেই দেখতে হবে—'দেবীসূক্তম্'। দেবী সূক্তম্—আছে ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১০ম অনুবাক, ১২৫ সূক্তে। মন্ত্রটির দ্রষ্টা ঋষি অম্ভৃণ মহর্ষির কন্যা বাক্। সেখানে দেবী বলেছেন—

**ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহ—**
**মাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।**
**অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহ-**
**মিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।। ১**

আমি একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য এবং বিশ্বদেবগণরূপে বিচরণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ উভয় দেবতাকে ধারণ করি। আমি ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে ধারণ করি।

**অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং**
**ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।**
**অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে**
**সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে।। ২**

আমি শত্রুনাশকারী দেবতারূপী সোমদেবকে ধারণ করি। আমি ত্বষ্টা অর্থাৎ বিশ্বকর্মাকে পূষা ও ভগদেবকে (আদিত্যবর্গের

দেবতাগণকে) ধারণ করি। যে যজমান হবির্যুক্ত এবং যিনি উত্তম হবিঃ দেবগণকে দান করেন ও বিধিপূর্বক সোমরস প্রস্তুতকারী সেই যজমানকে আমি যজ্ঞফলরূপ ধনাদি প্রদান করি।

**অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং**
**চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।**
**তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা**
**ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্।। ৩**

আমি রাষ্ট্রী অর্থাৎ সমগ্র জগতের ঈশ্বরী। উপাসকগণের ধনদাত্রী; আমি পরব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে প্রত্যক্ষ করেছি।

আমি যজ্ঞীয় দেবগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা। আমি প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থিতা এবং সর্বভূতে জীবরূপে প্রবিষ্টা। সেই আমাকে সর্বত্র দেবতারা বিবিধভাবে পূজারাধনা করে থাকেন।

**ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি**
**যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।**
**অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি**
**শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি।। ৪**

যে ব্যক্তি অন্ন ভোজন করে, যে দর্শন করে, যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে প্রাণ ধারণ করে এবং যে কথা শুনে—তারা আমার শক্তির দ্বারাই তা করে থাকে। যারা আমাকে অন্তর্যামিনীরূপে জানে না; তারাই জন্ম-মরণাদি ক্লেশ প্রাপ্ত হয় বা সংসারে হীন হয়। হে কীর্তিমান সখে, আমি তোমাকে শ্রদ্ধালভ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বলছি। তুমি তা শ্রদ্ধাসহকারে শোন।

**অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং**
**দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।**
**যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি।**
**তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্।। ৫**

দেবগণ ও মনুষ্যগণের প্রার্থিত এই ব্রহ্মতত্ত্ব আমি স্বয়ং উপদেশ

করছি। আমি ঈদৃশ ব্রহ্মস্বরূপিণী। আমি যাকে যাকে ইচ্ছা করি তাকে তাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ করে দিই। আমি কাকেও ব্রহ্মা, কাকেও ঋষি, কাকেও বা উত্তম প্রজ্ঞাশালী করে থাকি।

**অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি**
**ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।**
**অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং**
**দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ।। ৬**

ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী হিংসক শত্রু বধ করার জন্য আমি রুদ্রের ধনুকে জ্যা সংযোগ করি। ভক্ত ও সজ্জনগণের কল্যাণার্থে আমিই যুদ্ধ করি এবং আমি অন্তর্যামীরূপে দ্যুলোকে ও ভূলোকে প্রবিষ্টা হয়ে আছি।

**অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্**
**মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।**
**ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো**
**তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি।। ৭**

আমি এই ভূলোকের উপরে অবস্থিত দ্যুলোককে প্রসব বা সৃষ্টি করেছি। বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে যে ব্রহ্মচৈতন্য উহাই আমার অধিষ্ঠান। সেহেতু আমি সমস্ত ভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে সর্বভূতে ব্রহ্মরূপে বিবিধভাবে বিরাজিতা। পরন্তু আমিই মায়াময় দেহ দ্বারা সমগ্র দ্যুলোক পরিব্যাপ্ত আছি।

**অহমেব বাত ইব প্রবাম্যা-**
**রভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।**
**পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ-**
**তাবতী মহিনা সংবভূব।। ৮**

আমি সমুদয় বিশ্ব কারণরূপে সৃষ্টি করে বায়ুর মত স্বচ্ছন্দে তার অন্তরে ও বাইরে বিচরণ করি। আমি দ্যুলোক ও পৃথিবীকে অতিক্রম করে বর্তমান আছি। নিজ মহিমা দ্বারা আমিই এই সমগ্র জগদ্রূপ ধারণ করেছি।

এখন দেখা যাক্, এই মা জগদম্বিকে কে? এ বিষয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা কি বলছেন? শ্রীশ্রীচণ্ডীতেই দেবীর স্তুতি প্রসঙ্গে প্রজাপতি দেবীকে বলেছেন—তিনি নিত্যা অর্থাৎ সনাতনী, তিনি অক্ষরে, তিনি স্বাহা, স্বধা, বষট্কারঃ অর্থাৎ যজ্ঞমন্ত্ররূপা, স্বররূপিণী, অমৃতস্বরূপা এবং তিনি ত্রিমাত্রা অর্থাৎ অ-উ-ম রূপে অবস্থিতা। তিনি দেবীকে আরও বলেছেন—নিত্যা অর্দ্ধমাত্রারূপে অবস্থিতা, তিনিই গায়ত্রী; তিনিই পরমা জননী। দেবীই জগতকে ধরে রয়েছেন। তিনিই এই জগৎ সৃষ্টি করেন। পালন করেন। আবার প্রলয়কালে সংহার করেন। সেই দেবীই মহাবাক্য লক্ষণা ব্রহ্মবিদ্যা ও মহামায়া। তিনি মহামেধা, মহাস্মৃতি ও মহামোহরূপিণী। তিনিই সর্বরূপিণী সর্বদেবশক্তি। আবার সকল অসুরশক্তিও তিনিই। তিনি সর্বভূতের মূল কারণরূপা, গুণত্রয়ের প্রসবকারিণী। তিনি কালরাত্রি, মহারাত্রি এবং ভীষণরাত্রিস্বরূপা। তিনি শ্রী, তিনি ঈশ্বরী, হ্রী অর্থাৎ নিষিদ্ধকার্যে লজ্জারূপিণী, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, লজ্জা, পুষ্টি ও তুষ্টি। তিনিই শান্তি ও ক্ষমারূপিণী। সৃষ্টিকর্তার মতে দেবী খড়্গ ও শূলধারিণী, ভয়ঙ্করী। তিনি গদা, চক্র; শঙ্খ ও ধনুর্ধারিণী এবং বাণ, ভূশুন্ডী ও পরিঘ নামক অস্ত্রধারিণী। তিনি দেবগণের প্রতি সৌম্যা এবং দৈত্যগণের প্রতি ততোধিক রুদ্রা। তিনি সকল সুন্দরের চেয়েও অধিকতর সুন্দরী। তিনি ব্রহ্মাদি দেবগণেরও শ্রেষ্ঠা, সর্বপ্রধানা দেবী। পরমেশ্বরী। বিধাতা আরও বলছেন—যে কোনও দেশে বা কালে যে কোন নিত্য বা অনিত্য বস্তু আছে সে-সকলের যে শক্তি—তা তিনিই।

দেবীর সম্পর্কে এত কথা বলার পরও ব্রহ্মা বলছেন—যিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্তা, তাঁকেও যিনি নিদ্রাভিভূতা করেন, তখন এই জগতে তাঁর সম্পর্কে কে স্তব করতে পারে? বলছেন—যিনি আমাকে, বিষ্ণুকে এবং শিবকেও শরীর ধারণ করান তার স্তব করা কারও পক্ষে কি সম্ভব?

এতো গেল দেবীর সম্পর্কে সৃষ্টিকর্তা বিধাতার অভিমত। এবার আমরা শুনি ইন্দ্রাদি দেবগণ মাকে কি বলেছেন?

তাঁরা মাকে বলেছেন—মহাদেবী, কল্যাণময়ী দেবী শিবা, প্রকৃতি দেবী, ভদ্রাদেবী, বৃদ্ধিরূপা ও সিদ্ধিরূপা, অলক্ষ্মীরূপা, রাজগণের লক্ষ্মীরূপা এবং শিব-শক্তি স্বরূপিণী। তাঁরা বলছেন—'মা হলেন দুর্গম ভবসাগর পারকারিণী। সারভূতা, সর্বজননী, খ্যাতিরূপিণী তিনি বিদ্যারূপে অতিসৌম্যা এবং অবিদ্যারূপে অতি ভীষণা। জগতের আশ্রয়রূপিণী ও ক্রিয়ারূপিণী। বিষ্ণুমায়া। দেবতারা মা অম্বিকা সম্পর্কে আরও বলেছেন, তিনি হলেন—সর্বজীবের মধ্যে চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, মাতৃ, ভ্রান্তিরূপে অবস্থিতা। দেবতারা মহামায়াকেই ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজিতা এবং ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ ও ব্যোম—পঞ্চভূতের প্রেরয়িত্রী, তিনি বিশ্বব্যাপিকা প্রভৃতিও বলেছেন।

দেবীর স্বমুখের উক্তি, দেবী সম্পর্কে সৃষ্টিকর্তার স্তব ও দেবতাদের স্তুতি দ্বারা—তিনিই যে পরমেশ্বরী, সর্বশক্তি সমন্বিতা, সর্বকল্যাণকারিণী, মহাশক্তি মহামায়া—আশা করি তা আমাদের বুঝতে আর অসুবিধা নেই। এবং তাঁর কৃপা হলেই যে আমাদের সকল অভীষ্ট পূরণ হওয়া সম্ভব সে-বিষয়েও আমরা অবশ্যই নিশ্চিত হতে পারি। দেবী আমাদের কিভাবে ও কি কল্যাণ করবেন, তাঁর জন্য তাঁকে আমাদের কি দিতে হবে তাও আমাদের জানা আবশ্যক। সে বিষয়ে আমরা শ্রীশ্রীচণ্ডীর দ্বাদশ অধ্যায়ে গিয়ে দেবীর মুখেই শুনতে পারি তিনি কি বলেছেন—

সেখানে দেবী চণ্ডিকা সদ্য বিপদ্‌মুক্ত দেবতাদের উদ্দেশ্য করে বলছেন—যে ব্যক্তি একমনে এই সকল স্তব (যা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে) দ্বারা আমাকে সতত স্তব করবে, আমি তাকে সকল বাধাবিঘ্ন ও বিপদ

থেকে মুক্ত করব। যারা একাগ্রমনে অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দশী তিথিতে মধুকৈটভ-বধ, মহিষাসুর বধ এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ ভক্তিপূর্বক পাঠ করবে এবং যারা আমার এ-সকল উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য শুনবে, তাদের বিন্দুমাত্র পাপ থাকবে না। পাপ আচরণজনিত কোন বিপদ্, দারিদ্র্য বা তাদের প্রিয়জন বিয়োগও হবে না। তার অর্থাৎ চণ্ডীপাঠকের বা শ্রোতার কোন শত্রু, দস্যু বা রাজা হতে এবং শস্ত্র, আগুন ও জলপ্রবাহ থেকে কোনরকম বিপদের আশঙ্কা থাকবে না। অতএব আমার এই মাহাত্ম্য একমনে সর্বদা ভক্তিসহকারে পাঠ করা ও শোনা উচিত। এটিই শ্রেষ্ঠ কল্যাণলাভের উপায়। আমার মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ মহামারীজনিত সবরকম উপদ্রব এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই তিন রকম উৎপাতই নিবারিত করে। যে বাড়ীতে আমার এই মাহাত্ম্য নিত্য সম্যক্‌ভাবে পাঠ করা হয়, আমি সে বাড়ী ছেড়ে যাই না। পরন্তু সেখানে আমি সব-সময়ই অবস্থান করি। বলি দেওয়ার সময়, দেবতার পূজার্চনা করার কালে, হোম-যজ্ঞাদি কাজে এবং মহোৎসব উপলক্ষ্যে আমার মাহাত্ম্য (অর্থাৎ শ্রীশ্রীচণ্ডী) সম্পূর্ণভাবে পাঠ ও শ্রবণ করা কর্তব্য। আমার মাহাত্ম্য অর্থাৎ শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠের পর বিধিপূর্বক অথবা অবিধিপূর্বক অনুষ্ঠিত বলিদান সহকারে পূজা এবং আমার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হোম-যজ্ঞাদি আমি প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করি। শরৎকালে যে বার্ষিক দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে আমার এই মাহাত্ম্য ভক্তিভরে শুনলে মানুষ আমার কৃপায় সকল বাধা থেকে মুক্ত হয়ে ধন, ধান্য ও পুত্রাদি লাভে সমর্থ হবে—এতে কোন সন্দেহ নেই। যারা আমার এই মাহাত্ম্য (শ্রীশ্রীচণ্ডী) শোনে তাদের শত্রুরা বিনষ্ট হয়, তাদের কল্যাণ লাভ হয় এবং বংশের উন্নতি হয়। সবরকম শান্তিকাজে, দুঃস্বপ্ন দেখায় এবং উৎকট গ্রহ পীড়াতে আমার মাহাত্ম্য পাঠ শুনবে। আমার মাহাত্ম্য পাঠ বা শুনলে রোগাদি উপসর্গ ও উৎকট গ্রহপীড়া সবই বিনষ্ট হয় এবং মানুষের দেখা দুঃস্বপ্ন সু-স্বপ্নে পরিণত হয়ে থাকে। আমার মাহাত্ম্য পাঠ করলে

বা শুনলে বালগ্রহদ্বারা আক্রান্ত শিশুদের শান্তিবিধান হয় এবং মানুষের পরপর বন্ধুহানি ঘটলে পুনরায় উত্তমভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন হয়। আমার এই মাহাত্ম্য পাঠ করলে বা শুনলে সকল দুর্বৃত্তগণের বলনাশ করে। এটি পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গেই রাক্ষস, ভূত ও পিশাচগণ দূরে পালিয়ে যায়। আমার এই মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ পাঠ করলে বা শুনলে সাধক আমার সান্নিধ্য লাভ করে। শ্রেষ্ঠ পশু, পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ, দীপ, ব্রাহ্মণ-ভোজন, হোম, অভিষেক দ্রব্য এবং অন্যান্য নানা রকম ভোগের দ্রব্যাদি দিয়ে এক বছর যাবৎ দিনরাত্রি পূজা করলে আমি যেরকম প্রসন্ন হই, একবার মাত্র আমার এই মাহাত্ম্য-কথা শুনলে আমি সেইরকম প্রীত বা সন্তুষ্ট হই। আমার আবির্ভাব সমূহের কাহিনী কীর্তন করলে যাবতীয় পাপ দূর হয়ে যায়। পরন্তু তা আরোগ্য দান করে এবং ভূত, প্রেত প্রভৃতি থেকে রক্ষা করে থাকে। যুদ্ধবিগ্রহে দুষ্ট দৈত্য বিনাশক আমার মাহাত্ম্য-কাহিনী শুনলে কারও শত্রুভয় থাকে না।

তোমরা দেবতারা যে সকল স্তুতি করেছ এবং ব্রহ্মর্ষিগণ ও ব্রহ্মা যে সকল স্তব করেছেন, সে সকল স্তব পাঠ করলে বা শুনলে শুভ বুদ্ধি লাভ হয় বা চিত্তশুদ্ধি হয়। অরণ্যে দাবাগ্নিতে বেষ্টিত হলে, প্রান্তরে দস্যুগণ পরিবৃত করলে, নির্জন স্থানে শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হলে, জঙ্গলে বুনো হাতি, সিংহ বা বাঘে তাড়া করলে বা ক্রুদ্ধ রাজা দ্বারা কারারুদ্ধ বা প্রাণদণ্ড হলে বা মহাসমুদ্রে জাহাজে অবস্থানের সময় প্রবল বায়ুর দ্বারা বিঘূর্ণিত হলে, অতি ভীষণ যুদ্ধে শস্ত্রপাত হলে অথবা নানারকম ভয়ানক বিপদ এসে গেলে বা মহাপীড়ার যন্ত্রণায় অস্থির হলে, মানুষ আমার এই মাহাত্ম্য স্মরণ করা মাত্রই সকল বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যে ব্যক্তি আমার এই মাহাত্ম্য সবসময় স্মরণ করে, আমার প্রভাবে সিংহাদি হিংস্র জন্তু, দস্যু ও শত্রুগণ তার কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যায়।

ওই অধ্যায়েই ভগবতী অম্বিকা বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানী মেধস্ ঋষি রাজা সুরথকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—সেই দেবীই এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি

করেন এবং তাঁর দ্বারাই এই জগৎ মায়ামুগ্ধ হয়। তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি সন্তুষ্টা হয়ে ব্রহ্মজ্ঞান ও ঐশ্বর্য প্রদান করেন। হে রাজা, মহা প্রলয়কালে সেই দেবী মহাকালী মহামারীরূপে সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করেন। সেই জন্মরহিতা সনাতনী দেবীই সৃষ্টিকালে সৃষ্টি শক্তিরূপে (অর্থাৎ ব্রহ্মারূপে) প্রকাশিতা হন। তিনিই স্থিতিকালে পালন শক্তিরূপে (অর্থাৎ বিষ্ণুরূপে) পালন করেন এবং তিনিই প্রলয়কালে সংহার রূপ (অর্থাৎ মহেশ্বর রূপে) ধারণ করেন। মানুষের সুসময়ে তিনিই লক্ষ্মীরূপে সুখ-সমৃদ্ধি দান করেন এবং তিনিই আবার দুঃসময়ে অলক্ষ্মীরূপে বিনাশের জন্য দুঃখ দারিদ্র্যাদি দান করেন। গন্ধ-পুষ্প-ধূপ দীপাদি দ্বারা দেবীর পূজা ও স্তবস্তুতি করলে তিনি সন্তুষ্টা হয়ে ধন-পুত্রাদি, ধর্মে মতি ও নিষ্ঠা এবং শুভ গতি প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বারাহী-তন্ত্র বলেছেন—

**যথাশ্বমেধ এতেষু দেবানাং চ যথা হরিঃ।**
**স্তবানামপি সর্বেষাং তথা সপ্তশতীস্তবঃ।।**

অর্থ—যেমন অশ্বমেধ সকল যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যেমন হরি দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেরকমই যত স্তব আছে তার মধ্যে সপ্তশতী স্তব (চণ্ডী) শ্রেষ্ঠ।

সংবৎসর-প্রদীপে বলা হয়েছে—

**মাহাত্ম্যং ভগবত্যাস্তু পুরাণাদিষু কীর্তিতম্।**
**পঠেদ্বা শৃণুয়াদ্বাপি সর্বকাম-সমৃদ্ধয়ে।।**

মানুষেরা সকল কামনা সিদ্ধির জন্য পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে কীর্তিত দেবী-মাহাত্ম্য (চণ্ডী) পাঠ বা শ্রবণ করবে।

**কাত্যায়নী-তন্ত্র** বলছেন—

**মকারাদিনুকারান্তো মনুঃ পরমদুর্লভঃ।**

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম মন্ত্রের প্রথম শব্দ 'মার্কণ্ডেয়' এবং অন্ত মন্ত্রের অন্ত শব্দ মনু—ম হতে নু পর্যন্ত মন্ত্র (সপ্তশতী চণ্ডী) পরম দুর্লভ।

সুতরাং শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ আমাদের করা কেন আবশ্যক তা আর বলার প্রয়োজন আছে কি? তবুও বলি, আমরা শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ কেন করব?—এই আলোচনা শুরু হয়েছিল—মানুষ চায় শান্তি, শক্তি ও মুক্তি দিয়েই। সে প্রসঙ্গে আরও বলতে হয়—শ্রীশ্রীচণ্ডী হল সেই গ্রন্থ যা পড়লে শক্তি পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীচণ্ডী হলেন সেই দেবী যিনি দুর্বলের বল, নিঃসহায়ের একমাত্র সহায় ও বিপন্নের সততই রক্ষয়িত্রী। তেমন দৃষ্টান্তই পাওয়া যায় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার ঘটনায়। তিনি তো মধু-কৈটভের হাতে অবশ্যই বিনাশ হতেন কিন্তু শ্রীশ্রীচণ্ডীর শরণাপন্ন হয়েই তাঁর জীবন রক্ষার উপায় হয়েছে। মহিষাসুর বধের ঘটনাতে এবং শুম্ভ-নিশুম্ভের ঘটনাতেও সেই একই কথাই প্রমাণ হয়—দেবতারা যখন অসহায়, দুর্বল, অসুরদের অত্যাচারে জর্জরিত, তখন তাঁরা মহাশক্তিময়ী শ্রীশ্রীচণ্ডীর শরণাপন্ন হয়ে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। দেবী শুধু তাঁদের রক্ষাই করেননি, পরন্তু তিনি তাঁদের শক্তিমানও করেছেন। তারই প্রমাণ দেখা যায় — রক্তবীজ বধের সময় যে দেবতারা অসুরদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁরাই দেবীর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে যাঁর যেরকম আকার, যেমন ভূষণ ও বাহন, তিনি সেরকম শক্তি, সেরকম আকার, ভূষণ ও বাহন নিয়ে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন।

মানুষ মাত্রেই যেমন চায় ভুক্তি, তেমনি চায় মুক্তিও। এই দুই-ই দিতে পারেন একমাত্র জগজ্জননী মা। তাঁরই কৃপায় রাজা সুরথ লাভ করেছিলেন ভুক্তি বা রাজ্য আর বৈশ্য সমাধি পেয়েছিলেন মোক্ষ বা ব্রহ্মপদ। তাহলে শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠকের শ্রীশ্রীজগজ্জনীকে প্রসন্ন করার উপায় জানা থাকলে তিনিই বা ভুক্তি ও মুক্তি পাবেন না কেন?

সুতরাং দেবীর শরণাপন্ন হলে শুধু দেবতারা কেন, যেকোনো লোকই তাঁর করুণা পেতে পারে, তাঁর শক্তিতে শক্তিমান হতে পারে—এনিয়ে কোন সংশয় সন্দেহের অবকাশ নিশ্চয় নেই। তাই আমরা যদি

শক্তি সংগ্রহ করতে চাই, শক্তিমান হতে চাই, ভুক্তি ও মুক্তি পেতে চাই—তবে আমাদের যে শ্রীশ্রীচণ্ডী পড়তেই হবে তা বলতে কোন দ্বিধা আসে না।

আরেকটি কথা এখানে অবশ্যই উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করি। তা হল—আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেছেন—'মাতৃবৎ পরদারেষু।' অর্থাৎ অন্যের স্ত্রীকে মায়ের মতো দেখতে হবে। তাদের দিকে কোন রকম কাম ভাব নিয়ে দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়। আবার এমনও পণ্ডিতরা বলেছেন—'যত্র নারী, তত্র গৌরী।' অর্থাৎ নারী মাত্রই গৌরী। গৌরী অর্থে যদি আমরা মা দুর্গাকেই বুঝি, তবে নারী মাত্রকেই দুর্গা রূপে ভাবা উচিত। তাঁদের সেই সম্মান দেওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমানকালে তেমন ভাব ও ভাবনা আমাদের সমাজে-রাষ্ট্রে অনেকাংশেই লুপ্ত হয়ে গেছে না কি? আর সেই লুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণেই তো নারীশক্তি-মাতৃশক্তির উপর নানাভাবে নির্যাতন হচ্ছে। নারীরা পুরুষদের লালসার শিকার হচ্ছে। এটি মোটেই শুভলক্ষণ নয়। এর ফলে আপাত দৃষ্টিতে নারীর অমর্যাদা, নারীর উপর অত্যাচার হলেও পরিণামে পুরুষদেরই সর্বনাশ হচ্ছে। তারা ক্রমশঃ হীন, দুর্বল, তমসাচ্ছন্ন হয়ে, নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে ধীরে ধীরে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এক্ষেত্রে পুরুষ সমাজকে সতর্ক করেছেন শ্রীশ্রীচণ্ডী। কিভাবে? তাও বলছি—শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেখা যাবে—মধু-কৈটভ, মহিষাসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভ এরা সকলেই যেমন বীর, তেমনি তপস্বীও এবং দেববলে বলীয়ান। মধু-কৈটভ মা-র বিশেষ কৃপা পেয়েছে। মহিষাসুর ও শুম্ভ-নিশুম্ভ ছিল ব্রহ্মার বলে বলীয়ান। এদের পরাজিত করার শক্তি কারুরই ছিল না। কোন দেবতারই নয়। হয়তো মা চণ্ডীও পারতেন কি-না সন্দেহ। মধু-কৈটভের সঙ্গে ভগবান বিষ্ণু দীর্ঘকাল যুদ্ধ করলেও তাকে পরাজিত করতে পারেননি, দেবী চণ্ডীর সঙ্গে মহিষাসুর ও নিশুম্ভ-শুম্ভের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে। তবু ওই বীর অসুরেরা মা-র কাছে পরাজিত হয়েছে। কেন?

কারণ তারা মাকে মা রূপে দেখতে পারেনি। দেখছে কামিনী রূপে, কামনা-ভোগের উপকরণ রূপে।

রাবণ তথা রাক্ষস বংশ ধ্বংসের কারণ সীতার প্রতি রাবণের কামদৃষ্টি। তার ফলে তাদের মধ্যে যে প্রবল রাজসিক শক্তি ছিল, তেজঃ ছিল তা পরিণত হয়েছে মোহে—তামসিকতায়। তার ফলে তারা হয়েছে দুর্বল। আর ওই দুর্বলতার ফলেই রাম-লক্ষ্মণের হাতে রাক্ষস বংশ ধ্বংস হয়েছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেরও অন্যতম কারণ দ্রৌপদীর প্রতি দুর্যোধন-দুঃশাসনের অত্যাচার ও লাঞ্ছনা।

এ কথা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবেই বলা যায়—আজ এমন পুরুষ কেউই নেই যে, যে-কোনো একটি মাত্র নারীর কামনা চরিতার্থ করতে পারে। তাই মনে হয় যদি নারীকুলের ইচ্ছা হয়, পুরুষ সমাজ যেহেতু তাদের ভোগের দৃষ্টিতে দেখে, সুতরাং তারাও তাদের ভোগের পথেই যমের দুয়ারেই পাঠাবে; তাহলে একটি পুরুষও বাঁচবে না, অকালেই মৃত্যু হবে তাদের। মনে মনে কোন নারীকে ভোগ করার বাসনাই পুরুষের যখন ভয়ানক ক্ষতি করে, তখন ভোগোদ্যত মনের বাস্তব অবস্থা কতখানি ভীষণ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তাই, আজ নারী সমাজ তেমন রুষ্টা যেন না হয় সেই চেষ্টাই করতে হবে। আর সেই চেষ্টায় তাদের সব থেকে বড় সহায়ক হতে পারেন শ্রীশ্রীচণ্ডী। শ্রীশ্রীচণ্ডী সকল নারীকে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতে শেখান। দেবতারা নারীকে দেবীজ্ঞানে, জগজ্জননী জ্ঞানে পরিত্রাণকারিণী রূপে দেখে হয়েছেন জয়ী-বিজয়ী-বিশ্বজয়ী। আর অসুরেরা মাকে তার বিপরীত দৃষ্টিতে দেখে হয়েছে ধ্বংস, হয়েছে নিশ্চিহ্ন। সুতরাং অন্ততঃ পুরুষ সমাজকে বাঁচতে হলে দেবতাদের অনুসরণ করে নারী সমাজকে শ্রদ্ধা করতে হবে, সম্মান করতে হবে, তাঁদের মাতৃজ্ঞানে পূজা করতে হবে। তাঁদের করুণায়, তাঁদের শক্তিতে শক্তিমান হতে হবে। এ শিক্ষাই শ্রীশ্রীচণ্ডীর মূল শিক্ষা যা আমরা শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ করলেই একমাত্র বুঝতে পারব। তাই শ্রীশ্রীচণ্ডী আমাদের পড়তে হবেই এবং তা বাঁচার জন্যই।

# কে সেই মহামায়া ?

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতারই মত হিন্দুর সর্বাধিক পরিচিত, সর্বাধিক আদরণীয় এবং নিত্যপাঠ্য অপর আর একটি শাস্ত্রের নাম—শ্রীশ্রীচণ্ডী। শাস্ত্রটি তন্ত্রশাস্ত্রের সার। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ই হল—যাঁর করুণায়, যাঁর ইচ্ছায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-পালন, যিনি সকল কার্যের কারণ আবার সকল কারণেরও কারণ সেই জগত-জননী, বিশ্বপ্রসবিনী, জগদ্ধাত্রী, সেই তুরীয় শক্তি পরমেশ্বরী শ্রীশ্রীচণ্ডীর লীলা-মাহাত্ম্যের প্রচার। শ্রীশ্রীগীতা যেমন মহাভারতের অন্তর্গত, তেমনি শ্রীশ্রীচণ্ডীও আমাদের যে আঠারোটি মহাপুরাণ আছে তার মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত। সেখানে এই অংশের নাম দেওয়া হয়েছে "দেবী মাহাত্ম্য"। দেবী বলতে তিনিই, যিনি— পরমা প্রকৃতি বিশ্বেশ্বরী মা মহামায়া বা মা দুর্গা।

মহামুনি ব্যাসদেব রচিত শ্রীগীতা যেমন আমরা কুরুক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের দর্শনকারী সঞ্জয়ের মুখ থেকে শুনি, তেমনি শ্রীশ্রীচণ্ডী আমরা শুনি মার্কণ্ডেয় ঋষির মুখ থেকে। তিনি বলেছেন ক্রৌষ্টুকি ভাগুরি মুনিকে। তবে শ্রীশ্রীচণ্ডী সূত্রেই জানা যায় যে—মেধা ঋষি বহুদিন আগে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যকে যে শ্রীশ্রীচণ্ডী মাহাত্ম্য বলেছিলেন, তা পরে মার্কণ্ডেয় মুনি নিজ শিষ্য ক্রৌষ্টুকি ভাগুরিকে বলেন। ভাগুরি মুনিকে বলা সেই কাহিনী দ্রোণ মুনির চারজন পুত্র—পিঙ্গাখ্য, বিরাধ, সুপুত্র ও সুমুখ তাঁরা ব্যাসদেবের শিষ্য মহর্ষি জৈমিনিকে বলেন। প্রসঙ্গতঃ শাস্ত্রে বলা হয়েছে—দ্রোণ মুনির অভিশাপে তাঁর ওই চারজন পুত্র পাখীতে পরিণত হয়েছিলেন। তবে তাঁরা মুনির অভিশাপে পাখী হলেও নিজেদের তপস্যার প্রভাবে মানুষের মতই কথা বলতে পারতেন।

যা হোক এভাবে দেবী মহামায়ার মহা-মাহাত্ম্য শ্রীশ্রীচণ্ডীর কাহিনী ছয়টি পরম্পরার মাধ্যমে জগতে প্রচারিত হয়েছে বলেই একে ষট্ সংবাদ কথাও বলা হয়। এখন তাহলে আমরাও পরম বন্দনীয় মহর্ষি মার্কণ্ডেয়র

শ্রীমুখ থেকে শ্রীশ্রীচণ্ডীর গল্প শুনি—

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বলছেন—সূর্যদেবের পুত্র হলেন সাবর্ণি। তাঁর আরও পরিচয়—তিনি হলেন অষ্টম মনু। ওই সাবার্ণির কিভাবে জন্ম হয়েছিল সে-বিষয়ে আমি তোমাকে বিস্তারিতভাবে বলছি। তুমি মন দিয়ে তা আমার কাছ থেকে শুনে নাও। শুনে নাও সেই মহাভাগ অর্থাৎ অতিশয় সৌভাগ্যশালী সূর্যদেবের পুত্র সাবর্ণি পরমেশ্বরী মহামায়ার অনুগ্রহে কিরকমভাবে অষ্টম মন্বন্তরের অধিপতি হলেন।

বহু আগে, যখন কি-না স্বারোচিষ দ্বিতীয় মনু ছিলেন, তখন চৈত্রের বংশে জাত সুরথ নামে এক জন রাজা এই সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েছিলেন। সেই রাজা তাঁর প্রজাদের এমন ভালভাবে পালন করতেন, যেন মনে হত সকল প্রজাগণ তাঁরই ঔরসজাত সন্তান। কিন্তু তা'হলে হবে কি, তিনিও অজাতশত্রু ছিলেন না, তাঁর মত মহান রাজারও শত্রু ছিল। সেই সময় কোলানগর ধ্বংসকারী যবন রাজারা তাঁর শত্রুতা করেছিল। শত্রুকে উপযুক্ত দণ্ড দেওয়া শক্তিশালী রাজার উচিত কর্তব্য। তাই দেখা গেল, সেই প্রবল যবনশত্রুদের সঙ্গে দণ্ডদাতা রাজা সুরথের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস, রাজা যথেষ্ট শক্তিমান, তাঁর সৈন্যসংখ্যাও বেশি, অন্যদিকে তাঁর শত্রু যবনেরা সংখ্যায় অল্প হলেও যুদ্ধে তাঁরই পরাজয় হয়। যুদ্ধে পরাভূত ও আক্রান্ত হয়ে রাজা নিজের রাজধানীতে ফিরে আসেন। অবশ্য তিনিই দেশের অধিপতি হয়ে রইলেন। যবনেরা পরাজিত রাজার রাজ্য ও রাজসিংহাসন কেড়ে না নিলেও, তাঁর নিজ রাজ্যের দুষ্ট, দুরাত্মা ও বলবান মন্ত্রীরা রাজার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ধনের ভাণ্ডার ও সৈন্যসামন্তদের অধিকার করে বসে।

যুদ্ধে পরাজিত, ধনসম্পদ ও সৈন্যসামন্ত হারা হলে স্বাভাবিক কারণেই রাজা রাজ্যহারাও হলেন। দুঃখে সেসময় একদিন তিনি মৃগয়া অর্থাৎ পশুশিকারের ছলনা করে একাই ঘোড়ায় চেপে গভীর বনের

ভিতর চলে গেলেন। রাজা সেই গহন বনের মধ্যে বহুসংখ্যক হিংস্র পশুকেও দেখলেন। দেখলেন তারা কিন্তু হিংস্র নয়। তারা শান্ত ভাবাপন্ন। যেতে যেতে রাজা সুরথ আরও দেখলেন — সেই গভীর বনের মধ্যে এক মুনির আশ্রম। সেখানে মুনিবর তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বসবাস করেন। পরে জানতে পারেন—মুনিবর হলেন দ্বিজশ্রেষ্ঠ মেধস্ মুনি। মুনির আশ্রম দেখেই রাজা ঘোড়া থেকে নেমে সেখানে গেলেন। মেধস্ মুনিও তাঁকে যথাসম্ভব সমাদর করে আশ্রমে নিয়ে গেলেন। রাজা আশ্রমে ঢুকে মুনিবরের আশ্রমের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন।

কিন্তু শান্তি-স্থল মুনির আশ্রমে গেলেই কি আর মনে শান্তি পাওয়া যায় ? বা আশ্রমের এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকা নানা গাছ-লতা-পাতা-ফুল-পশু-পাখীর সৌন্দর্য্য দেখেই শান্তি পাওয়া যায় ?—যাঁর মন রাজ্য হারানো, সম্পদ-সৈন্য হারানো ও নিজ বংশের মর্যাদা রক্ষা করতে না-পারার দুঃখে বিচলিত হয়ে আছে। রাজা সুরথের অবস্থাও ঠিক সেরকমই। তিনি মুনির আশ্রমে ঘুরতে ঘুরতে নিজ রাজ্য ও সম্পদের মমতায় অভিভূত চিত্তে ভাবতে লাগলেন—অতীতে আমার পূর্বপুরুষেরা যে প্রজাদের রাজ্যকে সুন্দরভাবে পালন করেছেন এবং সুরক্ষা করেছেন, সেই রাজ্য ও প্রজাগণ এখন আমার অসৎ চরিত্র অমাত্যদের দখলে। তারা এখন সে সকলকে ধর্মানুসারে রক্ষা করছে কি-না? জানি না, সর্বদা মদস্রাবী আমার সেই মহাবলবান প্রধান হাতীটি আমার শত্রুদের অধিকৃত হয়ে ঠিক রকম খাদ্যদ্রব্য পাচ্ছে কি-না? যে সকল রাজকর্মচারী আগে পারিতোষিক , বেতন ও খাদ্যসামগ্রী পেয়ে সব সময়ই আমার অনুগত হয়ে থাকত, আজ তারাই হয়তো অন্য রাজাদের দাসত্ব করছে। আমি এত কষ্ট করে, দুঃখ করে বিশাল ধনসম্পত্তি জমা করে রেখেছিলাম তা হয়তো ওই সকল অমিতব্যয়ী অমাত্যগণ সবসময় যা খুশীভাবে খরচ করে খুব তাড়াতাড়িই রাজকোষ শেষ করে ফেলবে। রাজা সুরথ

ওই সকল বিষয় নিয়েই অনেকক্ষণ ধরে গভীরভাবে ভাবছিলেন। এমন সময় তিনি মুনির আশ্রমের কাছে এক বৈশ্যকে দেখতে পেলেন।

রাজা সুরথ সেই বৈশ্যকে দেখতে পেয়েই গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি কে? এখানে আপনার আসার কি-ই বা কারণ? এবং দেখে মনে হচ্ছে আপনি শোকার্ত এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্তও। যে যেমন লোক, সে তেমন সঙ্গই খোঁজে। রাজা সুরথের নিজের যেমন মানসিক অবস্থা, সেরকমই আরেকজনকে এভাবে পেয়ে যাওয়ায় তাঁর সঙ্গে তাঁর অতি সহজেই বন্ধুত্বও হয়ে যায়। বৈশ্য যেন তাঁরই মনের মানুষ! বৈশ্যও রাজার ওই রকম প্রীতিপূর্ণ কথা শুনে, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাঁকে বলতে থাকেন—

আমি সমাধি নামক বৈশ্য। আমার জন্ম খুবই অবস্থাপন্ন পরিবারে। আমার অসাধু স্ত্রী ও পুত্ররা আমার ধনের লোভে আমাকে পরিত্যাগ করে দিয়েছে। আমার স্ত্রী ও পুত্ররা আমার ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নেওয়ায় আমি এখন ধনবিহীন, গরীব হয়ে পড়েছি। আত্মীয় ও বন্ধুরা আমাকে পরিত্যাগ করায় আমি অন্তরে অশেষ দুঃখ নিয়ে এই নির্জন বনেই চলে এসেছি। কিন্তু আমি বনে চলে আসায় আমার স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনদের কোন রকম ভাল-মন্দ খবরাখবর পাচ্ছি না। এখন বাড়ীতে তারা ভাল আছে না মন্দ আছে, আমার সেই পুত্ররাই বা এখন কেমন আছে এবং এখন তারা সৎ পথে কি অসৎ পথে চলছে, সে খবরও আমার অজানা।

রাজা সুরথ তাঁর সদ্যপ্রাপ্ত বন্ধুর মুখে ওইসব কথা শুনে বলেন—যে আত্মীয় ও স্ত্রী-পুত্রেরা ধনের লোভে আপনাকেই ত্যাগ করেছে তাদের জন্য আপনার মন এখনও এরকমভাবে স্নেহাসক্ত হচ্ছে কেন? রাজার যুক্তিপূর্ণ জিজ্ঞাসার উত্তরে সমাধি বৈশ্য বলেন—আপনি আমার সম্পর্কে যা বলেছেন তা অবশ্যই সঠিক। কিন্তু আমি কি করি বলুন। আমার মনকে যে তাদের প্রতি কিছুতেই নিষ্ঠুর করতে পারছি না। বরং

যারা ধনের লোভে পিতার স্নেহ, পতির প্রেম এবং আপনজনের প্রতি প্রীতি ত্যাগ করে আমাকেই তাড়িয়ে দিয়েছে, তাদের জনাই আমার মন আরও আসক্ত হচ্ছে। হে মহাশয়, যে স্ত্রী-পুত্রাদি আমার প্রতি স্নেহহীন, সেই তাদের প্রতিই আমার মন কেন এত প্রেমপ্রবণ, মমতাযুক্ত হয়েছে তা আমি বুঝেও বুঝতে পারছি না। তাদের জন্য আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ছে ও মনে দুশ্চিন্তা হচ্ছে; কিন্তু কি করি তারা যদিও আমার প্রতি প্রীতিহীন হয়েছে, তবু তাদের প্রতি আমার মন নিষ্ঠুর হচ্ছে না।

আমরা এই শ্রীশ্রীচণ্ডীর গল্প যাঁর মুখ থেকে শুনছি সেই মহর্ষি মার্কণ্ডেয় নিজ শিষ্য ক্রৌষ্টুকি ভাগুরিকে বলছেন—হে বিপ্র, তখন সেই সমাধি নামক বৈশ্য ও রাজা সুরথ দু'জন মিলিত হয়ে মেধস্ মুনির কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মুনির কাছে গিয়ে সমাধি বৈশ্য এবং রাজা সুরথ উভয়েই তাঁকে যথাবিধি শ্রদ্ধা দেখিয়ে ও যথাযোগ্য সম্ভাষণ করে তাঁর নিকট বসলেন। তারপর তাঁরা মুনিকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। প্রশ্নগুলি কি কি? মুনিবর সেগুলির উত্তরই বা কি দিলেন তা আমরা এখন তাহলে ধৈর্য ধরে, মন দিয়ে শুনি।

প্রথমেই রাজা সুরথ মেধস্ মুনিকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, হে ভগবন, আপনার কাছে আমি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা করি। আপনি কৃপা করে আমার সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। আমার মন আমার নিজের বশীভূত নয়। সেজন্য আমার হারানো রাজ্যাদিতে এখনও আমার মমতা আছে। আমি এও জানি যে এই মমতাই আমার দুঃখের কারণ। কিন্তু এরকম জানা সত্ত্বেও আমার হারানো রাজ্য ও রাজ্যের অঙ্গগুলির জন্য অজ্ঞের মত আমার যে আসক্তি বা মমতা রয়ে গেছে এর কারণ কি? এই সমাধি বৈশ্যকেও তাঁর স্ত্রী ও পুত্রগণ তাঁর ধন থেকে বঞ্চিত করেছে। তাঁর অমাত্য বা কর্মচারীরা তাঁকে বর্জন করেছে, এবং আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁকে পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু তবুও ইনি সেই তাদের প্রতি এখনও একান্তভাবেই আসক্ত। এভাবেই ইনি

অর্থাৎ সমাধি বৈশ্য এবং আমি উভয়েই অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। কারণ স্ত্রী-পুত্র-রাজ্যাদি বিষয়ে দোষ দেখেও তাদের প্রতি আমাদের মন মমতায় আকৃষ্ট হয়ে আছে। হে মহামতি, আমারও এরকম জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আমাদের এই যে মোহ তার কি হেতু? এরকম মূঢ়তা বিবেকহীন লোকদেরই হয়ে থাকে।

মেধস্ ঋষি অত্যন্ত ধীমান ও স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি শুধু নিজের মনের খবর কেন সকল মানুষের মনের খবর, এমনকি সকল প্রাণীরও মনের গোপন সংবাদটি জানেন। শুধু জানেন না, ভালমতই জানেন। তাই সেই অত্যন্ত মেধাবী ঋষি মেধস্ রাজা সুরথের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলতে লাগলেন— হে মহাভাগ, সকল প্রাণীরই রূপ, রস প্রভৃতি সম্পর্কিত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে জ্ঞান আছে এবং সেসব বিষয়সমূহ কিভাবে তাদের জ্ঞানগোচর হয় তা আপনাদের বলছি—

পেঁচা বা তার মত কোন কোন প্রাণী দিনের বেলায় দেখতে পায় না। তারা অন্ধই হয়ে থাকে। আবার কাক বা অন্যান্য অনেক পাখী রাতের বেলায় দেখতে পায় না। অন্ধই হয়ে থাকে। আরও দেখুন কেঁচো প্রভৃতি কোন কোন প্রাণী কি দিন, কি রাত্রি উভয় সময়ই অন্ধ থাকে। আর বিড়াল প্রভৃতি কোন কোন প্রাণী দিন এবং রাত্রেও সমানভাবেই দেখতে পায়। একথা অত্যন্ত সত্য মানুষদের বিষয়জ্ঞান আছে। কিন্তু শুধু তারাই যে বিষয়জ্ঞান সম্পন্ন তাও ঠিক নয়। কারণ, পশু, পাখী, হরিণ ও মাছ প্রভৃতি সকল প্রাণীরই বিষয়জ্ঞান আছে। পশু-পাখীদের যেরকম বিষয়ে জ্ঞান আছে, মানুষদেরও সেরকমই বিষয়ে জ্ঞান রয়েছে। আবার মানুষদের যে রকম বিষয়ে জ্ঞান আছে, পশু-পাখীদেরও সেরকমই আছে। আহার, নিদ্রা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান পশু-পাখী এবং মানুষ উভয়েই সমান।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় হিন্দুদের অন্যতম উপদেশগ্রন্থ হিতোপদেশে একটি সুন্দর শ্লোকে তাই হয়তো বলা হয়েছে—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।।

অর্থাৎ, আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন প্রভৃতির জ্ঞান পশু ও মানুষ উভয়েরই একই। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে ধর্মবুদ্ধি আছ, তাতো পশুদের মধ্যে নেই। সেখানেই মানুষের বিশেষত্ব। সেখানেই পশু থেকে মানুষ আলাদা। না হলে ধর্মহীন মানুষ তো পশুরই সমান।

যাক্ আমরা আবার ঋষির কথা শুনি। ঋষি বলে চলেছেন—দেখুন পাখীরা যে খাবার সংগ্রহ করে তাই তাদের শাবকের মুখে তুলে দেয়। এর ফলে তারা খেলেও তাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। একথা আমরা যেমন জানি, বুঝি, তেমনি পাখীরাও বুঝে। অথচ সব জেনে ও বুঝেও তারা শস্যকণা তাদের শাবকদের মুখে তুলে দিতে কত আগ্রহ। হে নরশ্রেষ্ঠ, এই মানুষদের ক্ষেত্রে আবার দেখছেন না, তারা ভাবে তাদের সন্তান ভবিষ্যতে তাদের প্রত্যুপকার করবে; সেই লোভে তারা তাদের সন্তানদের প্রতি কতই না অনুরক্ত হয়? তবুও সংসারের স্থিতিকারিণী মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ মোহরূপ গর্তে এবং মমতারূপ আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। এই মহামায়াই জগৎপতি বিষ্ণুর যোগনিদ্রা স্বরূপিণী (তমঃ প্রধানা শক্তিঃ)। তাঁরই দ্বারাই এই সারা জগৎ মোহিত হয়ে আছে। সুতরাং এ বিষয়ে আর আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। এমনকি সেই দেবী ভগবতী মহামায়ার প্রবল প্রভাব থেকে জ্ঞানবান বা বিবেক সম্পন্ন মানুষদেরও রেহাই নেই। সেই মহামায়া তাঁদের চিত্তকেও জোর করে আকর্ষণ করে মোহের দ্বারা আবৃত করে রাখেন। অতএব যারা সাধারণ মানুষ তারা যে তাঁর মোহপাশে আবদ্ধ থাকবে তাতে আর আশ্চর্যের কি?

প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে মাতৃসাধক রামপ্রসাদের সেই গানখানি,
মা আমায় ঘুরাবে কত, কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত?
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।

তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অনুগত।.... ইত্যাদি।

ঋষি বলছেন—সেই মহামায়াই এই সমস্ত চরাচর জগৎকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রসন্না হলে তাঁরই কৃপায় মানুষ মুক্তিলাভের জন্য অভীষ্ট বর পেয়ে থাকে। সেই মহামায়াই সংসার থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়। তিনিই পরমা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী ও সনাতনী। তিনিই সংসার বন্ধনের কারণ স্বরূপিণী অবিদ্যা এবং তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী, অধীশ্বরী।

মহাশক্তি মহামায়া—যাঁর মায়াপাশ থেকে জগৎ-সংসারের কারও অব্যাহতি নেই, রাজা সেই মহাশক্তিস্বরূপিণী অকল্পনীয় শক্তির কথা ঋষির মুখে শুনে বিস্মিত! স্বভাবতঃই তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে—যা তিনি ঋষির কাছে ব্যক্তও করেছেন—

**ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্।**
**ব্রবীতি কথম্ উৎপন্না সা কর্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ।।**
**যৎস্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা।**
**তৎ সর্বং শ্রোতুম্ ইচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর।।**

অর্থাৎ হে ভগবন্, আপনি যাঁকে মহামায়া বলছেন— সেই দেবী কে? তিনি কিরূপে উৎপন্না হন? হে মুনিবর, তাঁর কর্মই বা কি? রাজা আরও প্রশ্ন করেছেন—হে ব্রহ্মজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই মহামায়ার স্বভাব কি রকম? তাঁর স্বরূপ কি রকম? এবং যেজন্য তাঁর আবির্ভাব হয়—সে-সকল কথা আপনার কাছ থেকে আমি শুনতে ইচ্ছা করি।

প্রশ্নগুলি কিন্তু মোটেই সহজ নয়। আবার একটি, দুটি প্রশ্নও নয়। একই সঙ্গে ছয় ছয়টি প্রশ্ন—(১) তিনি কে? (২) তিনি কিভাবে উৎপন্না হন? (৩) তাঁর কাজ কি? (৪) কি তাঁর স্বভাব? (৫) তাঁর স্বরূপ বা আকৃতি কেমন এবং (৬) তাঁর উৎপত্তি কোথা থেকে অর্থাৎ তাঁর পিতার পরিচয়টি কি?

এ প্রশ্ন কি শুধু রাজার বা সমাধি বৈশ্যেরই? তাই নয়। পরন্তু যুগ

যুগ ধরে বহু মানুষের অন্তরেই সেই প্রশ্ন জেগেছে এবং আজও জাগছে। সেই প্রশ্নের উত্তরের জন্য তাঁরা প্রাণপাত তপস্যাও করেছেন। যাঁর তপস্যায় সেই পরমেশ্বরী তুষ্টা হয়েছেন, তিনিই তাঁর অর্থাৎ সেই মায়ের করুণায় নিজ অন্তরের যাবতীয় প্রশ্নের সমাধান পেয়ে হয়েছেন ধন্য, হয়েছেন কৃত-কৃতার্থ। এযুগে তেমন একজন মানুষের কথা অনেকেরই জানা। তিনি হলেন—

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। তখনও তিনি স্বামী প্রণবানন্দজী হননি, সবাই তাঁকে জানে ও ডাকে বিনোদ সাধু বা ব্রহ্মচারী বিনোদ বলে। তাঁর গ্রামে অর্থাৎ বাজিতপুরে মা দুর্গার প্রতিমা তৈরি করে পূজা হয়। তিনি বালক বয়স থেকে তা দেখে আসছেন। স্বভাবতঃই মনে তাঁর প্রশ্ন জাগে—এই যে এত লোকে মা দুর্গার পূজা করে একি ঠিক! কাঠ, খড়, মাটি, রং দিয়ে যে মূর্তি তৈরি করা হয় তাতে সত্যিই কি মা দুর্গা আসেন! বা এই যে এত ভোগ নিবেদন করা হয় তা-কি সত্যি সত্যি মা দুর্গা গ্রহণ করেন — ইত্যাদি নানান প্রশ্ন।

গ্রামের কবিরাজ হরবিলাস দাশের বাড়ীতে দুর্গাপূজা হয়। কবিরাজ মশায় ব্রহ্মচারীকে খুবই ভালবাসেন। আবার তাঁকে শ্রদ্ধাও করেন। কারণ তিনি জানতেন ব্রহ্মচারী কঠোর তপস্বী ও পূর্ণ ব্রহ্মচারী। কবিরাজ মশায় একবার দুর্গাপূজার সময় ব্রহ্মচারীকে তাঁদের বাড়ীতে যাওয়ার অনুরোধ করেন। নানা কাজে সারা দিনে আর তাঁর যাওয়ার সময় হয়নি। স্বাভাবিক কারণেই কবিরাজ মশায় চিন্তা করছেন—সকলেই এল অথচ বিনোদ কেন এলেন না?

গভীর রাত্রি। ব্রহ্মচারী প্রতিদিনের মত সেদিনেও রাত্রে শ্মশানে সাধনা করতে গিয়েছেন। সাধনা শুরুও হয়েছে। হঠাৎ শোনেন আরতির বাদ্য। বিস্মিতই হন—এত রাত্রে আরতির বাদ্য! মনে পড়ে যায় কবিরাজ মশায়কে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা। সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে সাধনার আসন ছেড়ে ছুটে যান হরবিলাসবাবুর বাড়ীতে। গিয়ে দেখেন সকলেই ঘুমুচ্ছে।

চারিদিক নিস্তব্ধ। পূজামণ্ডপ জন-মানব শূন্য। বিস্ময় জাগে মনে তাহলে আরতির বাদ্য এল কোথা থেকে? তাহলে একি দেবীর ছলনা? সঙ্কল্পসিদ্ধ ব্রহ্মচারীর মনে জাগে কঠোর সঙ্কল্প—আজ দেখতে হবে প্রতিমায় সত্যি সত্যি দেবীর আবির্ভাব হয় কি-না বা তিনি আছেন কি-না—ইত্যাদি প্রশ্ন। মাতৃ-প্রতিমার সামনে বসে গেলেন ধ্যানে। সদা ব্রহ্মসদ্‌ভাবে অবস্থিত ব্রহ্মচারী ক্ষণকালেই হলেন সমাহিত। ডুবে গেলেন সমাধির অতল তলে। সঙ্গে সঙ্গে আদ্যাশক্তি স্বরূপিণী মহামায়া তাঁর কাছে প্রকাশিতা হলেন। ব্রহ্মচারীর অন্তরের যাবতীয় প্রশ্নের হল সমাধান।

আচ্ছা, এখন আমরা তাহলে আবার শুনি রাজার প্রশ্নের উত্তরে ঋষিবর কি উত্তর দেন। ঋষিবর বলছেন—

সেই মহামায়া নিত্যা। অর্থাৎ তাঁর জন্ম নেই। মৃত্যুও নেই। আবার এই যে জগৎপ্রপঞ্চ এ তাঁরই বিরাট মূর্তি। তিনি সর্বত্রই বিরাজমানা। তিনি নিত্যা। তাহলেও তাঁকে বহুবার বহুরূপে আবির্ভূত হতে হয়েছে ও হতে হয়। আমি আপনাদের কাছে তাঁর সেই আবির্ভাবেরই কথা বলছি। আপনারা তা মনোযোগ সহকারে শুনুন।

যখন তিনি দেবতাদের কার্যসম্পন্ন করার জন্য আবির্ভূতা হন, স্বরূপতঃ নিত্যা হলেও তখন তিনি পৃথিবীতে আবির্ভূতা বা উৎপন্না বলেই অভিহিতা হন। প্রলয়কালে অর্থাৎ ব্রহ্মার যখন দিবা অবসান হল, তখন এই জগত এক বিরাট কারণ-সমুদ্রে পরিণত হল, তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু অনন্ত নাগকে শয্যারূপে বিস্তার করে যোগনিদ্রায় নিমগ্ন হলেন। সেসময় বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে মধু ও কৈটভ নামে বিখ্যাত দুই ভয়ঙ্কর অসুরের সৃষ্ট হয়। তারা উদ্যত হয় ব্রহ্মাকে বধ করতে।

এখানে আমাদের আশ্চর্য লাগে নাকি যে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকেই ওই দুই অসুর বধ করতে উদ্যত হয়েছে! তারা এত শক্তি ও সাহস কোথা থেকে পেল? এ বিষয়ে জানার জন্য আমরা একটু দেবী ভাগবতে মহাজ্ঞানী সূতের মুখে কিছু শুনে নিতে পারি।

## মধু-কৈটভবিধ্বংসী মাকে প্রণাম, প্রণমি তোমারে মা।

সূত বলছেন—পূর্বে প্রলয়কালীন সাগর জলে অখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত এবং ত্রিভুবন বিলীন হলে, যখন দেবদেব জনার্দন অনন্ত শয্যায় শয়ন করেছিলেন, সে সময়ে সেই মহাবলশালী মধু-কৈটভ নামক দুই দানব বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে সৃষ্ট হয়ে সাগর জলেই বড় হতে লাগল। তারা জলের মধ্যে খেলা করতে করতে চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত করে। তারপর একদিন সেই বিশাল শরীর দুই দানব পরস্পর ভাইয়ের মতই খেলা করতে করতে মনে মনে চিন্তা করল, সর্বত্রই ত এইরকমই নীতি যে, বিনা কারণে কোন কাজই হয় না। এবং আধেয়ও অর্থাৎ কোন আধারে যে দ্রব্য রাখা হয় তাও বিনা আধারে থাকতে পারে না। কিন্তু আমাদের আধার আধেয় ভাব অর্থাৎ আমরা কার মধ্যে আছি, বা আমাদের কে ধরে রেখেছে কিছুই বুঝতে পারছি না। এই সুখময় সুবিস্তৃত জলরাশি কোন বস্তুর উপর অবস্থান করছে, কে এর সৃষ্টিকর্তা, কিভাবেই এর উৎপত্তি হয়েছে, আমরাই বা কেন জলের মধ্যে মগ্ন হয়ে অবস্থান করছি? কে আমাদের সৃষ্টি করল, কিরকম ভাবেই বা সৃষ্ট হলাম এবং আমাদের মা-বাবাই বা কে? এ সকল কিছুই তো জানি না। তারা উভয়ে এরকম অনেক চিন্তা করেও যখন কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছে না, তখন কৈটভ জলের মধ্যে তার পাশে থাকা মধুকে বলে—ভাই, আমার মনে হয়, আমাদের যে এই জলের মধ্যে থাকার অচলা মহাশক্তি আছে, তা-ই সবকিছুর কারণ হবে। এই জলরাশি সেই শক্তিতে পরিব্যাপ্ত হয়ে তাতেই অবস্থিত আছে। সেই পরমা দেবীই আমাদের কারণ হবেন। চিন্তায় ব্যাকুল দুই অসুর যখন ওই রকম বুঝতে পারল, তখন তারা আকাশে মনোহর বাগ্‌বীজ বা বাক্যের সূত্র শুনতে পেল। তারপর সেই বাগবীজ মন্ত্র বারবার উচ্চারণ করতে করতে তা বেশ ভালভাবে রপ্ত করে ফেলে। পরে তারা আকাশে

শুভা সৌদামিনী বা সুন্দরী অপ্সরাকে দেখে মনে মনে ঠিক করে নিশ্চয়ই আমাদের জপ্য মন্ত্রই তেজোরূপে আবির্ভূতা হয়েছেন এবং আকাশের মাঝে বাগ্‌দেবী সরস্বতীরও এই সগুণরূপ নিশ্চয় আমরা দর্শন করলাম। তারা মনে মনে এরকমই চিন্তা করে আত্মসংযম করে। উপবাসে থেকে সমাহিত চিত্তে একইভাবে জপধ্যানে তৎপর হয় ও ক্রমে তন্ময় হয়ে পড়ে। এভাবে তারা হাজার বছর যাবৎ তপস্যা করলে; সেই পরমা আদ্যাশক্তি তাদের প্রতি প্রসন্না হলেন। এবং তপস্যার ব্রতে তাদের মনের দৃঢ়তা ও অন্তরের সন্তোষ দেখে তাদের প্রতি করুণা করে অদৃশ্যভাবে থেকেই দৈববাণীরূপে বললেন—হে দৈত্যদ্বয়, আমি তোমাদের তপস্যায় পরম সন্তুষ্ট হয়েছি। সুতরাং তোমরা যা ইচ্ছা হয় তাই বর প্রার্থনা কর। আমি এখনই তোমাদের সেই বরই দান করব। তখন সেই দুই দানব ওই রকম আকাশবাণী শুনে বলে— হে দেবি, হে সুব্রতে, আমাদের ইচ্ছামৃত্যু বরদান করুন। তা শুনে দেবী বললেন— হে দানবযুগল আমার বরে তোমরা ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী হবে। এবং তোমাদের দুই ভাইকে সকল দেবতা ও অসুর মিলেও পরাজিত করতে পারবে না। দেবী এরকম বরদান করলে সেই দানব দু'জন মদদর্পিত হয়ে সাগর মধ্যে জলজন্তুগণের সাথে খেলা করতে থাকল। এভাবে কিছুকাল গত হলে সেই মহাবলশালী দানবদ্বয় একদিন খেয়ালখুশীমত ভগবান শ্রীহরির নাভিকমলে আসীন জগৎপ্রভু প্রজাপতিকে দেখে অত্যন্ত আনন্দচিত্তে যুদ্ধের বাসনায় তাঁকে বলে— হে সুব্রত, হয় আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, আর না হয় ওই পদ্মাসন ছেড়ে দিয়ে তুমি যেখানে খুশী চলে যাও।

যদি তুমি দুর্বল হও তবে এই পদ্মাসনে বসার যোগ্য তুমি অবশ্যই নও। কারণ এই সমাজে যারা বীর তারাই ওই আসনে বসার একমাত্র যোগ্য। সুতরাং তুমি যদি ভীরু হও, তবে তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালিয়ে যাও। প্রজাপতি বিষ্ণুর নাভি কমলস্থিত সেই পদ্মাসনের উপরে

বসে তপস্যা করছিলেন। তিনি তাদের ওই কথা এবং বিশাল শরীর ও শরীরে বিপুলশক্তি দেখে 'এখন কি করি' মনে মনে এরকম চিন্তা করতে লাগলেন।

ব্রহ্মা সব শাস্ত্রেই জ্ঞানী। তাদেরকে মহাবল ও পরাক্রান্ত দেখে সে-সময় সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চার উপায়ের মধ্যে কোন উপায়কে অবলম্বন করা যায় তাই চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন এদের শরীরে কি রকম শক্তি, তাতো জানি না। এদের সামর্থ্যও-বা কি রকম তাও অজানা। সুতরাং এদের সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত নয়। আর এখন যদি মদমত্ত এই দুই দানবের স্তুতি করি, তাহলেও নিজের দুর্বলতাই প্রকাশ পাবে এবং তখন এরা বুঝতে পারবে যে আমি দুর্বল—বলহীন। সেসময় এরা যে কোন একজনই আমাকে অবশ্যই সংহার করবে। এদের দান করার উপযুক্ত সময় এখন নয়। আর এদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টিই বা কিভাবে করব? অতএব এখন আমার বাঁচার একমাত্র উপায় অনন্তশয্যায় নিদ্রিত মহাবীর্যশালী জনার্দন চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণুই। তাঁকেই এখন জাগানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ভগবান কমলযোনি শ্রীহরির নাভিকমলের নালমধ্যে অবস্থান করে এরকম চিন্তা করতে করতে মনে মনে দুঃখনাশন শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। এবং যোগনিদ্রায় অভিভূত জগন্নাথ নারায়ণকে সন্তুষ্ট করতে বহু প্রশস্তি করে চললেন। তাঁর স্তুতি ছিল এরকমই—হে দীননাথ, হে হরে, হে বিষ্ণো, হে বামন, হে মাধব, আপনি অখিল জগতের পরিত্রাতা ও সর্ব্বব্যাপী। হে হৃষীকেশ, আপনিই-তো ভক্তগণের সকল দুঃখ দূর করেন। অতএব এখন যোগনিদ্রা ত্যাগ করে গাত্রোত্থান করুন। হে বাসুদেব, হে জগৎপতে, আপনি তো সকলের অন্তরে বিরাজমান থেকে তাদের মনোভাব সবই অবগত হচ্ছেন। হে চক্র-গদাধর, আপনার চিত্ত যে নিয়তই ভক্তগণের দুষ্ট রিপুদলনে আসক্ত। হে সর্বজ্ঞ, সর্বলোকের ঈশ্বর ও সর্বশক্তিমান, কেউই আপনার স্বরূপ নির্ণয় করতে পারে না। হে দেবেশ, আপনি যে সকল

দুঃখের বিনাশকারী। অতএব আপনি এখন গাত্রোত্থান করে আমাকে রক্ষা করুন। হে অখিলের আধার, আপনি নিরাকার হয়েও সৃষ্টি, স্থিতি লয় করছেন। অতএব হে জগতকারণ, আপনি সকলের উপরে রাজাধিরাজরূপে বিরাজমান থেকেও, এই মদমত্ত দুই দানব যে আমাকে মারতে উদ্যত হয়েছে এবং আমি যে বিপদে পড়েছি তা কেন আপনি বুঝছেন না? হে মহাবিষ্ণো, আমাকে অতি দুঃখার্ত ও শরণাগত দেখেও যদি উপেক্ষা করেন, তাহলে আপনার পালনকর্তা নামই ব্যর্থ হবে।

যোগনিদ্রায় অভিভূত ভগবান শ্রীহরিকে এভাবে বহু স্তুতি করলেও যখন তাঁর নিদ্রা দূর হল না তখন ব্রহ্মা ভাবলেন, ভগবান বিষ্ণু নিশ্চয়ই সেই আদ্যাশক্তির আক্রমণে নিদ্রায় অভিভূত হয়ে আছেন, জাগ্রত হচ্ছেন না। সুতরাং এখন আমি উপায় কি করি? এদিকে মদগর্বিত দুই অসুর যে আমাকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছে। এখন আমার কি করা উচিত? কোথায়-বা যাই? আমাকে রক্ষা করে এমন তো কাউকেই দেখছি না। এসব চিন্তা করতে করতে ব্রহ্মা ঠিক করলেন—একমনে সেই যোগনিদ্রাকেই এখন স্তব করি। তিনি মনে মনে আরও ঠিক করলেন যে, যিনি ভগবান বিষ্ণুকে অচেতন ও স্পন্দনবিহীন করে রেখেছেন, এই বিপদে সেই আদ্যাশক্তিই আমাকে রক্ষা করতে পারেন। প্রাণহীন ব্যক্তি যেমন শব্দাদি কিছুই অনুভব করতে পারে না, তেমনি শ্রীহরিও নিদ্রায় নিমীলিত নেত্র হয়ে কিছুই জানতে পারছেন না। আমি বহুবার বহু স্তুতি বাক্য বললেও যখন তিনি নিদ্রাত্যাগ করলেন না, তখন বোধহয় নিশ্চয় নিদ্রা হরির বশে নেই, বরং উনিই নিদ্রার বশীভূত হয়েছেন। ফলে যে যার বশবর্তী হয়, সে তারই কিঙ্কর স্বরূপ হয়ে যায়। সেজন্য এই যোগনিদ্রাই কমলাপতি হরির উপর প্রভুত্ব করছেন। যিনি নিজ স্বামী শ্রীহরিকে বশ করেছিলেন, সেই ক্ষীরোদনন্দিনী কমলাও যোগনিদ্রার বশীভূতা হয়েছেন। অতএব মনে হয় সেই ভগবতী মহমায়া অখিল জগৎকেই বশীভূত করেছেন। কি আমি, কি বিষ্ণু, কি শম্ভু এবং

কি সাবিত্রী, রমা বা উমা—আমরা সকলেই যে তার বশতাপন্ন, তার আর বিন্দুমাত্রও বিচারের প্রয়োজন নেই। অন্য মহাত্মার আর কথা কি? ভগবান হরিও যাঁর দ্বারা অভিভূত হয়ে প্রাকৃত জনের মত নিশ্চেষ্টভাবে নিদ্রিত আছেন, এখন সেই যোগনিদ্রাকেই স্তব করি। সনাতন বাসুদেব জনার্দনকে দেবী যোগনিদ্রা পরিত্যাগ করলেই তিনি দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন—এতে কোন সন্দেহ নেই। পদ্মনালে অবস্থিত ভগবান ব্রহ্মা এরকম স্থির চিন্তা করে বিষ্ণুর শরীরে অবস্থিতা যোগনিদ্রার স্তব করতে শুরু করলেন। ব্রহ্মা বললেন—হে নিত্যে, হে অক্ষরে, তুমিই দেবতাদের উদ্দেশ্যে হবিঃ দানের 'স্বাহা' মন্ত্ররূপা। তুমিই পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে দ্রব্যদানের 'স্বধা' মন্ত্ররূপা। তুমিই দেবতাদের আহ্বানের বষট্ মন্ত্র স্বরূপিণী। তুমিই উদাত্ত, অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বররূপা। তুমিই অমৃতরূপা এবং তুমিই অ-উ-ম এই মাত্রারূপে অবস্থিতা প্রণবরূপা। যা' বিশেষরূপে উচ্চারণের যোগ্যা নয়, সেই নির্গুণা বা তুরীয়া—তাও তুমিই। হে দেবি, তুমিই গায়ত্রীমন্ত্র স্বরূপিণী। তুমিই পরমা জননী। হে দেবি, তুমিই এই সমগ্র জগৎকে ধরে রেখেছ। এই জগৎ তোমারই দ্বারা সৃষ্ট ও প্রতিপালিত হয় এবং সবসময় প্রলয়কালে তুমিই একে গ্রাস করে থাক বা সংহার করে থাক। হে জগৎস্বরূপা, তুমিই এই জগতের সৃষ্টির সময় সৃষ্টিরূপা, পালনকালে তুমিই স্থিতিরূপা এবং প্রলয়ের সময় তুমিই সংহারক্রিয়া রূপা। হে দেবি, তুমিই তত্ত্বমসি ইত্যাদি মহাবাক্য লক্ষণা ব্রহ্মবিদ্যা ও মহামায়া। তুমিই মহতী মেধা বা ধারণা। তুমিই মহতী স্মৃতি ও মহামোহরূপিণী। তুমি সর্বরূপিণী। তুমিই দেবশক্তি আবার সকল অসুরশক্তিও তুমি। তুমিই সর্বভূতের মূল কারণরূপা প্রকৃতি এবং গুণত্রয়ের প্রসবকারিণী। তুমিই কালরাত্রি অর্থাৎ যাতে ব্রহ্মার লয় হয় ও মহারাত্রি বা যাতে জগতের লয় হয় এবং ভীষণ মোহরাত্রিস্বরূপাও। তুমি শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী। তুমিই ঈশ্বরী শক্তি। তুমিই হ্রী। তুমিই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। তুমিই লজ্জা। তুমিই পুষ্টি এবং তুমিই শান্তি ও ক্ষমারূপিণী।

তুমি খড়্গধারিণী , তুমিই ত্রিশূলধারিণী, তুমি ভয়ঙ্করী, গদাধারিণী, চক্রধারিণী, শঙ্খধারিণী এবং ধনুর্ধারিণী। তুমিই বাণ, ভূশণ্ডী ও পরিঘ নামে অস্ত্রধারিণী। তুমিই দেবতাগণের প্রতি প্রশান্তা বা সৌম্যা। তুমিই দৈত্যগণের প্রতি অসৌম্যতরা অর্থাৎ ততোধিক রুদ্রা। তুমিই সকল সুন্দর বস্তুসমূহ থেকেও সুন্দরী। তুমি ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তুমি সর্বপ্রধানা দেবী ও তুমিই পরমেশ্বরী। হে সর্বস্বরূপে যে কোনও জায়গায় বা স্থানে যে কোন চেতনা বা জড় বস্তু অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে হবে সেই সকলের যে শক্তি তা একমাত্র তুমিই। অতএব কিভাবে তোমার স্তব করব? যিনি ব্রহ্মারূপে জগতের সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে জগৎকে পালন করেন এবং শিবরূপে জগৎকে সংহার বা ধ্বংস করেন, সেই পরমেশ্বরকেই তুমি নিদ্রায় অভিভূত করেছ। সুতরাং এই জগৎ সংসারে তোমার স্তব করার সাধ্য কার আছে? তুমি আমাকে, বিষ্ণুকে এবং শিবকেও শরীর গ্রহণ করিয়েছ। সুতরাং কে তোমার স্তব করতে পারে? হে দেবি, তুমি এরকমভাবে নিজ অলৌকিক মহিমায় সংস্তুতা হয়ে মধু ও কৈটভ নামক এই দুর্জয় দুই অসুরকে মোহিত কর। হে দেবি, তুমি জগৎস্বামী বিষ্ণুকে শীঘ্র যোগনিদ্রা থেকে জাগিয়ে এই দুই মহাসুরকে বধ করার জন্য প্রবৃত্তি দান কর।— এভাবে ব্রহ্মা দশ হাতে যিনি খড়্গ, চক্র, গদা, তীর, ধনুক, পরিঘ, শূল, ভুশণ্ডী, নরমুণ্ড ও শঙ্খ ধরে থাকেন; যিনি ত্রিনয়নী, যাঁর সর্বাঙ্গ বিভিন্ন ভূষণ দ্বারা সুশোভিতা; যাঁর দেহের জ্যোতি নীলকান্তমণি তুল্য, যিনি দশমুখ ও দশ চরণবিশিষ্টা সেই পরমেশ্বরী মহাকালীর স্তব করলেন।

দেবী মহাশক্তি মহামায়া ব্রহ্মার স-কাতর স্তবে সন্তুষ্টা হলেন। তিনি মধু ও কৈটভের বিনাশের জন্য এবং ভগবান বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ করার জন্য তাঁর চোখ, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় এবং বক্ষস্থল থেকে নির্গত হয়ে ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচর হলেন। এদিকে যে সময় নিদ্রার অধিকারী মূর্তিমতী পরাৎপরা তামসী শক্তি জগদ্গুরুর শরীর থেকে

নির্গতা হয়ে আকাশমণ্ডলে অবস্থান করতে লাগলেন, তখনই মহাতেজা জগন্নাথ বিষ্ণু বার বার হাই তুলতে তুলতে উঠেই প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দেখে মেঘগম্ভীর স্বরে বললেন—ভগবন্ পদ্মযোনে, কিজন্য তুমি তোমার তপস্যা ছেড়ে দিয়ে এখানে এসেছ? কেনই বা তুমি এরকম ভয়ে ব্যাকুল চিত্ত ও চিন্তায় আতুর হয়ে আছ? তা শুনে ব্রহ্মা বললেন —"হে দেব, আপনার কর্ণমল থেকে জাত মহাবলবান্ ও পরাক্রমশালী মধু এবং কৈটভ নামক দুই দৈত্য আমাকে বধ করতে উদ্যত হওয়ায়, আমি তাদের ভয়ে আপনার কাছ এসেছি। অতএব হে জগতের পতি, হে বাসুদেব, এখন আমি বুদ্ধিহারা ও ভয়ে ভীত। আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করুন।" বিষ্ণু তাঁর কথা শুনে বললেন—"এখন তুমি নির্ভীক চিত্তে অবস্থান কর। সেই আয়ুশূন্য দুই মূঢ় যুদ্ধের জন্য আমার কাছে উপস্থিত হোক। আমি অবশ্যই তাদের বিনাশ করব।"

ভগবান বিষ্ণু এই কথা বলতে না বলতেই মদগর্বিত মহাবলশালী দুই অসুর ব্রহ্মাকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানেই এসে উপস্থিত। তারা ব্রহ্মাকে দেখেই বলে—তুমি পালিয়ে এঁর কাছে আশ্রয় নিয়েছ? তাতে কি হবে? যুদ্ধ কর। এঁর সামনেই তোমাকে বধ করছি। পরে সর্পশয্যাশায়ী এঁকেও বিনাশ করব। হয় তুমি এখনই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও, না হয় স্বীকার কর 'আমি তোমাদের দাস'। জনার্দন বিষ্ণু তাদের মুখে ওই কথা শুনে তাদের বললেন—ওহে যুদ্ধের জন্য উন্মাদ দানব পুঙ্গবদ্বয়, তোমরা আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। আমি অবশ্যই তোমাদের অহঙ্কার চূর্ণ করব। হে মহাবলশালী মহাভাগদ্বয়, যদি আমার কথায় শ্রদ্ধা হয়, তবে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে এস। সেই নিরাধার জলমধ্যে অবস্থিত দানবযুগল শ্রীবিষ্ণুর ওই কথা শুনে এমন রাগান্বিত হল যে, রাগে তাদের চোখ ঘুরতে থাকে। তারা যুদ্ধের জন্য উদ্যত হয়। তাদের মধ্যে মধুদৈত্যের রাগ খুব বেশি হওয়ায় সে-ই আগে শ্রীহরির সঙ্গে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে

যায়। কৈটভ নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মদমত্ত দুই মল্লযোদ্ধার মত ভগবান হরি ও মধুর বাহুযুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধে মধু ক্লান্ত হয়ে পড়ায় কৈটভ যুদ্ধ করতে থাকে। পরে মধু ও কৈটভ দুই দানব একই সঙ্গে বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধ করে। সেই ভয়ানক যুদ্ধ আদ্যাশক্তি ও ভগবান্ ব্রহ্মা অন্তরীক্ষে থেকে দেখতে লাগলেন। এভাবে বহুদিন যুদ্ধ করার পরও দানবদের কোন ক্লান্তি নেই। কিন্তু ভগবান বিষ্ণু ক্লান্ত হয়ে পড়েন। এদিকে যুদ্ধ করতে করতে পাঁচ হাজার বছর পার হয়ে যায়। ভগবান বিষ্ণু ভাবেন—পাঁচ হাজার বছর ধরে যুদ্ধ করলাম। কিন্তু আমিই ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। কি আশ্চর্যের বিষয়! আমার সেই বলবিক্রম কোথায় গেল। আর এ দানবরাই বা ক্লান্ত হচ্ছে না কেন? এখন আগে তা মনে মনে বিচার করা কর্তব্য।

দুই দানব ভগবান হরিকে ওই চিন্তায় ব্যাকুল দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে মেঘের ন্যায় গম্ভীর গর্জন করে বলে— হে বিষ্ণো, যদি তুমি পরিশ্রান্ত হয়ে থাক, যদি তোমার আর যুদ্ধ করার ক্ষমতা না থাকে, তবে মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করে বল, আমি তোমাদের চাকর হলাম। আর না হয় শক্তি থাকে তো এখন যুদ্ধ কর। হে মহামতে, আমরা আগে তোমাকে সংহার করব। তারপর এই চারমুখওয়ালা পুরুষটিকেও সংহার করব। মহামনা বিষ্ণু দুই দানবের সেকথা শুনে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে মধুর ভাষায় বলতে লাগলেন—দেখ, শ্রান্ত, ভীত, অস্ত্রত্যাগী, পতিত ও বালকের প্রতি কখনো প্রহার না করাই সনাতন বীরধর্ম। তোমরা উভয়েই আমার সঙ্গে পাঁচ হাজার বছর ধরে যুদ্ধ করেছ। কিন্তু আমি একা। তোমরা উভয়েই সমান বলবান এবং উভয়েই পালাক্রমে বিশ্রাম করেছ। সেজন্য আমি এখন একটু বিশ্রাম করে নিই, তারপর আবার তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। সেই দানবশ্রেষ্ঠ দুই ভাই শ্রীহরির ওই রকম কথা শুনে তাঁর কথাতে ভরসা রেখে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে দূরে অপেক্ষা করতে থাকল। চতুর্ভুজ বাসুদেব তাদের দূরে থাকতে দেখে

মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—কিভাবে এদের মৃত্যু হবে। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর তাঁর মনে হল—দেবী পরমা শক্তি এদেরকে ইচ্ছামৃত্যু বরদান করেছেন। তাই তো এরা যুদ্ধে ক্লান্ত হচ্ছে না। অতএব আমি যে এতক্ষণ যুদ্ধ করলাম তা বৃথাই গেল। এখন আমি এরকম খবর জেনেও তাদের সঙ্গে কি করে যুদ্ধ করি এবং যদি যুদ্ধ না করি, তাহলে দেবীর বরে বলীয়ান এই দুই দৈত্য কিভাবে বিনষ্ট হবে? দেবী ভগবতীর বর পাওয়ায় এদের মৃত্যু তো মোটেই সহজ নয়। কারণ কেউ কখনও নিতান্ত দুঃখ পেলেও নিজের ইচ্ছামৃত্যু কামনা করে না। ভীষণ রোগগ্রস্ত ও নিতান্ত দৈন্যদশায় পড়লেও কেউ কখনও মরার ইচ্ছা করে না। সুতরাং কিভাবে মদোন্মত্ত এই দুই দানব মৃত্যুর জন্য ইচ্ছা করবে? এখন সকল অভীষ্টপূরণকারিণী আদ্যাশক্তি বিদ্যা-দেবীরই শরণাপন্ন হই। তিনি প্রসন্ন না হলে কোন প্রকার অভীষ্টই সিদ্ধ হবে না। ভগবান বিষ্ণু এসকল চিন্তা করে গগনাঙ্গনে বিরাজমানা সেই মনোহরা যোগনিদ্রা শিবাকে দেখতে পেলেন। তিনি বরদা ভুবনেশ্বরী মহাকালীকে দেখে করযোড়ে স্তব করতে লাগলেন—

হে সর্বকল্যাণময়ি চণ্ডিকে, আপনিই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও সংহার করছেন। কিন্তু আপনার জন্ম বা মৃত্যু কিছুই নেই। হে দেবি মহামায়া, আপনিই সর্বরকম ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করে থাকেন। অতএব আপনাকে নমস্কার। হে দেবি, আমি যখন আপনার সগুণ ও নির্গুণ কোনরূপের অবগত নই, তখন কিভাবে আপনার সংখ্যাতীত লীলাচরিত্রের বিষয়ে জানতে পারব? হে মাতা আপনি যে আজ আমাকে নিদ্রার বশ করে অচেতন করেছিলেন, এতেই আমি আপনার অনির্বচনীয় প্রভাবের বিষয়ে জানতে পেরেছি। আপনিই নিজ প্রভাবে আমাকে অচেতন করেছিলেন এবং আপনিই আমাকে নিদ্রা থেকে মুক্ত করায় দুই দানবের সঙ্গে বহুবার যুদ্ধ করেছি। কিন্তু হে মানদানকারিণি, এখন আমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেও আপনার বরে বলীয়ান দুই দানব বিন্দুমাত্রও

পরিশ্রান্ত হয়নি। এই মদগর্বিত দানবদ্বয় ব্রহ্মাকে সংহার করতে উদ্যত হওয়াতেই আমি তাদেরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করি। এখন এই মহার্ণবের মধ্যে আমার সঙ্গে তাদের ঘোর সংগ্রাম চলছে। পরে আপনিই তাদের ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়েছেন জেনে ওগো শরণাগত-পালনী আমি আপনারই শরণাপন্ন হয়েছি। অতএব দেবতাদের দুঃখনিবারিণি মা, এই দুই দানব আপনার বরে অত্যন্ত গর্বিত এবং আমি যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এজন্য এখন আপনি আমাকে সাহায্য করুন। ওই দেখুন, দুই পাপিষ্ঠ আমাকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছে। আপনার কৃপা ছাড়া আমি এখন কি করি, কোথায় যাই?

সনাতন বাসুদেব শ্রীহরি প্রণাম করে বিনীতভাবে এরকম স্তব ও প্রার্থনা করলে আকাশমণ্ডলে অবস্থিতা দেবী মহাকালী ঈষৎ সহাস্যবদনে বলেন, হে দেবদেব হরে, তুমি আবার যুদ্ধ কর। মহাবলী এই দুই দানব আমার মায়ায় বিমোহিত হলে তুমি তাদের সংহার করবে। আমি অবশ্যই তাদের মোহিত করব। পরে তুমি অতি দ্রুত তাদের বিনাশ করবে। ভগবান্ বিষ্ণু ভগবতীর সুন্দর আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে সেই মহা জলরাশির মধ্যে আবার যুদ্ধে উপস্থিত হলেন। তাঁকে যুদ্ধে পুনরায় আসতে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে দানবেরা বলে—ওহে চতুর্ভুজ, তোমার মনের ইচ্ছা খুবই মহৎ দেখছি। এখন যুদ্ধে জয়-পরাজয় অবশ্যই দৈবের অধীন। বিবেচনা করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। দেখ যুদ্ধে যদিও সবল ব্যক্তিই জয়ী হয় কিন্তু কখনও কখনও দুর্বল ব্যক্তিও জয়ী হয় বৈকি। এজন্য মহান্ ব্যক্তিদের যুদ্ধে জয় বা পরাজয়ের জন্য আনন্দ বা দুঃখ কোনটিই করা উচিত নয়। আমি আগে বহু দানবের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় আনন্দ এবং এখন মাত্র এই দু'জনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হলাম বলে শোক করো না। সেই মহাবলবান্ মধু-কৈটভ এই সমস্ত কথা বলে যুদ্ধের জন্য অবতীর্ণ হল। ভগবান্ বিষ্ণু সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভীষণ মুষ্টি প্রহারে আহত করেন। তারাও হরিকে মুষ্ট্যাঘাত করে। এভাবে পরস্পরের ভীষণ

যুদ্ধ চলে। সেসময় নারায়ণ হরি মহাবীর্যশালী দানবযুগলকে অবিরত যুদ্ধ করতে দেখে দীননেত্রে দেবী মহাকালীর মুখের দিকে তাকালেন। দেবী ভগবান বিষ্ণুকে ওই রকম কাতর দেখে উচ্চরবে হাসলেন এবং সেই দুই অসুরের প্রতি রক্তচক্ষু দৃষ্টি দিয়ে ঈষৎ মধুর হাস্য সমন্বিত কাম ও প্রেমভাবপূর্ণ কামদেবের অন্য শরসকলের মত কটাক্ষ দ্বারা পীড়া দিতে শুরু করেন। সেই পাপমতি দৈত্যরা দেবীর ওই দৃষ্টি দেখেই মুগ্ধ হয়ে পড়ে এবং তাকেই তারা পরম সুখকর মনে করে কামবাণে পীড়িত হয়ে বিশদপ্রভা দেবীর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ভগবান শ্রীহরিও দেবীর সেই অদ্ভুত মোহিনীলীলা সম্যক্‌রূপে দেখলেন। তারপর কার্যতত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞতম ভগবান বিষ্ণু দানবদের মহামায়ার মহামায়ায় মোহিত জেনে হাসিমুখে মেঘের স্বরে বললেন—হে বীরদ্বয়, আমি তোমাদের যুদ্ধে পরম প্রীত হয়েছি। অতএব তোমরা তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত বর প্রার্থনা কর। আমি আগে অনেক অনেক দানবকে যুদ্ধ করতে দেখেছি। কিন্তু তোমাদের মত যুদ্ধ বিশারদ আর কাকেও দেখিনি, শুনিও নি। অতএব আমি তোমাদের এরকম অতুলনীয় যোদ্ধা বলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি. সেজন্য হে মহাবলশালি অসুরদ্বয়, আমি তোমাদের উভয়কেই বর দিতে ইচ্ছা করি।

জগদানন্দকারিণী মহামায়া মোহময় শ্রীমুখ দেখে কামার্ত অসুরেরা বিষ্ণুর ওই জাতীয় কথা শুনে অভিমানী হয়ে বিষ্ণুকে বলে —ওহে হরি, তুমি আমাদের কি দিতে চাইছ? আমরা কি তোমার কাছে ভিখারী। হে দেবেশ, আমরাই তোমাকে অভীষ্ট বর দান করছি. আমরা দান করি, দান গ্রহণ করি না। অতএব হে বাসুদেব হৃষিকেশ, আমরা তোমার অদ্ভুত যুদ্ধে তুষ্ট হয়েছি। সেজন্য তুমিই আমাদের কাছে তোমার যে রকম মনে ইচ্ছা হয় সেই বরই প্রার্থনা কর। ভগবান জনার্দন তাদের কথা শুনে বললেন—যদি তোমরা সত্য-সত্যই আমার প্রতি তুষ্ট হয়ে থাক, তবে উভয়েই আমার বধ্য হও। দানব মধু-কৈটভ বিষ্ণুর ওই

কথা শুনে বিস্মিত হয়ে গেল। তারা ভাবল আমরাই বঞ্চিত হলাম। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মনে এল দুঃখ। পরে চারিদিকে জল, কোথাও ডাঙা নেই দেখে, মনে বিচার করে বলে—হে জনার্দন হরে, জানি তুমি সত্যবাদী। অতএব হে দেবেশ তুমি আগে আমাদের বর দিতে চেয়েছিলে, আমরা এখন তোমার নিকটই বর প্রার্থনা করছি। তুমি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বর দাও। হে মধুসূদন, আমরা তোমার বধ্যই হলাম। কিন্তু হে মাধব, তুমিও নিজের কথা ঠিক রেখে জলবিহীন বিপুল স্থলভাগে আমাদের সংহার কর। ভগবান হরি সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করে তাদের বললেন, হে মহাভাগদ্বয় আমি জলহীন বিশাল স্থলভূমিতেই তোমাদের সংহার করব। একথা বলেই তিনি তাঁর ঊরুযুগলকে আরও বড় করে তাদের সেই সাগর জলের উপর বিশাল জলহীন স্থলভূমি দেখিয়ে বললেন—এই দেখ এখানে বিন্দুমাত্রও জল নেই। এখানে তোমরা তোমাদের মাথা রাখ। তাহলে আমিও সত্যবাদী হই এবং তোমাদেরও সত্য রক্ষা করা হবে। মধু-কৈটভ সে কথা শুনে মনে মনে চিন্তা করে নিজেদের দেহকে সহস্রযোজন বড় করে। ভগবান হরিও নিজের জঘন দেশকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলেন। তা দেখেই দুই দৈত্য বিস্মিত হয়ে যায়। এবং পরম ও অদ্ভুত জঘন দেশে তারা নিজেদের মাথা রাখে। তখন বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে তাদের প্রকাণ্ড মাথাগুলি দ্রুত কেটে দিলে মধু ও কৈটভের প্রাণান্ত হল। এভাবেই দেবী মহামায়া ব্রহ্মা কর্তৃক সংস্তুতা হয়ে স্বয়ং আবির্ভূতা হয়েছিলেন। এই দেবীর আরও আবির্ভাবের কাহিনী বলছি—মন দিয়ে শুনুন।

—ঃঃ—

## দৈত্যদর্পনিসূদিনী মা দুর্গা

ঋষি মেধস্ আদ্যাশক্তি মহামায়া সম্পর্কে জানতে আগ্রহী রাজা সুরথকে শ্রীশ্রীচণ্ডীর লীলা-মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এবার শুরু করলেন মহিষাসুর বধের কাহিনী বলতে। তিনি বলে চলেছেন পুরাকালের সেই প্রথম মন্বন্তরের কথা। তখন দেবতাদের রাজা ইন্দ্র এবং অসুরগণের অধিপতি মহিষাসুর। তাদের মধ্যে পুরো একশ বছর ধরে যুদ্ধ চলেছিল। সেই যুদ্ধে মহাবীর অসুরেরা দেব সৈন্যদের হারিয়ে দেয় এবং প্রবল পরাক্রমশালী মহিষাসুর সকল দেবগণকে পরাজিত করে হয় স্বর্গের অধীশ্বর। এরপর দেবতারা আদ্যাশক্তি মহামায়া শ্রীশ্রীচণ্ডীর শরণাপন্ন হলে তিনি আবির্ভূতা হয়ে কিভাবে মহিষাসুরকে বধ করেন আমরা তা ঋষির মুখে শুনতে পারবই। তবে তার আগে আমরা জেনে নিতে পারি এই মহিষাসুর কে? সে দেবতাদের সঙ্গে এত লড়াই করার শক্তি কোথায় পেল? ইত্যাদি কথা। সে কথা আমরা তাহলে শুনি 'দেবী ভাগবতম্' থেকেই—

দনুজের দুই ছেলের নাম রম্ভ ও করম্ভ। তারা ছিল দানবদের প্রধান। তাদের উভয়েরই কোন পুত্র-সন্তান হয়নি। পুত্রের বাসনায় তারা পঞ্চনদের পবিত্র জলে বহু বছর পর্যন্ত কঠোর তপস্যা করে। তাদের মধ্যে করম্ভ জলে ডুবে মহান তপস্যায় রত হয়। আর রম্ভ, যক্ষিণীদের আশ্রয়স্থান রসাল বটগাছকে আশ্রয় করে অগ্নির উপাসনা করতে থাকে। রম্ভ যখন পঞ্চাগ্নি সাধনায় বিশেষভাবে রত, তখন দেবরাজ ইন্দ্র সেই সংবাদ পেয়ে দানব দু'জনের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। কারণ তাঁর তো ভয় একটাই এরা যদি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে স্বর্গপুরী অধিকার করে বসে। সুতরাং তারা যেন সাধনায় সফল না হয় তেমন ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। তাই দেখা গেল বৃত্রাসুর নিহতকারী বাসব পঞ্চনদে গিয়ে কুমীরের রূপ ধারণ করেন। এবং কুমীর রূপে করম্ভ দানবের পা দু'টি ধরে তার বিনাশ করেন।

রম্ভ ভাই করম্ভের মৃত্যু সংবাদ শুনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। তখন

রম্ভ আর বিন্দুমাত্র দেরি না করে নিজের মাথার চুলের মুঠি বাম হাতে ধরে ডান হাত দিয়ে নিজের মাথা ছেদন করে তার দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার সঙ্কল্প নেয়। সেই সঙ্কল্প অনুযায়ী সে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ দিয়ে যখনই নিজের মাথা কাটতে উদ্যত হয়েছে, সে-সময়ই অগ্নিদেব তাকে বুঝিয়ে বললেন—ওরে মূর্খ দানব, তুমি নিজেই নিজের মাথা কাটতে উদ্যত হয়েছ কেন? আত্মহত্যা করা মহাপাপ। এমন কাজ তুমি কেন করতে যাচ্ছ? তোমার মনের যে অভিলাষ সেই মত তুমি বর প্রার্থনা কর। তোমার মঙ্গল হবে। এখন মরো না। মরলে তুমি তোমার কোন্ কাজে সফল হবে?

রম্ভ অগ্নিদেবের শ্রীমুখে সেই মধুর কথা শুনে নিজের চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে বলল—হে দেবেশ, আপনি যদি সত্যই সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তাহলে আমার আকাঙ্ক্ষিত বর দান করুন। যেন ত্রৈলোক্য বিজয়ী শত্রুর বল বিনাশকারী আমার একটি শিবের অংশসম্ভূত পুত্র জন্মে। সেই পুত্র যেন সর্বতোভাবে দেবতা, দানব ও মানবের অজেয় মহাবীর্যবান এবং কামরূপী হয়। অগ্নিদেব বললেন—তোমার ইচ্ছামতই তোমার পুত্র-সন্তানের জন্ম হবে। অতএব এখন তুমি আত্মহত্যা থেকে বিরত হও। তুমি যে রমণীতে তোমার সন্তান কামনা করবে, তাতেই তোমার অধিক বলবান পুত্র জন্মাবে।

অগ্নির বরলাভ করে দানবশ্রেষ্ঠ রম্ভ তাঁকে প্রণাম করে চলে যায়। তারপর এক সুরূপা মত্ত মহিষীর সঙ্গে সে রতি-অভিলাষ করে ও সেই মহিষী সন্তানসম্ভবা হয়। দানব সেই মহিষীকে রক্ষা করার জন্য পাতালে চলে যায়। কিন্তু কোন এক সময় অন্য এক মহিষ কামার্ত হয়ে ওই মহিষীকে তাড়া করে গেলে দানবরাজ রম্ভ নিজ স্ত্রীকে রক্ষা করার জন্য মহিষকে আঘাত করে। কামমোহিত মহিষও রম্ভকে তার শিং দিয়ে আঘাত করায় রম্ভ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায় ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। রম্ভের মৃত্যু হলে তার পত্নী ভয়ে পালিয়ে যক্ষদের আশ্রয় গ্রহণ করে। যক্ষেরা তার মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে মহিষের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ঘোর যুদ্ধে মহিষের প্রাণান্ত ঘটে। যক্ষগণ তাদের পরম প্রিয়পাত্র

রম্ভের দেহ সৎকার করার জন্য চিতায় স্থাপন করে। স্বামীর দেহ চিতায় রাখা হলে মহিষীও শোকে সেই চিতায় আত্মাহুতি দেয়। যক্ষেরা বহু চেষ্টা করেও তাকে আত্মাহুতি থেকে নিবারিত করতে পারল না। মহিষী চিতার আগুনে মারা গেলে মহাবল মহিষাসুর মাতৃগর্ভ ত্যাগ করে চিতার মাঝখান থেকে উঠে আসে। আর মৃত রম্ভও পুত্রের প্রতি বাৎসল্য বশতঃ অন্য রূপ ধরে পুনরায় জীবিত হয়। রূপান্তরিত রম্ভই রক্তবীজ এবং রম্ভের পুত্রই মহাবল পরাক্রান্ত মহিষ বা মহিষাসুর। মহিষাসুরকেই প্রধান প্রধান অসুরেরা রাজ্যে অভিষিক্ত করে। পরে মহিষাসুরের নেতৃত্বে দেবতা ও অসুরদের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ওই মহিষাসুরই এক সময় সুমেরু পর্বতে গিয়ে দেবতাদের বিস্ময়কর উৎকট তপস্যা শুরু করে। এবং একইভাবে অযুতবর্ষকাল মহিষাসুর একাগ্র হয়ে ধ্যানস্থ থাকলে লোক পিতামহ তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হন। তিনি মহিষাসুরের তপস্যার স্থানে এসে তাকে বলেন—হে ধর্মাত্মন্। তোমার আকাঙ্ক্ষিত বর তুমি প্রার্থনা কর। আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বর দিতে এসেছি। মহিষ বলে—হে প্রভু, হে দেবদেব, হে ব্রহ্মণ্, হে পিতামহ, যাতে মৃত্যুর কোন ভয় না থাকে আমি আপনার কাছে সেই বরই প্রার্থনা করি। ব্রহ্মা বলেন, হে দৈত্যপুঙ্গব, জন্ম হলেই মৃত্যু এবং মৃত্যু হলেই জন্ম হয়। এ-ঘটনা প্রাণীমাত্রেরই অবশ্যম্ভাবী। এমনকি কালে কালে পর্বত সকল বা সমুদ্রসমূহ সকলেরও অবশ্যই বিনাশ হবে। তুমি একমাত্র অমরত্ব ছাড়া আর যা কিছু বর প্রার্থনা কর আমি তোমাকে সেই বরই প্রদান করছি। মহিষ প্রজাপতি ব্রহ্মার কথা শুনে বলল— হে পিতামহ— তাহলে দেবতা, দানব, মানুষ প্রভৃতি কোন পুরুষ জাতি যেন আমাকে হত্যা না করতে পারে। আর যদি পুরুষেরাই আমাকে হত্যা না করতে পারে তবে অবলা নারীদের কাছে আমার তো কোন ভয় নেই। তারা আমাকে কিভাবে মারবে? ব্রহ্মা বললেন হে দৈত্যরাজ, যেকোন সময়ই হোক স্ত্রীলোকদের হাতেই তোমার মৃত্যু হবে। কোন পুরুষের নিকট তোমার মৃত্যুভয় থাকল না। এই বর দিয়ে ব্রহ্মা নিজ লোকে চলে গেলেন এবং মহিষাসুরও নিজ গৃহে ফিরে আসে।

সেই মহিষাসুর ওই ভাবে রাজত্ব পেয়ে এবং ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়ে সমস্ত জগৎ করায়ত্ত করতে শুরু করে। সে নিজ বাহুবলে স-সাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা হয়ে নির্ভয়ে ও নিষ্কণ্টকে রাজ্য পালন করতে থাকে। সে-সময় তার যে সেনাপতি ছিল তার নাম চিক্ষুর। সে যেমন বলবান, তেমন মহা উদ্ধত। এবং তার ধনাধ্যক্ষের নাম ছিল তাম্র। তারও বহু সৈনিক ছিল। এছাড়া অসিলোমা, বিড়াল, উদগ্র, ত্রিনেত্র, বাষ্কল এবং কালবন্ধ প্রভৃতি বলদর্পী সেনাপতিরা সেসময় নিজেদের সৈনিকদের নিয়ে সাগর পরিবৃত সমৃদ্ধশালী পৃথিবীকে ঘিরে অবস্থান করতে থাকে।

পরাক্রমী ক্ষত্রিয় রাজারা মহিষাসুরের হাতে মারা যায়। আর বাকী বৃদ্ধ রাজারা তারা করদ রাজা হয়ে আত্মরক্ষা করেন। পৃথিবীর ব্রাহ্মণেরা মহিষের বশীভূত হয়ে তাকে যজ্ঞের ভাগ দিতে লাগলেন। পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজত্ব করেও সেই অসুরের তৃপ্তি হল না। সে স্বর্গরাজ্য বিজয়ে অভিলাষী হয়ে ওঠে। তারপর সে একদিন তার এক দূতকে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে বলতে বলে—হে সহস্রলোচন, তুমি স্বর্গ ত্যাগ কর অথবা মহাত্মা মহিষাসুরের সেবা কর। তিনি রাজা, তুমি শরণাগত হলে অবশ্যই তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি মহারাজ মহিষের আশ্রয় গ্রহণ কর। আর যদি তা করতে ইচ্ছা না হয়, তবে সত্বর যুদ্ধের জন্য বজ্র গ্রহণ কর। তুমি আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে বহুবার পরাজিত হয়েছ, সুতরাং তোমার বীরত্ব কতদূর তাতো আমরা ভালই জানি। তাই বলছি হয় তুমি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, না হয় যেখানে খুশি চলে যাও।

মহিষের দূতের মুখে ওই রকম কথা শুনে দেবরাজের ভীষণ রাগ হল। তিনি বলেন, তুই তো অতি ক্ষুদ্র প্রাণ। তোর কি জন্য এত মদগর্ব তাতো জানি না। তবে তোর প্রভুর এই মদগর্বরোগের চিকিৎসা আমি আগে করব, পরে তার মূলোচ্ছেদ করব। আর তুই ত দূত। দূতেরা শিষ্টদের অবধ্য। তাই তোকে আমি ছেড়ে দিলাম। তুই ফিরে যা। গিয়ে

মহিষকে বলবি—যদি যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে তুই শীঘ্র আয়। তোর যে শিং-এর বলে এত দর্প করছিস, আমি তোর সেই শিং-দুটি কেটে তোর সমস্ত বলবীর্য নষ্ট করব—ইত্যাদি।

মহিষের দূত দেবরাজের নিকট থেকে ফিরে এসে তাকে তার বক্তব্য জানায়। ইন্দ্রের কথা শুনে মহিষাসুরের ভীষণ রাগ হয়। সে সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যসামন্তদের যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে বলে। সে আরও বলে—আমি ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করেছি. সেজন্য সুরগণের কাছ থেকে আমার কোন ভয় নেই। কারণ কোন পুরুষই আমাকে বধ করতে পারবে না। আর স্ত্রীলোকরা আমার কি করবে? আমি একাই সমস্ত প্রধান প্রধান দেবতাদের পরাজিত করতে পারি। শুধুমাত্র যুদ্ধশোভার জন্যই তোমাদের ডেকে দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করছি। বরের প্রভাবে দেবতাদের জন্য আমার কোন ভয় নেই। আমি আমার শিং ও খুরের আঘাতেই তাদের বিনাশ করব। সুর, অসুর অথবা মানুষ সকলেরই আমি অবধ্য। অতএব দেবলোক জয় করার জন্য তোমরা সকলে প্রস্তুত হও। মহিষের নির্দেশে তার সকল সৈন্যসামন্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে স্বর্গলোক আক্রমণ করল।

এদিকে স্বর্গরাজ্যে দেবরাজ ইন্দ্র মহিষাসুরের দূত চলে গেলে বায়ু, বরুণ, কুবের, যম, প্রভৃতি দেবতাদের ডেকে মহিষাসুরের সব বক্তব্য বলেন। তিনি বলেন, দানবরাজের কথামত যদি আপনারা তার কাছে নতি স্বীকার করতে না চান তাহলে যুদ্ধের জন্য এখনই সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে। আমি এখান থেকে চলে গেলেই দানবপতি মহিষ অবিলম্বে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হবে—দানবের দূত এমন কথা বলে গেছে। সুতরাং কি করা উচিত তা এখন আপনারা চিন্তা করে ঠিক করুন। নিজেরা বলবান হলেও দুর্বল শত্রুকে কখনোই উপেক্ষা করা উচিত নয়। বিশেষতঃ যে শত্রু বলবান, বাহুবলে দর্পিত এবং সবসময়ই উদ্‌যোগী তাকে তো কোন সময়ই উপেক্ষা করতে নেই। আপন আপন বল ও বুদ্ধি অনুযায়ী উদ্যোগ নেওয়াই এখন একান্ত কর্তব্য। তারপর জয় পরাজয় দৈবের অধীন। খল লোকের সঙ্গে সন্ধি করা অর্থহীন। সুতরাং

এই শত্রু সন্ধির যোগ্য নয়। আপনারা সরলস্বভাব। অতএব বার বার বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা করে যা ভাল হয় তাই করুন। এভাবে দেবতারা মহিষাসুরের স্বর্গরাজ্য আক্রমণ বিষয়ে নিজেরা আলাপ-আলোচনা করলেন। দেবগুরু বৃহস্পতির পরামর্শও দেবরাজ শুনলেন।

কিন্তু মহিষাসুর সসৈন্যে স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করায় যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। মহিষের সেনাপতি চিক্ষুরের নেতৃত্বে প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইন্দ্রের কাছে চিক্ষুর পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলে, মহিষাসুর বিড়াল নামক দানবকে পাঠায়। বিড়ালাসুরের সঙ্গে দেবরাজ এবং তাঁর পুত্র জয়ন্তের ভয়ানক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বিড়ালাসুরও মূর্চ্ছিত হয়ে রণস্থল ত্যাগ করে। তখন তাম্রাসুরের নেতৃত্বে অসুরেরা আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকে। প্রবল যুদ্ধ করেও তাম্রাসুর যুদ্ধক্ষেত্রে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। এরপর অসুররাজ মহিষ নিজেই রাগে বিশাল গদা নিয়ে ছুটে আসে দেবতাদের বিনাশ করতে। দানবেরা খুবই মায়াবী, তাই যুদ্ধ ভয়ানক আকার ধারণ করে। সেই ভয়ানক যুদ্ধ দেখে সমস্ত লোক এমনকি মুনিগণও বিস্মিত হয়ে যান। অসুরের মোহকারী মায়া দেখে দেবরাজও বিস্ময়ে ও অতিশয় ভয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। মায়া-মোহিত বরুণ, কুবের, যম, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি দেবতারাও প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যান। তা সত্ত্বেও তাঁরা যুদ্ধ করেন। শত বৎসর যুদ্ধ শেষে দানবদেরই জয় হয়। তারা দেবলোক অধিকার করে। এরপর মহিষ স্বর্গরাজ্যে দেবরাজের সিংহাসনের অধিকার নেয় এবং অন্যান্য অসুরদের অন্যান্য দেবতাদের পদগুলি দান করে। যুদ্ধে শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন ও জর্জরিত দেবতারা স্বর্গরাজ্য ছেড়ে প্রাণের ভয়ে পর্বতের গুহায় দিন কাটাতে থাকেন। তাঁদের দুঃখের আর শেষ নেই। দেবতারা তাঁদের সেই দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট নিজেদের সকল দুঃখ-দুর্দশার কথা ব্যক্ত করে বলেন—

'হে বিধাতা, হে অখিল ভুবনের দুঃখ বিনাশক পদ্মযোনে, আমরা অসুরাজের কাছে পরাজিত হয়ে স্বর্গরাজ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছি। এখন গিরিগুহাই আমাদের আবাস-স্থান হয়েছে। আমরা অতিশয় দুঃখ-সাগরে

পড়েছি। আমাদের এই করুণ অবস্থা দেখেও কেন আপনার দয়া হচ্ছে না। পুত্র শত অপরাধ করলেও লোভহীন পিতা কি তাদের ত্যাগ করেন? অত্যন্ত কষ্ট দেন? আমরা আপনার শ্রীচরণকমলে ভক্তিপরায়ণ, অথচ দানবগণ আমাদের উপর নিপীড়ন করছে। তবু এই দানবদেরই আজ আপনি উপেক্ষা করছেন। দুরাত্মা মহিষ অমরগণের স্বর্গরাজ্য সবরকমভাবে ভোগ করছে। যজ্ঞের হবির ভাগ ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে জোর করে আদায় করে নিচ্ছে। পারিজাত পুষ্প উপভোগ করছে। আর রত্নাকর সারভূতা সেই কামধেনুও তাদেরই অধীন। অসুরদের আশ্চর্যজনক কীর্তির কথা আর কি বলব? দেবেশ, আপনি তাদের সমস্ত চেষ্টাই অবগত আছেন। কারণ আপনি জ্ঞানবলে সবকিছুই জানতে পারেন। অতএব প্রভু, আমরা আপনার পদতলে প্রণত হলাম। সুরগণ যে কোন জায়গায় গেলেও পাপমনস্ক দুষ্কর্মকারী দানবরাজ নানাভাবে তাঁদের কষ্ট দিচ্ছে। দেবেশ, আপনি একমাত্র পরিত্রাতা। অতএব প্রভু, আমাদের কল্যাণ করুন। নতুবা রিপু-দাবানলে পীড়িত আমরা শান্তিকর্তা অনন্ত তেজঃসম্পন্ন, সুরগণের পূজিত, বিশ্ববিধাতা মঙ্গলময় প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ছেড়ে দিয়ে আর কারই বা শরণাপন্ন হব?'

দেবতারা বিষণ্ণ মুখে ওই ভাবে স্তব করে করজোড়ে প্রজাপতিকে প্রণাম জানালেন। লোকপিতামহ সুরগণের ওই দুরবস্থা দেখে তখুনি রিপুর বিনাশ হলে মনে যেরকম অপার সুখের সৃষ্টি হয় এমন মধুর বচনে বলতে লাগলেন—হে দেবগণ কি করি, এই দানব প্রকৃতই বরলাভের গর্বে গর্বিত। এই দানবকে তো কোন পুরুষ বধ করতে পারবে না। একমাত্র স্ত্রীলোকই তাকে বধে সক্ষম। অতএব এ বিষয়ে কি করণীয়? সুরগণ, তাহলে আমরা এখন সকলে মিলে চলুন পর্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে যাই। সেখানে দেবাদিদেব মহাদেবের সঙ্গে সকলে মিলে দেবকার্য সম্বন্ধে বিশেষ পরামর্শ করব। ব্রহ্মা এই কথা বলেই দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে কৈলাসের দিকে যাত্রা করলেন।

ব্রহ্মাসহ দেবতারা শিবলোকে আসছেন। মহাযোগী দেবাদিদেব তা ধ্যানযোগেই জানতে পেরে তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা করার জন্য

বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে এলেন। ব্রহ্মাকে পেয়েই উভয়ে উভয়কে অভিবাদন করে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। দেবতারা সকলেই তাঁদের উভয়কে প্রণাম করলেন। সকলেই নিজ নিজ আসনে বসলে শিবও নিজ আসনে উপবিষ্ট হলেন। প্রভু বৃষধ্বজ ব্রহ্মা এবং দেবতাদের কুশল জিজ্ঞাসা করে কৈলাসে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

ব্রহ্মা বললেন—মহিষাসুরের অত্যাচারে নিপীড়িত হয়ে ইন্দ্রাদি দেবতারা ভয়ে সন্ত্রস্ত তাঁর আত্মরক্ষার জন্য গিরিদুর্গে ভ্রমণ করছেন। মহিষ এবং অসুরেরা যজ্ঞভাগ ভোগ করছে। সুতরাং লোকপালগণ অশেষ কষ্ট পেয়ে আপনার শরণাগত। তাঁদেরকে আজ আমি সেজন্যই সঙ্গে করে আপনার কাছে এনেছি। অতএব হে দেবাদিদেব, যাতে সুরকার্য যুক্তিসঙ্গত উপায়ে সম্পন্ন হয় আপনি তা করুন। হে ভূতভাবন, সকল দেবতাদের ভার আপনার উপরই যে ন্যস্ত।

শঙ্কর প্রজাপতির ওই কথা শুনে বললেন, বিভো, মহিষকে বর দিয়ে আপনি আগেই তো দেবতাদের অনর্থের কাজ করেছেন। এখন আমি আর কি করব? সে এমনই বলবান ও বীর যে সমগ্র দেবমণ্ডলী তার ভয়ে ভীত। অতএব এমন কে রমণী আছে যে সে মদগর্বিত দানবকে বধ করতে সমর্থ হবে? আপনার স্ত্রী বা আমার স্ত্রী যুদ্ধে যেতে পারবে না। সেই মহাভাগাযুগল যদি যুদ্ধে যানও, তবু তারা যুদ্ধ করবেন কিভাবে? মহাভাগা ইন্দ্রাণীও যুদ্ধনিপুণা নন। অন্য কোন্ নারী সেই পাপবুদ্ধি মদগর্বিত দানবকে নিহত করতে সক্ষম হবে? অতএব আমার মত এই যে, আজই বিষ্ণুর কাছে গিয়ে তাঁকে স্তবে তুষ্ট করে দেবকাজে অতি শীঘ্র নিযুক্ত করি। সেই বিষ্ণু অতিশয় বুদ্ধিমানদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। অতএব সকল কাজের উদ্ধারের জন্য তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে কর্তব্য নির্ণয় করা দরকার। তিনি নিজের বুদ্ধি দিয়ে বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করে কার্যোদ্ধার করতে পারেন।

ব্রহ্মা ও দেবতাগণ মহাদেবের ওই রকম প্রস্তাবে সম্মত হয়ে বলেন, তাই হোক। তারপর তাঁরা শিবসহ সকলে গিয়ে বৈকুণ্ঠ অধিপতির কাছে উপস্থিত হলেন।

ভগবান বৈকুণ্ঠপতি প্রজাপতি ও মহেশ্বরসহ দেবতাদের দেখেই তাঁদের আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে দেবতাগণ বিষণ্ণ বদনে দানবরাজ মহিষাসুরের কাছে তাঁদের পরাজয় এবং মহিষাসুরের দৌরাত্ম্যে যা যা ঘটেছে সমস্তই বিষ্ণু ও মহাদেবের কাছে বর্ণনা করলেন। পরন্তু তাঁরা বলেন যে সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, যম, বরুণ ও অন্যান্য দেবতা এবং ব্রহ্মর্ষিগণের অধিকারসমূহও মহিষাসুর নিজেই দখল করে নিয়েছে। এখন সেই দুরাত্মা মহিষাসুর দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করে দেওয়ায় দেবতারা মানুষেরই মত পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এমনকি তাদের ভয়ে দেবতাদের লুকিয়েও থাকতে হচ্ছে। দেবতাদের শত্রু অসুরগণের এরকমই দৌরাত্ম্য এবং তার ফলে দেবতাদের যে কি করুণ দুর্দশা তা সবই আপনাদের নিকট বললাম। সেইসঙ্গে আমরা আপনাদের শরণাপন্নও হলাম। আপনারা উভয়ে মহিষাসুরকে কিভাবে বধ করা যায় সেই উপায় চিন্তা করুন।

ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাদের মুখে মহিষাসুরের অত্যাচার ও দেবতাদের ওই প্রকার করুণ কাহিনী শুনে মধুসূদন ও মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। এবং ভ্রূ-কুঞ্চনে তাঁদের মুখমণ্ডল ভীষণ আকার ধারণ করল। তারপর অতিশয় ক্রোধান্বিত বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের বদন থেকে মহাতেজ নির্গত হল। ইন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য দেবতাদের শরীর থেকেও সুবিপুল তেজোরাশি নির্গত হয়ে একত্র মিলিত হল। পুরাণান্তর প্রসিদ্ধ কাত্যায়ন আশ্রমে দেবগণ সেই সুদীপ্ত তেজঃপুঞ্জকে দশদিক পরিব্যাপ্ত জ্বলন্ত পর্বতের ন্যায় অবস্থিত দেখতে পেলেন। অনন্তর সেখানে সকল দেবতার শরীর থেকে সঞ্জাত সেই অনুপম তেজ—যার জ্যোতির্ময় প্রভারাশি ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত করেছিল তা একত্র মিলিত হয়ে এক নারীমূর্তি ধারণ করতে দেখলেন। শম্ভুর দেহনিঃসৃত তেজে সেই দেবীমূর্তির মুখ, যমের তেজে তাঁর কেশরাশি এবং বিষ্ণুর তেজে তাঁহার বাহুসমূহ উৎপন্ন হল। চন্দ্রের তেজে তাঁর স্তনযুগল, ইন্দ্রের তেজে শরীরের মধ্যভাগ, বরুণের তেজে তাঁর জঙ্ঘা ও উরুদ্বয় এবং পৃথিবীর তেজে তাঁর নিতম্ব উদ্ভূত হল। ব্রহ্মার তেজে তাঁর পদযুগল, সূর্যের

তেজে পদাঙ্গুলি সমূহ, অষ্টবসুর তেজে হাতের আঙ্গুলগুলি এবং কুবেরের তেজে তাঁর নাসিকা উৎপন্ন হল। দক্ষ ও অন্যান্য প্রজাপতিগণের তেজে তাঁর দাঁত এবং অগ্নির তেজে তাঁর তিনটি নয়ন উৎপন্ন হল। প্রাতঃ এবং সায়ং এই উভয় সন্ধ্যাদেবীর তেজে ভ্রূযুগল ও বায়ুর তেজে দুই কর্ণ উৎপন্ন হল। বিশ্বকর্মা ও অন্যান্য দেবতাগণের একত্রীভূত তেজোরাশি থেকে দুর্গাদেবীর আবির্ভাব ঘটল। অনন্তর সকল দেবগণের তেজোরাশি থেকে সম্ভূতা সেই দেবীকে দেখে মহিষাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত অমরগণ আনন্দিত হলেন।

এরপর ত্রিশূলধারী মহাদেব নিজ ত্রিশূল থেকে আরেকটি অনুরূপ ত্রিশূল সৃষ্টি করে এবং সুদর্শন চক্রধারী বিষ্ণু নিজ সুদর্শন চক্র থেকে আরেকটি অনুরূপ চক্র উৎপাদন করে সেই মহাদেবীকে দিলেন। একইভাবে বরুণদেব দেবীকে শঙ্খ, অগ্নিদেব শক্তি অস্ত্র প্রদান করলেন। বায়ু দেবতা অর্থাৎ পবনদেব দেবীকে দিলেন একটি ধনু এবং বাণপূর্ণ দু'টি তূণ দান করলেন। সহস্রলোচন দেবরাজ ইন্দ্র নিজ বজ্র থেকে আরেকটি অনুরূপ বজ্র এবং ঐরাবত নামক স্বর্গগজের গলদেশস্থ ঘণ্টা থেকে অপর আর একটি ঘণ্টা উৎপাদন করে তাঁকে দিলেন। মৃত্যুর দেবতা নিজ কালদণ্ড হতে একটি একই রকম দণ্ড সৃষ্টি করে দেবীকে সমর্পণ করলেন এবং জলদেবতা বরুণদেব নিজ পাশ থেকে একটি পাশ এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁকে একটি রুদ্রাক্ষ মালা ও কমণ্ডলু প্রস্তুত করে তাঁর হাতে তুলে দিলেন। দুর্গা দেবীর সমস্ত লোমকূপে সূর্যদেব নিজের কিরণরাশি এবং নিমেষ প্রভৃতি কালাভিমানী দেবতা একটি প্রদীপ্ত খড়্গ ও উজ্জ্বল ঢাল তাঁর হাতে প্রদান করলেন। ক্ষীরোদ সমুদ্র দেবীকে বিশুদ্ধ হার, চির নূতন বস্ত্রযুগল, দিব্য চূড়ামণি, দুটি কুণ্ডল এবং সকল হাতের বলয়গুলি, শুভ্র ললাট-ভূষণ, সকল বাহুতে কেয়ূর (বাজু), নির্মল নূপুর, অতি উত্তম কণ্ঠভূষণ এবং সকল অঙ্গুলিতে শ্রেষ্ঠ অঙ্গুরী দান করলেন। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা তাঁকে অতি উজ্জ্বল কুঠার, নানাবিধ অস্ত্র এবং কিছুতেই ভেদ করা যাবে না এমন বর্ম প্রদান করলেন। সমুদ্র দেবীর শিরে দিলেন একটি পদ্মের মালা, বক্ষস্থলে দিলেন অনুরূপ

আর একটি মালা এবং তার হাতে দিলেন অতি মনোরম পদ্ম। গিরিরাজ হিমালয় তাঁকে তাঁর বাহনস্বরূপ একটি সিংহ ও নানা রকমের রত্ন এবং কুবের সদা সুরাপূর্ণ একটি পানপাত্র তাঁকে প্রদান করলেন। নাগরাজ বাসুকি—যিনি এই পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন, তিনি সেই দেবীকে মহামণিশোভিত একটি নাগহার অর্পণ করলেন। অন্যান্য দেবগণকর্তৃকও দেবী জগন্মাতা নানান অলঙ্কার ও অস্ত্রের দ্বারা সম্মানিতা হয়ে ভয়ঙ্কর অট্টহাস্যসহকারে বার বার উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করতে লাগলেন। তাঁর অপরিমিত ও অতি মহান ঘোর গর্জনে সমস্ত গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং ভীষণ প্রতিধ্বনি উত্থিত হল। দেবীর সেই সিংহনাদে ঊর্ধ্বে সপ্তলোক যথা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যলোক (বা ব্রহ্মলোক) এবং নিম্নে সপ্তলোক যেমন—অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল এই চৌদ্দভুবন সম্যক্‌রূপে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সেই সাথে লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পিঃ, দধি, দুগ্ধ ও জল এই সপ্ত সমুদ্র কম্পিত হয়ে ওঠে। পরন্তু পৃথিবী ও পর্বত সকল হয় বিচলিত। দেবগণ আনন্দে সিংহবাহিনীদেবীর জয়ধ্বনি করতে লাগলেন এবং মুনিগণ ভক্তিভরে চিত্ত ও দেহ আনত করে দেবীর স্তব করতে লাগলেন।

দেবতাদের দুর্দশা দূর করতে আদ্যাশক্তি মা দশপ্রহরণধারিণী রূপে অবতীর্ণা হওয়ায় দেবতাদের আনন্দ হয়েছে। আনন্দ হয়েছে আমাদেরও। কারণ আমরাও তো অসুরের অত্যাচার থেকে মুক্ত হতে চাই। কিন্তু আমরা চাই মা আবার অবতীর্ণা হোন এ জগতে। তাই আমাদের দুঃখ-ক্লেশ প্রদানকারী অসুর শক্তির নিধনে মাকে এ জগতে আসার প্রার্থনা করি সঙ্ঘ-সঙ্গীতে।

এসো মা দুর্গে দনুজদলনী
দুর্গতি-দুঃখহারিণী।
সিংহবাহিনী, শুম্ভঘাতিনী,
এসো মা মহিষমর্দিনী।
দশপ্রহরণ ধর দশ করে,

তোলো হুঙ্কার নাচ পদভরে।
এসো অম্বিকে অসুর সমরে,
অমরে অভয়দায়িনী।
উমা, ত্রিনয়নী, অতসীবরণী,
ভীমা, ত্রিভঙ্গিণী, করালবদনী।
রমা-গুহ-বাণী-গণেশজননী,
এসো মা বিশ্বপালিনী।
দিকে দিকে শুনি রণহুঙ্কার,
দম্ভ দর্প আসুরিকতার।
তাই তোরে আজি ডাকি বারে বার
আয় গো বিপদবারিণী।

প্রসঙ্গতঃ বলি—দেশে আজও মহিষাসুর বা তার সৈন্য-সামন্ত অসুরদের অভাব নেই। তাদেরই অত্যাচারে শান্তিকামী নিরীহ দেবস্বভাব সম্পন্ন মানুষেরা আজ নানা ভাবেই অত্যাচারিত। তদুপরি আছে নানা প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটা। ওই দুর্যোগঘন পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হিন্দুরা বছরের পর বছর মায়ের আরাধনা করে আসছে। তারা শরৎকালে যেমন দেবী দুর্গার পূজা করে, তেমনি বসন্তকালে পূজা করে দেবীকে বাসন্তী রূপেও। কিন্তু তবু জাতির দুঃখের, দুর্যোগের অবসান হয়নি। কেন? কারণ হিন্দুর মাতৃপূজা ঠিকমত হয়নি। হিন্দু তার অতীতের ঘটনা থেকে মাতৃপূজার শিক্ষাই নেয়নি। তাই হিন্দুর মাতৃপূজা শুধুমাত্র বাহ্যিক আড়ম্বরতার মধ্যেই রয়ে গেছে। পূজায় মা'র আবির্ভাব হয়নি। মা আমাদের পূজাও নেননি। আর সেই কারণেই হিন্দুর দুঃখ-দুর্দশাও ঘোচেনি।

হিন্দুর এই দুঃখের অবসান হবে কিভাবে? পূজায় মায়ের আবির্ভাব ঘটবে কিভাবে? সে প্রসঙ্গে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী বলছেন—

"শতবর্ষ যাবৎ স্বর্গচ্যুত, শ্রীভ্রষ্ট, শক্তিহীন দেবগণ পিতামহ ব্রহ্মার নিকট নিবেদন করিলেন—স্বর্গরাজ্যের পুনরুদ্ধারের উপায় কি? পিতামহ

বলিলেন—মহাশক্তি মহামায়ার আরাধনা কর। দেবগণ জিজ্ঞাসিলেন—মহামায়া কে? তাঁর স্বরূপ কি? কি রূপে তাঁর উৎপত্তি? ব্রহ্মা বলিলেন—"তিনি সর্ব্বস্বরূপা—সর্ব্বভূতে শক্তি বিভূতি রূপ অবস্থা, তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে তেজোবীর্য্য, বুদ্ধি-সঙ্কল্প সেই তো তিনি। তেত্রিশ কোটি দেবতার তেজোবীর্য্য, বুদ্ধি-সঙ্কল্প জাগাও। সমন্বিত ও সম্মিলিত কর। তবেই সেই বিশ্বব্যাপিনী—সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা সমষ্টিশক্তিরূপিণী — মহামায়ার দর্শন পাবে।"

দেবগণ রহস্য বুঝিলেন। তেত্রিশ কোটি দেবতার প্রাণে তখন স্বর্গরাজ্যের পুনরুদ্ধারার্থে সম্মিলিত সঙঘবদ্ধ হওয়ার তীব্র সঙ্কল্প জাগ্রত হইল। সেই সঙ্কল্পের তেজঃ একত্র মিলিত হলে তার মধ্যে আবির্ভূতা হইলেন—অপরূপা মহামায়া শ্রীশ্রীদুর্গা। ফলে দেবদৈত্যের সংগ্রামে — দেবগণ বিজয়ী হইলেন।

তিনি আরও বললেন—'প্রতিমার মধ্যে মহামায়ার লীলার ইঙ্গিত; মহামায়ার রূপ ও লীলার মধ্যে হিন্দুজাতি গঠনের ইঙ্গিত—হিন্দুকে আজ তা' নূতন করিয়া ধ্যান করিতে হইবে। প্রত্যেক জীবের মধ্যে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিসমূহ একত্র সম্মিলিত হইলে, সেই সমষ্টি শক্তিরূপিণী মহামায়ার যথার্থ স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়। তেত্রিশ কোটি দেবতার সঙ্কল্প শক্তি যখন একত্র সম্মিলিত হইয়াছিল, তখনই মহামায়া শ্রীশ্রীদুর্গা স্বরূপে আবির্ভূতা হন। তেত্রিশ কোটি হিন্দুর সঙ্কল্পশক্তি জাতির উপর অনুষ্ঠিত অবিচার-অন্যায়-অত্যাচারের অবসান কামনায় যদি সম্মিলিত হয়, তখনই হিন্দুজাতির মধ্যে আবির্ভূতা হইবেন—অসুরনাশিনী শ্রীদুর্গা।'

দেবীর পূজায় কি চাই? সে প্রসঙ্গে যুগচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী আরও বললেন—

"শুধু পুষ্প-বিল্বপত্রের অর্ঘ্য ও বিবিধ ব্যঞ্জনের নৈবেদ্য সাজিয়ে অনুতাপ-অশ্রুজল-কাকুতি-মিনতিতে মহাশক্তির প্রসন্নতা হয় না। দেবী অসুরনাশিনী, তাই তাঁর পূজায় চাই হিন্দু নরনারীর হৃদয়ে অসুরনাশের

অটুট সঙ্কল্প অন্যায়-অবিচার-অত্যাচারের প্রতিবাদ ও প্রতিকারের প্রবল প্রচেষ্টা। দেবী মহাবীর্য্যরূপিণী, তাই তাঁর পূজায় চাই—আত্মশক্তির উদ্বোধন, বিকাশ, প্রকাশ—আত্মরক্ষার্থ হিন্দু নরনারীকে শক্তি ও কৌশল অর্জনপূর্বক অত্যাচারের প্রতিকারে উদ্যত থাকা। দেবী সমষ্টি-শক্তি স্বরূপিণী; তাই চাই—হিন্দু সমাজের অন্তর্গত সর্বশ্রেণীর নরনারীকে সম্মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করা, সমগ্র হিন্দু জনসমষ্টির মিলন ও সংহতির ফলে যে বিরাট জাতি-প্রতিমা গঠিত হইবে—তাহাতে আবির্ভূতা হইবেন—মহাবীর্য্যময়ী দানবদলনী শ্রীশ্রীদুর্গা। দেবী অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিতা, সংগ্রামরতা, তাই দেবী পূজায় চাই—অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা শেল-শূল-পরশু-পট্টিশ-গদা-চক্র-খড়্‌গ-কুঠার ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রের যুদ্ধক্রীড়ার দ্বারা দেবীর আরতি এবং আত্মরক্ষার্থ প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর ক্ষাত্রবীর্য্যের অনুশীলন।”

আবার আমরা ঋষির মুখে শুনি মায়ের কথা—

দেবতাদের শত্রু সেই অসুরগণ দেবীর অট্ট হাসিতে সমস্ত ত্রিলোকবাসীকে সন্ত্রস্ত দেখে নিজেদের সৈন্যসমূহকে সুসজ্জিত এবং অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে রাখল। তাদের রাজা মহিষাসুর রাগে ‘আরে একি’! এই কথা বলে অসংখ্য অসুরের সঙ্গে সেই শব্দের অভিমুখে ধেয়ে গেল। তারপর যাঁর অঙ্গের দিব্যজ্যোতিতে ত্রিভুবন আলোকিত, যাঁর পদভরে পৃথিবী অবনত, যাঁর ধনুকের টঙ্কারে পাতাল পর্যন্ত সপ্ত নিম্নলোক আকুল হয়ে উঠেছে, যিনি হাজার হাজার হাত দশদিকে পরিব্যাপ্ত করে অবস্থান করছেন এবং যিনি গগন স্পর্শকারী বিশল মুকুট পরিহিতা সেই দুর্গাদেবীকে মহিষাসুর দেখতে পেল। দেখতে পাওয়ার পরই শুরু হল দেবীর সঙ্গে অসুরগণের যুদ্ধ। নানারকম নিক্ষেপিত অস্ত্রশস্ত্রের দীপ্তিতে দশদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মহিষাসুরের সেনাপতি চিক্ষুর এবং চামর নামক মহাসুর রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতিক এই চতুরঙ্গ সৈন্য এবং অন্যান্য মহাসুরের মহাযোগে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। যাট হাজার রথ সহ উদগ্র নামক মহাসুর এবং এককোটি

রথ সহ মহাহনু যুদ্ধ করতে থাকল। অসিলোমা মহাসুর পঞ্চাশ নিযুত অর্থাৎ পাঁচ কোটি এবং বাস্কল নামক মহাসুর ছয়শ' অযুত অর্থাৎ ষাট লক্ষ রথসহ রণক্ষেত্রে যুদ্ধ আরম্ভ করল। পরিবারিত নামে মহাসুর হাজার হাতী ও অশ্বসমূহ এবং এক কোটি রথে পরিবেষ্টিত হয়ে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে লাগল। সেইসঙ্গে বিড়ালাক্ষ নামক মহাসুর পাঁচশ রথে পরিবেষ্টিত হয়ে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে থাকে। সেখানে অন্যান্য মহা অসুরগণও অযুত অযুত রথ, হস্তী ও অশ্বসমূহে পরিবেষ্টিত হয়ে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। মহিষাসুর সেই যুদ্ধে কোটি কোটি হাজার রথ, হস্তী ও অশ্বে পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করছিল। অন্যান্য অসুরেরা শাবল, ভিন্দিপাল, শক্তি, মুগল, খড়্গ, কুঠার এবং পট্টিশ প্রভৃতি নানারকম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দেবীর সঙ্গ যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে লাগল। আবার কেউ কেউ শক্তি এবং অন্য কেউ কেউ পাশ নিক্ষেপ করল। অন্যান্য অসুরেরা দেবীকে খড়্গের আঘাতে বধ করতে উদ্যত হল।

তখন সেই চণ্ডিকাদেবীও নিজ অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করে অসুরগণের নিক্ষেপিত ওই সকল অস্ত্রশস্ত্র অনায়াসেই ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেললেন। দেবতা ও ঋষিগণ তাঁর স্তব করতে থাকলে সর্বশক্তিময়ী দেবী ভগবতী অম্লান বদনে অসুরগণের শরীরে অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণ করতে লাগলেন। দেবীর বাহন সিংহও বিপুল পরাক্রমী। সে রাগে কেশর দুলিয়ে বনের মাঝে দাবাগ্নির মত অসুর সৈন্যগণের মধ্যে বিচরণ করতে লাগল। যুদ্ধক্ষেত্রে দেবী অম্বিকা যুদ্ধ করতে করতে যে-সমস্ত নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সেই নিঃশ্বাস থেকে তৎক্ষণাৎ লক্ষ লক্ষ দেবী-সৈন্যের সৃষ্টি হল। সেই দেবী সৈন্যগণ দেবীর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে পরশু, ভিন্দিপাল, অসি ও পট্টিশ দিয়ে অসুরগণকে সংহার করতে করতে যুদ্ধ করতে লাগল। সে বিরাট যুদ্ধ যেন বিরাট যুদ্ধ-উৎসব। সেই যুদ্ধ-উৎসবে দেবী সৈন্যদের মধ্যে কেউ কেউ ঢাক, কেউ কেউ শঙ্খ এবং অন্যান্য কেউ কেউ মৃদঙ্গ বাজাতে লাগল। অনন্তর দেবী দুর্গা ত্রিশূল, গদা ও খড়্গের আঘাতে এবং শক্তি অস্ত্র-বর্ষণ করে শত শত মহাসুরদের নিহত করলেন। দেবী

দুর্গা অপর কতকগুলি অসুরকে ঘন্টার শব্দেই বিমোহিত করে ভূতলে পাতিত করলেন এবং অন্যান্য কতকগুলি অসুরকে পাশ দিয়ে বেঁধে তাদের টানতে লাগলেন। কেউ কেউ সুতীক্ষ্ণ খড়্গের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। এবং অপর কেউ কেউ গদার আঘাতে বিমর্দিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ও প্রাণ ত্যাগ করে। কেউ কেউ মুষলে ভীষণভাবে আহত হয়ে রক্তবমি করতে থাকল। আবার কারও কারও দেবীর শূলাঘাতে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ায় তারা ভূতলশায়ী হয়ে পড়ল। সৈন্যদলের মধ্যে যে সকল সৈন্য মায়ের দিকে অনেক বেশি এগিয়ে এসেছিল তাদের সারা শরীর (সজারুর) মত বাণবিদ্ধ ও জর্জরিত হওয়ায় তারা প্রাণত্যাগ করে। কারও কারও বা হাতের বাহুগুলি ছিন্ন হল। আরও অনেকের ঘাড় ভেঙ্গে গেল। অন্য কতকগুলির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল এবং কারও কারও আবার দেহের মাঝখানটি বিদীর্ণ হয়ে গেল। আবার অন্যান্য মহাসুরদের দেবী জঙ্ঘা ছিন্ন করে দিলেন। অন্য কেউ কেউ দ্বিখণ্ডিত হয়ে এক বাহু, এক চক্ষু বা এক পদ বিশিষ্ট হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। কোন কোন অসুরের মাথা ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেও সে পুনরায় দাঁড়িয়ে আবার উত্তম অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকে। এবং ছিন্নমস্তক কোন কোন অসুর সেই যুদ্ধক্ষেত্রে বাদ্যের তালে তালে নাচ করতে লাগল। ছিন্নশির কবন্ধগণ খড়্গ, শক্তি, ঋষ্টি (দুদিকেই ধার আছে এমন হাতিয়ার) হাতে এবং অন্যান্য মহাসুর দুর্গাদেবীকে দাঁড়াও দাঁড়াও বলতে বলতে যুদ্ধে এগিয়ে যেতে লাগল। যেখানে সেই মহাযুদ্ধ হচ্ছিল, সেখানে মাটিতে পড়ে থাকা হাতী, ঘোড়া, রথ ও মৃত অসুরদের স্তূপে পৃথিবীর সেই ক্ষেত্র যাতায়াতের পক্ষে অযোগ্য হয়ে উঠল। যুদ্ধক্ষেত্রে অসুর সৈন্যগণের মধ্যে হাতী, ঘোড়া ও অসুরগণের শরীর থেকে ক্ষরিত রক্তধারা সকল বিরাট নদীর স্রোতের মত প্রবাহিত হতে থাকল। আগুন যেরকম ঘাস ও কাঠের বিরাট গাদাকে নিমেষের মধ্যেই পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে। সেরকম দেবী অম্বিকাও মুহূর্তের মধ্যে সেই বিশাল অসুর সৈন্যকে বিনষ্ট করে ফেললেন। দেবীর বাহন সিংহও ভীষণ গর্জন করতে করতে

কেশর দুলিয়ে যেন অসুরদের দেহ থেকে প্রাণগুলিকে টেনে টেনে বের করে আনতে লাগল। সেই যুদ্ধস্থলে দেবীর সৃষ্ট সেই সৈন্যগণও অসুরদের সঙ্গে এমনই ঘোরতর যুদ্ধ করেছিল যে স্বর্গের দেবতারা তাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

শক্তিমায়ের সৃষ্ট সৈন্যদের মতো হিন্দুরাও যেন শক্তিমান হতে পারে, অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে। তাই সঙ্ঘকবি গাইলেন—

শক্তি মায়ের ভক্ত ছেলে আমরা হিন্দু রক্ষিদল,
মর্ম্ম-ছানা রক্ত ঢেলে পূজব মায়ের চরণতল।।
সতী নারীর লাঞ্ছনা—
আঘাত পেয়ে নীরব হয়ে সইবো না আর সইবো না।
শক্তি মায়ের ভক্ত তনয় আমরা করি দ্বিগ্বিজয়।
বিঘ্নবাধা তুচ্ছ গণি চিত্তে মোদের নেইকো ভয়।
শুধুই জবা বিল্বদল!
মায়ের প্রীতি নাইকো তাহে, চায় জননী বীর্য্যবল।
মোদের জননী অসুর দলনী চায় রে অস্ত্র ঝঞ্ঝনী।
মহাশক্তি চামুণ্ডা মা মহিষাসুরমর্দ্দিনী।
সেবাই মোদের জীবন-ব্রত, স্বার্থ বলি আকিঞ্চন।
নরসেবার মধ্য দিয়ে পেয়েছি সেই নারায়ণ।
ডাক্ দিয়েছি সকল ভাইয়ে হিন্দু মিলন মন্দিরে
'সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌ যুগে' সত্যবাণী নয় কি রে?
শক্তিপূজার নববিধান ঘোষিব আজ মিথ্যা নয়,
সকল শক্তি সাধনাতে হব মোরা শক্তিময়।

# মা মহিষাসুরমর্দিনীকে প্রণাম

মেধস্ ঋষি রাজা সুরথকে দেবীর সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধ প্রসঙ্গে বলে চলেছেন—

তখন অসুর সেনাপতি চিক্ষুর নিজ দলের সৈন্যদের দেবী কর্তৃক নিহত হতে দেখে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে ওঠে। সে অত্যন্ত রোষভরে দেবী অম্বিকার সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তাঁর দিকে ছুটে যায়। মেঘ যেরকম জলবর্ষণ করে সুমেরু পর্বতের শিখরদেশ আচ্ছন্ন করে, সেরকম সেই অসুর যুদ্ধক্ষেত্রে বাণবৃষ্টি করে দেবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। দেবী অম্বিকাও সঙ্গে সঙ্গে চিক্ষুরের বাণগুলিকে নিজ বাণের দ্বারা ছিন্নভিন্ন করে তার রথের ঘোড়াগুলি ও তাদের চালকগণকে বাণবিদ্ধ করে নিহত করলেন। এবং সেই সঙ্গে দেবী চিক্ষুরের ধনুক, অতি উঁচু রথের ধ্বজা কেটে দিয়ে ছিন্নধনু চিক্ষুরের সর্বাঙ্গ বাণবিদ্ধ করলেন। অসুর সেনাপতি চিক্ষুর ধনু, রথ, অশ্ব ও সারথিবিহীন হয়ে খড়্গ ও ঢাল নিয়েই দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে ছুটে যায়। অতি বেগবান অসুর তার তীক্ষ্ণধার খড়্গ দিয়ে দেবীর বাহন সিংহের মাথায় আঘাত করলে সিংহ আহত হয় এবং সেই সঙ্গে সে দেবীরও বাম হাতে আঘাত করে।

হে রাজকুমার সুরথ, চিক্ষুর খড়্গ দিয়ে দেবীর বাহুতে আঘাত করতে গেলে তার খড়্গটিই ভেঙ্গে যায়। চিক্ষুরের চোখ-মুখ তখন রাগে লাল হয়ে ওঠে। সে শূল হাতে নেয়। তারপর সেই মহাসুর আকাশে অবস্থিত সূর্যবিম্বের ন্যায় উজ্জ্বল সেই শূলটি ভদ্রকালীর দিকেই ছুঁড়ে মারে। দেবী সেই শূলকে তাঁর দিকে ছুটে আসতে দেখেই নিজ শূল নিক্ষেপ করলেন। দেবীর শূলের আঘাতে ওই শূল তো শত খণ্ডে খণ্ডিত হইল, পরন্তু অসুরের দেহও শত খণ্ডে খণ্ডিত হয়ে গেল।

মহিষাসুরের সেনাপতি মহাবীর চিক্ষুর যুদ্ধে মারা গেলে দেবশত্রু চামরাসুর হাতীর পিঠে চেপে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসে। সেই অসুরও দেবীর প্রতি শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করে। দেবী তৎক্ষণাৎ

হুঙ্কার নাদে তার সেই শক্তি অস্ত্রকে প্রতিহত ও নিষ্প্রভ করে ও ভূপাতিত করে দিলেন। নিজের শক্তি অস্ত্রকে ভগ্ন ও ভূপতিত হতে দেখে চামরা -সুর অতি রাগের বশে শূল নিক্ষেপ করল। দেবী বাণ দ্বারা তাও ছিন্নভিন্ন করে ফেললেন। এদিকে দেবীর বাহন সিংহ লাফ দিয়ে হাতীর মাথার উপর উঠে তার দুই কুম্ভের মাঝে বসে দেবশত্রু চামরের সঙ্গে বাহু যুদ্ধ করতে লাগল। যুদ্ধ করতে করতে সিংহ ও চামর উভয়েই মাটিতে নেমে অত্যন্ত রাগান্বিতভাবে উভয়ে উভয়কে মারামারি করে যুদ্ধ করতে থাকে। যুদ্ধ করতে করতে একসময় সিংহ লাফ দিয়ে আকাশে উঠে ও আবার সঙ্গে সঙ্গে সবেগে মাটিতে পড়ে চামরের মাথাটিকে চপেটাঘাতে দেহ থেকে ছিন্ন করে ফেলে। দেবী যুদ্ধে পাথর ও গাছের আঘাতে উদগ্রাসুরকে বধ করলেন এবং তার দাঁত , মুষ্টি ও চপেটাঘাতে করালাসুর ধরাশায়ী হল। দেবী কুপিতা হয়ে গদাঘাতে উদ্ধতাসুরকে চূর্ণবিচূর্ণ করলেন। তাঁর অস্ত্র ভিন্দিপাল দিয়ে বাস্কলাসুর, বাণের দ্বারা তাম্রাসুর এবং অন্ধকাসুরকে বধ করলেন। ত্রিনয়নী জগদীশ্বরী তাঁর ত্রিশূলঘাতে উগ্রাস্য, উগ্রবীর্য ও মহাহনু নামক তিন মহাসুরকেও বিনাশ করলেন। দেবী তাঁর তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে বিড়ালাসুরের মাথাটি কেটে দেহ থেকে আলাদা করলেন এবং দুর্ধর ও দুর্মুখ নামে দুই অসুরকে বাণের আঘাতে যমালয়ে পাঠালেন। এভাবে নিজের সৈন্যগুলিকে ক্ষয় পেতে দেখে মহিষাসুর আর স্থির থাকতে পারল না। সে মহিষের রূপ ধরে সেই দেবীসৈন্যগণকে সন্ত্রস্ত করে তুলতে লাগল। মহিষাসুর দেবীর সৈন্যদের কতকগুলিকে মুখের আঘাতে , কতকগুলিকে খুরের আঘাতে, কাউকে কাউকে বা লেজ দ্বারা তাড়া করে শিং দিয়ে বিদীর্ণ করতে লাগল। অন্য কতকগুলিকে দ্রুতগতিতে তাড়া করে, কতকগুলিকে গর্জন করে এবং চারদিকে ঘুরে ও অবশিষ্টদের নিঃশ্বাস বায়ুর দ্বারাই ভূতলে শয্যা নিতে বাধ্য করল। মহিষাসুর দেবীর প্রমথ (শিবের অনুচর) সৈন্যগুলিকে বধ করে তাঁর বাহন সিংহকে বিনাশ করতে ধেয়ে যায়।

তা দেখে অম্বিকা দেবী ভীষণ রাগান্বিতা হয়ে উঠেন। মহাবল অসুরও রাগে খুরের দ্বারা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করে নিজ দুই শিং দিয়ে উঁচু উঁচু পাহাড়গুলিকে দেবীর দিকে ছুঁড়ে মেরে গর্জন করতে লাগল। মহিষাসুর এমন জোরে ছুটতে থাকে যে ধরিত্রীদেবী তার পায়ের ভারে বিশীর্ণা হয়ে যায় এবং অসুরের ল্যাজের আঘাতে আহত হয়ে সকল সমুদ্র স্থলভূমি প্লাবিত করতে থাকে। মহিষের শিং-এর ঝাঁকুনিতে আকাশের মেঘগুলি বিদীর্ণ হয়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। এবং শত শত পর্বত তার নিঃশ্বাস বায়ুর শক্তিতে আকাশের দিকে উঠে আবার মাটিতে পড়ে যেতে থাকে। মহিষাসুরকে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে নিজের দিকে আসতে দেখে দেবী চণ্ডিকা তার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হয়ে উঠলেন ও তাকে বধে উদ্যতা হলেন। দেবী তখন সেই মহিষের উপর পাশ নিক্ষেপ করে তাকে বেঁধে ফেললেন। মহিষাসুরও মহাযুদ্ধে দেবীর কাছে পাশবদ্ধ হয়ে মহিষের রূপ পরিত্যাগ করে তৎক্ষণাৎ সিংহের রূপ ধারণ করে। দেবী অম্বিকা তাকে সিংহের রূপ ধারণ করতে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথাটি কেটে ফেলেন। মহিষও আর কালবিলম্ব না করে সিংহের রূপ ত্যাগ করে এবং খড়্গধারী পুরুষের রূপ ধারণ করে। যুদ্ধে তৎপর দেবী চণ্ডিকা শীঘ্রই বাণ দ্বারা খড়্গ ও ঢালসহ সেই পুরুষকে ছিন্ন ভিন্ন করলেন। তখন সেই মহিষাসুর এক বিরাট হাতীর রূপ ধারণ করে। বিরাট হাতীরূপী অসুর তার শুঁড় দিয়ে দেবীর বাহন মহাসিংহকে ধরে টান দিতে দিতে গর্জন করতে থাকে। আর দেবীও সেই সময়ই সেই হাতীর শুঁড়টি খড়্গ দিয়ে কেটে ফেলেন। তখন মহাসুর পুনরায় মহিষের শরীর ধারণ করে আগের মতই জল ও স্থলের সঙ্গে ত্রিভুবনকে বিক্ষুব্ধ করে তুলে যুদ্ধে তৎপর হয়। জগন্মাতা দেবী চণ্ডিকা কুপিতা হয়ে দিব্য সুরা (মধু) বার বার পান করতে লাগলেন এবং সুরা (মধু) পানের জন্য দেবী আরক্ত নয়না হয়ে অট্টহাসি হাসতে লাগলেন। সেই মহিষাসুরও বল ও বীর্যগর্বে উদ্ধত হয়ে গর্জন করতে থাকল। এবং নিজের দুই শিং-

এর দ্বারা দেবী চণ্ডিকার দিকে পর্বতগুলি ছুঁড়ে মারতে লাগল। চণ্ডিকাদেবীও মহিষাসুরের নিক্ষেপিত ওই পাহাড়গুলিকে বাণ দ্বারা চুরমার করতে করতে সুরা (মধু) পান করতে লাগলেন। এবং তার ফলে দেবীর চক্ষু হয়ে ওঠে রক্তবর্ণ। তিনি বিজড়িত স্বরে মহাসুরকে বলতে লাগলেন ওরে মূঢ়, যতক্ষণ আমি মধু পান করি, ততক্ষণ তুই গর্জন কর। আমি তোকে বধ করলে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ এখানেই এখুনি আনন্দধ্বনি করবেন।

মেধস্ ঋষি বললেন—চণ্ডিকা দেবী এই কথা বলে এক লাফ দিয়ে সেই মহিষাসুরের পীঠের উপর চেপে তার গলাটি পায়ের দ্বারা শক্ত করে চেপে তার বুকের উপর শূলের আঘাত করলেন। সেসময় মহিষাসুরও চণ্ডিকার পায়ের দ্বারা দারুণভাবে নিপীড়িত হয়ে নিজের মুখ দিয়ে অন্য মহাসুর রূপে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। তার অর্ধেক শরীর বাইরে বেরিয়ে আসতেই সে দেবীর উগ্রতেজে স্তম্ভিত হয়ে যায়। শরীর থেকে অর্ধেক বের হয়ে মহিষাসুর দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে দেবী কর্তৃক মহা খড়্গের আঘাতে ছিন্ন মস্তক হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মহিষাসুরকে নিহত হতে দেখে সকল অসুর সৈন্য হায় হায় করতে করতে ভয়ে পালিয়ে যায়। এবং সমস্ত দেবতাগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠলেন। শত্রু জয়ে আনন্দিত ইন্দ্রাদি দেবতারা স্বর্গে অবস্থিত মহর্ষিগণের সঙ্গে সেই দেবী চণ্ডিকাকে স্তব করতে লাগলেন। গন্ধর্বপতিগণ গান এবং অপ্সরাগণেরা অসুর বধের আনন্দে নৃত্য করতে থাকলেন। অসুর বধে শুধু দেবতা কেন, সবারই অন্তরে আনন্দ। তাই আমরাও কবি নজরুলের সঙ্গে গেয়ে বলি—

"মহামাতা ঐ সিংহবাহিনী জানায় আজিকে বিশ্ববাসীকে—
শাশ্বত নহে দানব-শক্তি, পায়ে পিশে যায় শির পশুর।"

# দেবি, তোমারে প্রণাম করি

## (দেবতাদের দেবীস্তুতি)

মেধস্ ঋষি রাজা সুরথকে বলছেন—অতিশয় বলবান, দুরাত্মা সেই মহিষাসুর এবং অন্যান্য অসুর সৈন্যদের দেবী আদ্যাশক্তি নিহত করলে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের আর আনন্দের শেষ নেই। সীমা নেই তাঁদের দেবীর প্রতি কৃতজ্ঞতার। তাঁরা তাদের গ্রীবা ও স্কন্ধ আনত করে প্রণাম পূর্বক আনন্দ-পুলকিত চিত্তে রমণীয় দেহে বিবিধ বাক্য দ্বারা হেমবর্ণা, কটাক্ষে শত্রুকুল ত্রাসিনী, কপালে চন্দ্রকলা শোভিতা, হস্তে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ ও ত্রিশূল প্রভৃতি আয়ুধধারিণী, ত্রিনয়না, সিংহোপরি সংস্থিতা, নিজ তেজে সমগ্র জগৎপূর্ণকারিণী, দেবগণ পরিবৃতা, সিদ্ধ সঙ্ঘ সেবিতা জয়াখ্যা দুর্গা দেবীর স্তব করতে লাগলেন। দেবতারা এভাবেই স্তব করে বলতে লাগলেন—

যে দেবী আপন শক্তির প্রভাবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্তা হয়ে আছেন, যিনি সমস্ত দেবতাগণের শক্তিপুঞ্জের ঘনীভূতা মূর্তিস্বরূপা, যিনি দেবতা ও মহর্ষিগণের আরাধ্যা, সেই জগতের মাতা অম্বিকা দেবীকে আমরা ভক্তিপূর্বক প্রণাম করছি। তিনি আমাদের সকল রকম মঙ্গল বিধান করুন। বেদে ভগবান বিষ্ণুকে বলা হয়েছে সহস্রবদন। সেই সহস্রবদন বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব যাঁর অতুলনীয় প্রভাব ও শক্তি বর্ণনা করতে সমর্থ নন, সেই দেবী চণ্ডিকা সমগ্র বিশ্ব প্রতিপালনের জন্য এবং আমাদের অমঙ্গলজনক ভয় বিনাশের জন্য ইচ্ছা করুন। যিনি স্বয়ং পুণ্যবান ব্যক্তিদের গৃহে লক্ষ্মী স্বরূপা এবং পাপাচারী লোকেদের গৃহে অলক্ষ্মী স্বরূপা, যিনি শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে সদ্‌বুদ্ধি স্বরূপা ও সজ্জনগণের লজ্জারূপা, সেই তোমাকে আমরা ভক্তিভরে প্রণাম করি। হে দেবি, তুমি সমগ্র জগৎ প্রতিপালন কর। হে দেবি, 'দেবতা, দৈত্য, প্রমথ ও ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে আপনার এই অনিবার্য ও অচিন্তনীয় স্বরূপ তোমার অসুর নাশকারী অসীম মহাবীর্য, সংগ্রামে তোমার এই

অতি অদ্ভুত আচরণসমূহ আমরা কি প্রকারে বর্ণনা করব? তুমি সম্যক্ জগতের মূল কারণ। তুমি সত্ত্ব প্রভৃতি ত্রিগুণময়ী হলেও রাগ ও দ্বেষ যুক্ত ব্যক্তিগণ তোমাকে জানতে পারে না। এমন-কি তুমি বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি দেবতাদের অজ্ঞাত। তুমিই সকলের আশ্রয়স্বরূপা। ব্রহ্মা থেকে কীট পর্যন্ত এই অখিল বিশ্ব তোমার একাংশ মাত্র। কারণ তুমিই তো সকলের আশ্রয় স্বরূপা। তুমিই বিকার রহিতা পরমা আদ্যা প্রকৃতি। হে দেবি, যে মন্ত্রের সম্যক্ উচ্চারণে সকল দেবতাবৃন্দ তৃপ্তিলাভ করেন, সেই স্বাহামন্ত্র তুমিই এবং পিতৃগণের তৃপ্তির কারণ স্বধামন্ত্রও তো তুমিই। এজন্যই দেবযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী সকল ব্যক্তিগণ তোমাকে স্বাহা ও স্বধা মন্ত্ররূপে উচ্চারণ করে থাকেন। হে দেবি, যে পরাবিদ্যা মুক্তির কারণ, যোগশাস্ত্রে বর্ণিত দুঃসাধ্য যম, নিয়ম প্রভৃতি মহাব্রত যার সাধন—তুমিই সেই ভগবতী পরমা ব্রহ্মবিদ্যা। সেজন্য যাঁরা জিতেন্দ্রিয়, তত্ত্বনিষ্ঠ, সমস্ত দোষবর্জিত, শুদ্ধচিত্ত ও মুমুক্ষু সেই মুনিগণ তোমার সাধনা করে থাকেন। হে দেবি, তুমি শব্দ ব্রহ্মস্বরূপিণী, তুমি বিশুদ্ধ ঋক ও যজুঃ মন্ত্রসমূহের এবং উদাত্তাদি স্বর ও মধুর পদোচ্চারণ বিশিষ্ট সামমন্ত্র সমূহেরও আশ্রয়। তুমি বেদত্রয় রূপিণী ও সর্বৈশ্বর্যময়ী দেবী ভগবতী। তুমি জগৎ সংসার পালনের জন্য কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি বৃত্তি স্বরূপা এবং সারা জগতের পরম দুঃখ বিনাশকারিণী। হে দেবি যাঁর কৃপায় সর্বশাস্ত্রের মর্ম অবগত হওয়া যায়—তুমি সেই মেধারূপিণী সরস্বতী। দুস্তর সংসার সমুদ্রের অদ্বিতীয়া তরণী স্বরূপা দুর্গাও তুমি। তুমিই নারায়ণের হৃদয়বিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী এবং তুমি মহাদেবের হৃদয়বিহারিণী দেবী গৌরী। হে দেবি তোমার ঈষৎ হাস্যময়, নির্মল, পূর্ণচন্দ্রের মত এবং উত্তম স্বর্ণপ্রভাতুল্য বদনমণ্ডল দেখেও মহিষাসুর ক্রোধভরে তোমাকে হঠাৎ প্রহার করল—এ ঘটনা অত্যন্ত আনন্দের। হে দেবি, তোমার কুপিত, ভ্রূকুটি ভীষণ নব উদিত পূর্ণচন্দ্রের তুল্য প্রভা সমন্বিত বদনমণ্ডল দেখেও যে মহিষাসুর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ ত্যাগ

করেনি এ বড়ই আশ্চর্যের বিষয়! কারণ কুপিত যমকে দেখে কেউ কি বাঁচতে পারে? হে দেবি তুমি প্রসন্না হও। কারণ তুমিই জগতের কল্যাণকারিণী। তুমি প্রসন্না হলেই জগতের কল্যাণ হয়। আর তুমি যদি তার বিপরীত হও অর্থাৎ ক্রুদ্ধা হও, তবে পাপাত্মাদের বংশসমুহ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়ে থাকে। তার প্রমাণ সদ্যসদ্যই দেখলাম মহিষাসুরের বিশাল সৈন্যরাশি তোমার জন্যই বিনষ্ট হয়েছে।

দেবী যখন তাঁর অহৈতুকী করুণা কারও প্রতি বর্ষণ করেন তখন—মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ । মূক বা বোবা লোক হয়ে যায় অত্যন্ত বাক্‌পটু বা বাচাল এবং পঙ্গু লোক—যার কিনা হাঁটা চলারও সাধ্য নেই সেই লোকও হিমালয় লঙ্ঘন করে। তাই দেবীকে দেবতারা প্রার্থনা করে বলছেন— হে দেবি তুমি তো সকল সময় আমাদের মনের সকল ইচ্ছাই পূর্ণ কর। তুমি যাদের প্রতি প্রসন্না হও, তারা সব ক্ষেত্রেই সম্মানিত হয়। তাদের ধন সম্পদ ও যশোরাশি বেড়ে যায় এবং তাদের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুবর্গ কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। তারাই স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য প্রভৃতি নিয়ে নিরাপদে থাকে এবং তারাই ধন্য। দেবীর প্রসাদে পুণ্যবান লোকেরা স্বর্গলাভ করেন, কারণ তিনিই তো একমাত্র ফলদায়িনী। সেজন্য দেবতারা মাকে তাঁদের স্তুতিতে বলছেন—হে দেবি, তোমার প্রসাদে পুণ্যবান ব্যক্তি সবসময়ই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ধর্ম অনুযায়ী প্রতিদিন সকল কর্ম অনুষ্ঠান করেন, তারই ফলে তারা স্বর্গলাভ ও ক্রমে ক্রমে মুক্তিলাভ করেন। অতএব হে দেবি, ত্রিভুবনে তুমিই একমাত্র ফলদায়িনী। দেবতাদের এমন স্তুতির কথা শুনেই হয়তো সাধক কমলাকান্ত মাকে বিপদসাগর থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা জানিয়ে বলছেন—

ও নিস্তারকারিণি! তারা গো।<br>
ত্রাহি মাং ভয়ে, ভয়হারিণি!<br>
ওমা পড়েছি পাথারে, না জানি সাঁতার, জননি!

দুকূল হয়েছি হারা গো। ওমা বাঁধি নিজ পাশে,
ভ্রমাইলে দাসে, মায়ের কি এমন ধারা গো।।
ওমা! সুখের ভাজন ধন পরিজন, ঐহিক বান্ধব যারা গো।
কমলাকান্তের যে দুঃখ অন্তরে, মা বিনে জানিবে কারা গো।

বিপদে-সম্পদে, অসময়ে-সময়ে সব সময় মায়েই আমাদের রক্ষা করেন। তিনিই আমাদের একান্ত আপন। তাই দেবতারা মাকে বলছেন— দেবি, সঙ্কটকালে তোমাকে স্মরণ করলে তুমি সকলের ভয় দূর করে থাক। সুসময়ে বিবেকিগণ তোমাকে চিন্তা করলে তুমি তাদের সুবুদ্ধি প্রদান কর। হে দারিদ্র-দুঃখ-ভয় নাশকারিণি দেবি, তোমা ভিন্ন আর কে সকলের উপকার সাধনা করার জন্য সবসময় দয়ার্দ্রচিত্ত হয়ে আছেন। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে মাতৃসাধক রাম প্রসাদের কথা। তিনি মাকে দেখছেন সকল কিছুই করতে। মা-ই সবকিছু করানও। তাই রামপ্রসাদ তাঁর এক সঙ্গীতে দেবতাদের মতই বলেছেন—

সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ি তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে 'করি আমি'।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দেও মা ইন্দ্রত্বপদ, কারে কর অধোগামী।।
আমি 'যন্ত্র' তুমি 'যন্ত্রী', আমি 'ঘর' তুমি ঘরণী,
আমি 'রথ' তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি।।

পরের শ্লোকে দুষ্ট অসুরদের প্রতিও যে মায়ের কত করুণা সে কথাই দেবতারা বলছেন — হে দেবি, এই অসুরেরা নিহত হলে জগতে শান্তি ফিরে আসবে এবং এরা দীর্ঘকাল নরক ভোগজনক কাজ করলেও মুখোমুখি যুদ্ধে মৃত্যুলাভ করে স্বর্গলোকে যাবে। নিশ্চয়ই এরকম মনে করেই তুমি অনিষ্টকারী অসুরদের বিনাশ করে থাক। দেবি তুমি কি দৃষ্টিপাত দ্বারাই সকল অসুরকে ভস্মীভূত করতে পার না? অবশ্যই পার। কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি যে শত্রুগণের প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ কর, তার

কারণ শত্রুরাও যেন শস্ত্রাঘাতে শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গলোকে যেতে পারে। তাদের প্রতিও তোমার এরকম অতীব উদার মনোভাব রয়েছে। দেবি, তোমার খড়্গ-নিঃসৃত প্রচণ্ড তেজোরাশি এবং শূলের অগ্রভাগ থেকে নির্গত জ্যোতিঃপুঞ্জ দ্বারা যে অসুরদের চক্ষু নষ্ট হয়নি তার কারণ, তারা তোমার জ্যোতির্ময় চন্দ্রকলার মত মুখমণ্ডল দেখছিল। স্তুতি প্রসঙ্গে দেবতারা আরও বলছেন — হে দেবি দুর্বৃত্তদের দুষ্ট প্রবৃত্তি দমন করাই হল তোমার স্বভাব, তোমার সৌন্দর্যের তুলনা পাওয়া যায় না, চিন্তাও করা যায় না। তোমার অসীম বীর্য দেবগণের পরাক্রম হরণকারী অসুরদের বিনাশক। শত্রুগণের প্রতিও এরকম দয়া কেবলমাত্র তুমিই প্রকাশ করে থাক। অন্য আর কার সঙ্গে তোমার এই পরাক্রমের তুলনা হতে পারে? এমন শত্রুভীতিপ্রদ অথচ অতি মনোহর সৌন্দর্যই-বা আর কার আছে? হে বরদে, হৃদয়ে মুক্তিপ্রদ করুণা এবং যুদ্ধে মৃত্যুপ্রদ নিষ্ঠুরতা একমাত্র তোমাতেই দেখা যায়। তুমি শত্রুনাশ করে এই সারা ত্রিভুবনকে রক্ষা করেছ। ওই শত্রুগণ তোমার দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়ে স্বর্গের অধিকারী হল। উদ্ধত অসুরদের জন্য আমাদের যে ভয় ছিল তাও দূর হল। তাই হে দেবি তোমাকে আমরা বার বার প্রণাম করি।

এরপর দেবীর নিকট দেবতারা নিজেদের সর্বতোভাবে রক্ষার প্রার্থনা জানিয়ে বলছেন —

দেবি, তোমার শূলের দ্বারা আমাদেরকে রক্ষা কর। হে অম্বিকে, তোমার খড়্গ দ্বারাও আমাদের রক্ষা কর। হে চণ্ডিকে, হে ঈশ্বরি, তোমার শূলকে সঞ্চালিত করে আমাদের পূর্বদিকে রক্ষা কর। পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণদিকেও রক্ষা কর। ত্রিভুবনে তোমার যে-সকল সৃষ্টি-স্থিতি কারিণী সৌম্যমূর্তি এবং সংহারকারিণী রুদ্রমূর্তি বিরাজিত তাদের দ্বারা আমাদিগকে ও সমগ্র জগদ্‌বাসীকে রক্ষা কর। তোমার করপল্লবে বিরাজমান খড়্গ, শূল, গদা প্রভৃতি যেসকল অস্ত্র আছে, সে-সকল দ্বারা আমাদের সর্বপ্রকারে রক্ষা কর।

মেধস্ ঋষি সুরথ রাজাকে বললেন — মা জগদ্ধাত্রীকে দেবতারা এভাবে স্তব করে নন্দন-কানন জাত দিব্য পুষ্প, গন্ধ ও অঙ্গরাগ দ্বারা অর্চনা করলেন। সকল দেবতারা ভক্তিভাবে দিব্য ধূপ দিয়ে পূজা করলে দেবী প্রসন্না হয়ে তাঁর শ্রীচরণে প্রণত সকল দেবগণকে বলতে লাগলেন—

হে দেবগণ, আমার কাছে তোমাদের যা কিছু চাওয়ার আছে, তা তোমরা চেয়ে নাও। আমি তোমাদের এই স্তবসমূহে সুপূজিতা হয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। এখন আমি তোমাদের অভীষ্ট বর প্রদান্ করব।

দেবতারা মায়ের কথা শুনে বললেন — দেবি ভগবতি, আপনি আমাদের শত্রু মহিষাসুরকে বধ করেছেন, এতেই আমাদের জন্য সব করা হয়েছে। বাকী আর কিছুই নেই। তবু যদি তুমি কৃপা করে আমাদের বর দিতেই চাও, তবে তোমার শ্রীচরণে আমাদের এই প্রার্থনা — যখনই আমরা তোমাকে বার বার স্মরণ করব, তখনই তুমি আবির্ভূতা হয়ে আমাদের ঘোর বিপদগুলি দূর করে দেবে। হে অমলাননা দেবি, যে মানুষ এই সকল স্তব দ্বারা তোমার স্তুতি করবে, আমাদের প্রতি প্রসন্না হয়ে তুমি সব সময় তাদের জ্ঞান, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য সহ ধন, সম্পদ ও স্ত্রীপুত্রাদি বৃদ্ধি করবে।

মেধস্ ঋষি রাজা সুরথকে বললেন — হে রাজন্, জগৎ এবং নিজেদের কল্যাণের জন্য দেবীকে স্তবাদি দ্বারা প্রসন্না করলে দেবী ভদ্রকালী 'তাই হোক' বলে অন্তর্হিতা হয়ে গেলেন। হে রাজন্, ত্রিভুবনের কল্যাণকারিণী সেই দেবী পুরাকালে দেবতাদের শরীর থেকে যে-ভাবে উৎপন্না হয়েছিলেন, তা তোমাকে বললাম। দেবগণের উপকারকারিণী সেই মহাদেবী শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি দৈত্যগণের বিনাশের জন্য এবং ত্রিলোককে রক্ষা করতে যেভাবে গৌরীদেহে আবির্ভূতা হয়েছিলেন তাও বলছি, শোন।

# প্রপন্নার্তিহারিণী দেবি প্রসন্না হও

মহিষাসুর যেমন মহাশক্তিমান ও বীর অসুর ছিল, তার ভয়ে সকল দেবতারা কাঁপতেন, এমনকি তাঁকে বধ করার জন্য আদ্যাশক্তি মহামায়াকে অবতীর্ণা হতে হয়। এরকম আরও দুই অসুরের কথা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে। এরা শুম্ভ এবং নিশুম্ভ। উভয়ই যেমন মহাবীর, তেমনি শক্তিমান। তারাও মহিষাসুরের মতই স্বর্গরাজ্য অধিকার করে নেয়। বিতাড়িত করে দেয় দেবতাদের নিজ চির সুখের আলয় থেকে। এমনকি ওই দুই অসুরকে বধ করতে আবারও অবতীর্ণা হতে হয় সেই মা মহামায়াকেই। এ কাহিনীই আমরা শুনতে বসেছি ঋষি মেধসের পদতলে। কিন্তু এখানে একটা কথা বোধ হয় জানা ভাল যে, এই শুম্ভ নিশুম্ভ তারা যে এত শক্তিমান তা হল কি করে? কেন তাদের দেবতারা এত ভয় করতেন? কেনই-বা তাদের সংহার করতে সেই সর্বশক্তিময়ী মাকেই আবার অবতীর্ণা হতে হল? — কি সেই রহস্য? তা জানতে হলে আমাদের কিছুক্ষণের জন্য যেতে হবে 'দেবী ভাগবতে'। সেখানে মহর্ষি ব্যাসদেবের চরণমূলে বসে আমরা শুনব তাঁর বচনামৃত — যা তিনি আমাদের শোনার জন্যই বলছেন —

বহুদিন আগের কথা। শুম্ভ এবং নিশুম্ভ নামে দুই দানব ছিল। তারা পাতাল থেকে এই ভূমণ্ডলে আসে। যখন তারা যৌবনে পদার্পণ করেছে, সেসময় তারা যোগবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে মুমুক্ষু জনগণের পবিত্রকারক পুষ্কর তীর্থে অন্নজল সব ত্যাগ করে একাসনে বসে অযুত বছর দুশ্চর তপস্যা করে। তাদের সেই কঠোর তপস্যা দেখে সর্বলোকের পিতামহ জগৎস্রষ্টা ভগবান ব্রহ্মা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর বাহন হংসের পীঠে চড়ে সেই পুষ্কর তীর্থে আসেন বর প্রদান করতে। এসে দুই দানবকে সমাধিস্থ অবস্থায় দেখে বলেন, হে মহাভাগদ্বয়, তোমরা ওঠ। আমি তোমাদের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমাদের তপস্যায় নিষ্ঠা দেখে আমি তোমাদের বর প্রদানের জন্যই এসেছি। এখন তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর। শুম্ভ নিশুম্ভ তখন কঠোর তপস্যার ফলে যথেষ্ট দুর্বল। পরন্তু সমাধিস্থ।

তবুও তারা ব্রহ্মার ওই জাতীয় কথা শুনে উৎসাহিত হয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে দণ্ডবৎ প্রণাম করে। তারপর অত্যন্ত বিনয়সহকারে মধুর ভাষায় গদ্‌গদ্ হয়ে বলতে থাকে — হে দেবদেব, আপনি কৃপাসিন্ধু ও ভক্তগণের অভয়দাতা; অতএব হে বিভো, হে ব্রহ্মন্, যদি আমাদের তপস্যায় আপনি সত্য-সত্যই সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তবে আমাদের উভয়কেই অমরত্ব বর প্রদান করুন। কারণ এই ধরাতলে মৃত্যুর চেয়ে ভয়ের বিষয় আর তো কোন কিছু নেই। আমরাও সেই মরণের ভয়েই ভীত হয়ে আপনার শরণাগত হয়েছি। হে দেবদেবেশ, হে ক্ষমানিধে, আপনি জগতের কর্তা, অতএব আপনি আমাদের পরিত্রাণ করুন। হে বিশ্বাত্মন, আমাদের মৃত্যুভয় দূর করে দিন।

তাদের কথা শুনে ব্রহ্মা বললেন — এই ত্রিলোকের মাঝে কেউ কাউকেই অমরত্ব বর দিতে পারে না। সুতরাং সর্বদা এই বিপরীত বর প্রার্থনা করা তোমাদের উচিত নয়। দেখ সৃষ্টির শুরুতে বিশ্বপতি নিজে এই নিয়ম সংস্থাপন করে দিয়েছেন যে — এই পৃথিবীতে যার জন্ম হবে, তার অবশ্যই মৃত্যু হবে। ফলে সকল প্রাণীকেই আজ হোক, আর আগামী দিনেই হোক একদিন না-একদিন মরতে হবেই। অতএব ওই অমরত্ব বর ছাড়া আর যদি অন্য কোন বর তোমরা প্রার্থনা কর তবে তা অবশ্যই দিচ্ছি।

দানব ভাইয়েরা ব্রহ্মার ওই রকম কথা শুনে অনেকক্ষণ চিন্তা ভাবনা করল। তারপর তাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ব্রহ্মাকে প্রণাম করে বলল, হে কৃপাসিন্ধো তাহলে যাতে আমরা দেবতা ও পশুপাখী প্রভৃতির মধ্যে কোন পুরুষেরই হাতে নিহত না হই এরকম বরদান করুন। আমরা এরকম বরই প্রার্থনা করি। আমাদের সংহার করতে পারে এমন বলবতী রমণী জগতে কে আছে? আমরা সাধারণতঃ ত্রিলোকের মধ্যে কোন স্ত্রীলোককেই ভয় করি না। অতএব হে পঙ্কজোদ্ভব, আমরা যাবতীয় পুরুষের অবধ্য হতে চাই। কারণ আমরা রমণীদের ভয় পাই না। তারা তো স্বভাবত অবলা। ভগবান ব্রহ্মা তাঁদের ওই কথা শুনে প্রসন্ন হলেন। তিনি তাদের আকাঙ্ক্ষিত বরই দান করে নিজ ধামে ফিরে গেলেন।

দুই অসুর আনন্দিত মনে নিজ ঘরে ফিরে গিয়ে ভৃগুমুনিকে পৌরোহিত্যে বরণ করে তাঁর সেবা করতে থাকে।

তারপর ভৃগুমুনি এক অপরূপ সোনার সিংহাসন তৈরী করিয়ে বড়ভাই শুম্ভকে দিলেন। রাজ্যপালনের জন্য শুম্ভ রাজপদে অভিষিক্ত হল। তার অভিষেকের সময় সেকালের বড় বড় বীর দানবেরা শুম্ভের সেবার জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হয়। চণ্ড ও মুণ্ড নামে দুই ভাই তারা যেমন মহাবীর, তেমনি নিজেদের শক্তির গর্বে গর্বিত, তারা হাতী, ঘোড়া, রথী ও পদাতিক সৈন্য নিয়ে শুম্ভের কাছে এসে উপস্থিত হয়। সেরকম আর একজন বীর অসুর ছিল— তার নাম ধূম্রলোচন। সেও শুম্ভাসুর সিংহাসনে আসীন শুনে বিরাট সৈন্যবাহিনী সহ সেখানে এসে তার সঙ্গে যোগ দেয়। অমিত বলবীর্য সম্পন্ন রক্তবীজ নামক অপর আর এক অসুরও দুই অক্ষৌহিণী সেনা পরিবৃত হয়ে শুম্ভের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। ওই অসুর রক্তবীজকে যুদ্ধে জয় করা ছিল খুবই কঠিন। বলা চলে অসম্ভবও। কারণ তার শরীরে অস্ত্রাঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে যে-সব রক্তের ফোঁটা মাটিতে পড়বে, তা থেকে তারই মত চেহারা, তারই মত রূপ ও তারই মত দুষ্ট স্বভাব সম্পন্ন বহু অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত পুরুষের সৃষ্টি হয় এবং তারা সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধ করতে থাকে। সেজন্যই সেই মহাবীর্যশালী রক্তবীজকে যুদ্ধে জয় করা কোনমতেই সম্ভব নয়, পরন্তু সে সর্বভূতেরই অবধ্য।

এরকম অনেক অনেক মহাবীর অসুর শুম্ভ রাজা হয়েছে শুনে এসে তার সেবক হয় ও তার দলে যোগ দেয়। এভাবে শুম্ভ-নিশুম্ভের অসংখ্য সৈন্য হওয়ায় তারা শক্তির গর্বে বাহুবলে পৃথিবীর সব রাজ্যকেই অধিকার করে নেয়। কিছুদিন পর পরম বীর হন্তা নিশুম্ভ, দেবরাজ ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করার বাসনায় চতুরঙ্গ সেনা সাজিয়ে দ্রুত সুরলোকে যেয়ে লোকপালদের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করে। পরে দেবরাজ তার ঊরুতে বজ্র দিয়ে আঘাত করায় সেই দানবরাজের ভাই নিশুম্ভ বজ্রাহত হয়ে মাটিতে পড়ে যায় ও অচেতন হয়। তার ওই অবস্থা দেখে সৈন্যরা ভয়ে যুদ্ধ ছেড়ে যে যেদিকে পারে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়। খবর

পৌঁছে যায় অসুরদের রাজা শুম্ভের কাছেও। সে সব ঘটনা শুনে অবিলম্বে স্বর্গধাম আক্রমণ করে দেবতাদের সঙ্গে ভীষণভাবে যুদ্ধ শুরু করে। ভয়ানক যুদ্ধে শুম্ভের কাছে ইন্দ্র, দিকপালসকল এমনকি অখিল দেবগণ সকলেই পরাজিত হন। তখন শুম্ভ নিজ বাহুবলে কামধেনু ও কল্পপাদপ প্রভৃতির সঙ্গে দেবরাজের অধিকারে যে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ছিল সবই সে অধিকার করে নেয়।

পরন্তু সেই উচ্চাভিলাষী দানবরাজ ক্রমশঃ ত্রিলোক জয় করে যজ্ঞের সকল ভাগও দখল করে নেয়। মহাসুর শুম্ভ নন্দনবন পেয়ে ও সুধা পান করে পরম সুখ অনুভব করতে লাগল। তারপর সে কুবের, চন্দ্র, সূর্য ও যমরাজকে পরাজয় করে তাঁদের সব অধিকার নিজের করায়ত্ত করে ফেলে। এবং তার ভাই নিশুম্ভও নিজ সৈন্যে পরিবেষ্টিত হয়ে অনল অনিল ও কুবেরের রাজ্য শাসন করতে লাগল। অন্যদিকে সেই রাজ্যচ্যুত ও শ্রীভ্রষ্ট দেবতারা নন্দনবন পরিত্যাগ করে দানবদের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পাহাড়-পর্বতের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু তাঁরা স্ব-স্থান থেকে বিতাড়িত হওয়ায় ও দানবদের কাছে পরাজয়ের গ্লানিতে কোথাও গিয়েও সুখী হতে পারলেন না। এভাবে সকল দেবতাদের পরাজিত করে দানবরাজ শুম্ভই সমুদয় রাজ্য শাসন করতে থাকে। সেরকমভাবেই হাজার বছর পার হয়ে যায়। স্বর্গচ্যুত দেবতাগণ রাজ্যবিহীন হয়ে দুস্তর শোক সাগরে ডুবে অতি দুঃখে দিন কাটাতে লাগলেন। তারপর দেবতারা তাঁদের হারানো রাজ্য ফিরে পেতে এবং দানবদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে সেই অপরাজিতা দেবীকেই বিশেষ রূপে স্মরণ করতে লাগলেন। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন শ্রীমদ্ভগবদগীতার নবম অধ্যায়ের একত্রিশ নং শ্লোকে বলেছেন—

'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'।

অর্থাৎ কৌন্তেয়, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হন না— একথা তুমি নিশ্চিত জানিও এবং তিনি তাঁর সেই ভক্ত ও শরণাগত জনেদের রক্ষার জন্যই যুগে যুগে আবির্ভূত হন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতই আদ্যাশক্তি মহামায়া দেবতাদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দেবী যখন মহিষাসুর বধ করলেন তখন দেবতারা তাঁর যে স্তব করেন তাতে পরমাশক্তি অত্যন্ত প্রসন্না হন। সে-সময় তিনি দেবতাদের আকাঙ্ক্ষিত বর প্রার্থনার জন্য বললে দেবতারা বলেন—হে মা ভগবতি, তুমি আমাদের শত্রু এই মহিষাসুরকে বিনাশ করেছ, তাতেই আমাদের জন্য সবই করা হয়েছে। আর বাকী কিছু নেই। তবু যদি তুমি কৃপা করে আমাদের বর দিতেই ইচ্ছা করে থাক, তবে তোমার চরণে আমাদের এই প্রার্থনা যখন আমরা তোমাকে স্মরণ করব, তখনই তুমি আবির্ভূতা হয়ে আমাদের ঘোর বিপদ সমূহ নাশ করবে। সেদিন দেবি দুর্গাও দেবতাদের 'তাই হোক' বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

দেবীর সেই বরের কথা—বিপদকালে আমাকে স্মরণ করলে আমি তোমাদের সমস্ত মহাবিপদ তক্ষুনি নাশ করব।

ত্বয়াস্মাকং বরো দত্তো যথাপৎসু স্মৃতাখিলা।
ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ।। শ্রীশ্রীচণ্ডী ৫/৬

দেবতারা মায়ের সে-কথাই স্মরণ করে গিরিরাজ হিমালয়ে যাত্রা করেন এবং সেখানে গিয়ে বৈষ্ণবী-শক্তি মহাদেবীকে উত্তমরূপে স্তব করতে লাগলেন।

দেবতারা মাকে প্রসন্ন করতে, তাদের ঘোর দুর্দিনে মায়ের সাহায্য পেতে কিভাবে মাকে স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করেছিলেন, তা এখন আমরা ঋষি মেধসের মুখে শুনব। ঋষি বলছেন—

বৈষ্ণবীশক্তি মহাদেবীকে দেবগণ এরকম ভাবে উত্তমরূপে স্তব করতে লাগলেন—দেবীকে, মহাদেবীকে প্রণাম। সতত কল্যাণময়ী দেবী শিবাকে সতত প্রণাম করি। সৃষ্টিশক্তিরূপিণী প্রকৃতিকে প্রণাম। স্থিতিশক্তিরূপিণী ভদ্রাকে প্রণাম। আমরা একাগ্র চিত্তে তাঁকে বার বার প্রণাম করি। রৌদ্রাদেবীকে, নিষ্ঠাদেবীকে প্রণাম, গৌরী দেবীকে, জগদ্ধাত্রী দেবীকে প্রণাম করি। জ্যোৎস্নারূপিণী, চন্দ্ররূপিণী মুখস্বরূপাকে সতত প্রণাম করি। কল্যাণীকে প্রণাম করি। বৃদ্ধিরূপা ও সিদ্ধিরূপাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। অলক্ষ্মীরূপা, রাজগণের

লক্ষ্মীরূপা এবং শিবশক্তিরূপিণী তোমাকে বার বার প্রণাম করি। দুস্তর ভবসাগর পারকারিণী দুর্গাদেবীকে প্রণাম করি। যিনি সারভূতা, সর্বজননী, খ্যাতিরূপিনী এবং যিনি কৃষ্ণবর্ণা ও ধূম্রবর্ণা সেই দেবীকে সতত ভক্তিভরে প্রণাম করি। যিনি বিদ্যারূপে অতি সৌম্যা এবং অবিদ্যারূপে অতি ভীষণা তাঁকে আমরা প্রণত হয়ে প্রণাম করি। জগতের আশ্রয়রূপিণী ও ক্রিয়ারূপিণী দেবীকে বারবার প্রণাম করি। যে দেবী সকল প্রাণীতে বিষ্ণুমায়া নামে শব্দিতা বা অভিহিতা হন, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। যে দেবী সকল প্রাণীতে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। যে দেবী সর্বভূতে নিদ্রারূপে অবস্থিতা তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। যে দেবী সকলভূতে ক্ষুধারূপে অবস্থিতা, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। যে দেবী সর্বপ্রাণীতে ছায়ারূপে বিরাজমানা তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম প্রণাম, প্রণাম। যে দেবী সর্বপ্রাণীর মধ্যে শক্তিরূপে অধিষ্ঠিতা, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। যে দেবী সকল প্রাণীতে বিষয় বাসনারূপে বিরাজ করেন, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। যে দেবী সর্বভূতে ক্ষমারূপে অধিষ্ঠিতা, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। যে দেবী সর্বপ্রাণীতে জাতিরূপে অবস্থান করেন, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে বার বার প্রণাম করি। যে দেবী সর্বভূতে লজ্জারূপে অবস্থিতা তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে পুনঃ পনঃ প্রণাম করি। যে দেবী সর্বপ্রাণীতে শান্তিরূপে বিরাজিতা তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। যে দেবী সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রদ্ধারূপে অবস্থান করেন তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। যে দেবী সর্বভূতে কান্তিরূপে বিরাজিতা, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। যে দেবী সকল প্রাণীতে লক্ষ্মীরূপে অবস্থান করছেন, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। যে দেবী সর্বপ্রাণীতে বৃত্তি বা জীবিকারূপে অবস্থিতা, তাঁকে

প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। সকল প্রাণীর মধ্যে স্মৃতিরূপে যে দেবী অবস্থিতা তাঁকে প্রণাম, তাঁকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। যে দেবী সর্বভূতে দয়ারপে অবস্থিতা তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। যে দেবী সর্ব প্রাণীতে তুষ্টি বা সন্তোষরূপে অবস্থান করেন। তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। মাতৃরূপে যে দেবী সর্বভূতে বিরাজিতা তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, বার বার তাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি। যে দেবী সর্বপ্রাণীতে ভ্রান্তিরূপে বা অজ্ঞানরূপে অবস্থিতা, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম প্রণাম, প্রণাম। যিনি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজিতা এবং যিনি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, পঞ্চভূতের প্রেরয়িত্রী, সেই বিশ্ব ব্যাপিকা দেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। যিনি চিৎশক্তিরূপে এই সারা জগৎ জুড়ে অবস্থান করছেন, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। আগে অভীষ্টলাভের জন্য দেবগণ যাঁকে স্তব করেছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র প্রতিদিন যাঁর পূজা করতেন, সেই মঙ্গলময়ী পরমেশ্বরী আমাদের মঙ্গলবিধান করুন। এবং বিপদ সমূহ বিনাশ করুন। দুরন্ত দৈত্যদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে আমরা যে ঈশ্বরীকে এখানে প্রণাম পূর্বক স্তব করছি এবং যাঁকে ভক্তিনতদেহে স্মরণ করলে সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সকল বিপদ আপদ নাশ করেন, সেই মঙ্গলময়ী পরমেশ্বরী আমাদের পরম মঙ্গলবিধান করুন। এবং আমাদের সকল বিপদ বিনাশ করুন।

প্রসঙ্গতঃ মনে হয়, যে মা মহাদেবী, মঙ্গলদায়িনী সৃষ্টি স্থিতি শক্তিরূপিণী, যিনি রৌদ্রা, নিত্যা, জ্যোৎস্নারূপা, চন্দ্ররূপা, সুখস্বরূপা যিনি বৃদ্ধিরূপা, সিদ্ধিরূপা, অলক্ষ্মীরূপা, আবার লক্ষ্মীরূপাও, যিনি দুস্তর ভবসমুদ্র পারকারিণী, বিদ্যারূপে অতি সৌম্যা, অবিদ্যারূপে অতি রৌদ্রা, যিনি বিষ্ণুমায়া, যিনি সর্বভূতে চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, দয়া, তুষ্টি, মাতৃ, ভ্রান্তি প্রভৃতিরূপে বিরাজিতা বলে দেবগণ বর্ণনা করেছেন, সেই মা-ই তো সব কিছু। তাঁর বাইরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কি

কিছু আছে। এক মায়ের কৃপা হলে, মায়ের চরণ পেলেই তো সব পাওয়া হয়ে যায়। তাই মাতৃসাধক মাকেই সার জেনে আনন্দে গেয়ে উঠলেন—

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী, কালীর চরণে কৈবল্যরাশি।
সার্দ্ধত্রিশকোটি তীর্থ মায়ের ও চরণবাসী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হ'য়ে কাশীবাসী?
হৃদ্‌কমলে ভাব বসে চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী-দিবানিশি।।

তিনি আরও গাইলেন—
গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী ব'লে আমার অজপা যদি ফুরায়।।
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহি পায়।।
দান ব্রত যজ্ঞ আদি, আর কি না মনে লয়।
প্রসাদের যাগ-যজ্ঞ-ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়।
কালী-নামের এত গুণ কেবা জান্‌তে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পঞ্চমুখে গুণ-গায়।।

যাহোক মেধস্‌ ঋষি বলে চলেছেন—

ওহে রাজকুমার সুরথ, সেখানে দেবতারা সর্বান্তঃকরণে দেবীকে স্তবের পর স্তব করে চলেছেন। তারপর তাঁরা দেখলেন তাঁদেরই সামনে দিয়ে দেবী পার্বতী গঙ্গার জলে স্নানের জন্য এলেন। সেই সুন্দর ভ্রু সমন্বিতা দেবী দেবতাদের জিজ্ঞাসা করলেন—এখানে আপনারা কার স্তব করছেন? তখন সেই দেবীর শরীর কোষ থেকে আদ্যাশক্তি দেবী শিবা আবির্ভূতা হয়ে বললেন—নিশুম্ভাসুরের দ্বারা যুদ্ধে পরাজিত এবং শুম্ভাসুর কর্তৃক স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবতারাই সমবেত হয়ে আমার স্তব করছেন। দেবী পার্বতীর শরীর কোষ থেকে নিঃসৃতা হয়েছেন বলে দেবী অম্বিকা ত্রিভুবনে কৌষিকী নামে অভিহিতা হলেন। কৌষিকী

দেবীর নির্গমনের পর পার্বতী দেবীও কৃষ্ণবর্ণা হয়ে হিমালয়ে অধিষ্ঠান করতে লাগলেন। তখন তিনি কালিকা নামে প্রসিদ্ধা হলেন। অতি মনোহর রূপধারিণী দেবী অম্বিকা (কৌষিকী) আবির্ভূতা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুম্ভ ও নিশুম্ভের চণ্ড এবং মুণ্ড দুই ভৃত্যই তাঁকে দেখতে পেল। তারা দেবীকে দেখেই ছুটে যায় অসুররাজ শুম্ভের কাছে। গিয়ে তারা তাকে দেবী কৌষিকীর সংবাদ জানিয়ে বলে— হে মহারাজ, পরমা সুন্দরী এক নারী হিমালয় পর্বত আলোকিতা করে অবস্থান করছেন। তাঁর মত এত অপরূপ সুন্দরী মহিলা কেউ কোথাও কোনদিন দেখেনি। তিনি নিশ্চয় কোন না কোন দেবী। সুতরাং তাঁর বিষয়ে জেনে আপনি তাঁকে গ্রহণ করুন। সেই অতিশয় মনোহর অবয়বযুক্তা রমণীদের মধ্যে রত্নস্বরূপা নিজ অঙ্গের প্রভায় দশদিক আলোকিত করে অবস্থান করছেন। তাঁকে আপনার অবশ্যই দর্শন করা উচিত। হে প্রভু, ত্রিভুবনে যে-সব শ্রেষ্ঠ হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি রত্ন এবং পদ্মরাগ প্রভৃতি মণি আছে, তা সবই এখন আপনার রাজপ্রাসাদে শোভা পাচ্ছে। আপনি দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে গজরত্ন ঐরাবত, এই পারিজাত বৃক্ষ এবং উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্বরত্ন এনেছেন। ব্রহ্মার যে হংসসংযুক্ত রত্নস্বরূপ আশ্চর্য বিমান ছিল, তাও তো এখন আপনার অধীনে রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণে শোভা পাচ্ছে। আপনি ধনরাজ কুবেরের কাছ থেকে মহাপদ্ম নামক নিধি এনেছেন এবং সমুদ্রও আপনাকে অম্লান পদ্মের কিঞ্জল্কিনী নামে একটি মালা দিয়েছেন। বরুণদেবের সোনার ছাতা এবং প্রজাপতি দক্ষের শ্রেষ্ঠরথও আপনার প্রাসাদেই শোভা পাচ্ছে। হে প্রভু আপনি যমরাজের মরণদাত্রী নামক শক্তি অস্ত্র আহরণ করেছেন এবং জলের দেবতা বরুণের পাশাস্ত্রও আপনার ভাই নিশুম্ভের অধিকারে রয়েছে। সমুদ্রজাত সকল রত্নরাজিও রয়েছে নিশুম্ভেরই অধিকারে। পরন্তু অগ্নি আপনাদের এমন বস্ত্রযুগল দিয়েছেন, যা কেবলমাত্র অগ্নির দ্বারাই পরিষ্কৃত হয়। হে দৈত্যরাজ, এভাবে যখন আপনি জগতের সকল শ্রেষ্ঠ বস্তু সংগ্রহ করেছেন, তখন কেন আপনি এই সুলক্ষণা স্ত্রীরত্নটিকে গ্রহণ করছেন না?

মেধস্ ঋষি রাজা সুরথকে বলছেন— সেই দৈত্যরাজ শুম্ভ তখন চণ্ড ও মুণ্ডের কাছে ওইসব কথা শুনে মহাসুর সুগ্রীবকে দেবীর কাছে দূতরূপে পাঠাল। দৈত্যরাজ শুম্ভ সুগ্রীবকে বলে তুমি সেখানে গিয়ে আমার কথামত তাঁকে এসমস্ত কথা বলবে এবং যাতে তিনি ভালোয় ভালোয় সম্প্রীতির সঙ্গে আমার সাথে দেখা করেন, সেকথাও বলবে।

রাজা শুম্ভের আদেশ অনুযায়ী অতি রমণীয় পর্বতের চূড়াদেশে যেখানে সেই দেবী অবস্থান করছিলেন, সুগ্রীব সেখানে গিয়ে তাঁর কাছে অতি কোমলভাবে ও মধুর বাক্যে তাঁকে বলতে লাগল—

হে দেবি, দৈত্যরাজ শুম্ভ ত্রিভুবনের পরমেশ্বর। আমি তাঁরই প্রেরিত দূতরূপে আপনার কাছে এসে পৌঁছেছি। সমস্ত দেবতাদের মধ্যে কেউই যাঁর আদেশ অমান্য করতে সাহসী হয় না, সেই দৈত্যরাজ শুম্ভ আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন। এবং তিনি আপনার কাছে আমাকে যা বলতে বলেছেন তা শুনুন—

শুম্ভ বলেছেন — সারা ত্রিভুবন আমারই অধীন। দেবতারাও আমার বশবর্তী। বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সমস্ত যজ্ঞভাগ আমিই আলাদা আলাদাভাবে সেই সেই দেবতারূপে উপভোগ করি। ত্রিভুবনে যেসমস্ত উৎকৃষ্ট রত্ন এবং গজরত্ন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হাতী আছে তা সবই আমার অধিকারে। ক্ষীরোদ সাগর মন্থন করে পাওয়া ইন্দ্রের বাহন উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বরত্নটিও দেবতারা আমাকে প্রণাম পূর্বক সমর্পণ করেছে। দেবতা, গন্ধর্ব ও নাগগণের মধ্যে অন্যান্য যে সমস্ত রত্নতুল্য শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে, সে-সমস্তও এখন আমারই অধীনে রয়েছে। এই জগতে আমরা তোমাকে নারীজাতির মধ্যে রত্নস্বরূপা মনে করি। তুমি আমাদের নিকট এস। কারণ আমরাই জগতের শ্রেষ্ঠ বস্তু ভোগের উপযুক্ত পাত্র। হে চঞ্চল নয়নে, যেহেতু তুমি রমণীকুলের রত্নস্বরূপা, অতএব আমাকে অথবা আমার কনিষ্ঠভাই মহাবিক্রমশালী নিশুম্ভকে পতিরূপে গ্রহণ কর। তুমি যদি আমার পত্নী হও তবে, অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য পাবে। এ-বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে আমাকে স্বামীরূপে বরণে স্বীকৃতা হও।

মেধস্ ঋষি সুরথকে বললেন—শুম্ভের দূত সুগ্রীবের মুখে ওই সকল কথা শুনে সেই জগদ্ধাত্রী মঙ্গলময়ী ভগবতী দুর্গাদেবী মনে মনে হেসে গম্ভীরভাবে দূতকে বললেন—

তুমি ঠিকই বলেছ, এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র তুমি মিথ্যা কথা বলোনি। শুম্ভ ত্রিভুবনের অধিপতি এবং নিশুম্ভও তারই মত বীর। কিন্তু এ বিষয়ে আগেই আমি আমার অল্প বুদ্ধিবশতঃ যে প্রতিজ্ঞা করেছি, তার অন্যথা করি কি করে? আমার প্রতিজ্ঞাটি তুমি শোন—যিনি আমাকে যুদ্ধে জয় করবেন, যিনি আমার দর্পচূর্ণ করবেন এবং যিনি জগতে আমার তুল্য বলশালী হবেন—তিনিই আমার স্বামী হবেন। অতএব মহাসুর শুম্ভ অথবা নিশুম্ভ এখানে এসে আমাকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে শীঘ্র আমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করুন এ-বিষয়ে আর দেরীর কি দরকার?

দূত দেবীর কথা শুনে বলে — হে দেবি, আপনার অত্যন্ত গর্ব হয়েছে। আমার সামনে এরকম কথা আর বলবেন না। ত্রিভুবনে এমন কোন পুরুষ আছে যে শুম্ভ ও নিশুম্ভের সামনে দাঁড়াতে পারে? ইন্দ্র প্রভৃতি সকল দেবতারা যে শুম্ভ ও তার সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে স্থির থাকতে পারেনি, আপনি একজন স্ত্রীলোক হয়ে কি-ভাবে তাঁর সামনে যাবেন? আমার পরামর্শ অনুযায়ী আপনি এখনই শুম্ভ ও নিশুম্ভের কাছে চলুন। না হলে পরে আপনার চুলের মুঠি ধরে, অপমান করে তারা আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে।

দেবী বললেন — তুমি যা বললে তা সত্য, শুম্ভ বলবান এবং নিশুম্ভও অতি বীর্যবান। কিন্তু কি করি। আগে তো আমি এসব কথা বিচার করে প্রতিজ্ঞা করিনি। অতএব তুমি দৈত্যরাজ শুম্ভের কাছে যাও। আমি তোমাকে যা যা বললাম, সে-সব কথা যত্নসহকারে তুমি অসুররাজকে বল। তারপর তিনি যা উচিৎ মনে করবেন—তাই করবেন।

## বধিলেন দেবী সে ধূম্রলোচনে

মেধস্ ঋষি বলে চলেছেন। নিবিষ্ট মনে শুনছেন রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য। অসুররাজ শুম্ভের দূত সুগ্রীব দেবীর কথা শুনে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে রাজধানীতে ফিরে এসে দৈত্যরাজকে সব কথা নিবেদন করল। অসুররাজ শুম্ভ সেই দূতের মুখে দেবীর ওই সকল ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা শুনে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠে। তারপর সে তার সেনাপতি ধূম্রলোচনকে আদেশ করে তুমি শীঘ্র নিজে সৈন্যে পরিবৃত হয়ে সেই দুষ্টা নারীকে জোর করে চুলের মুঠি ধরে বিহ্বল করে টানতে টানতে আমার কাছে নিয়ে এস। আনার সময় যদি তাকে রক্ষা করার জন্য কোন দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ অথবা অন্য কেউ উপস্থিত হয়, তবে তাকে অবশ্যই বধ করবে।

সেনাপতি ধূম্রলোচন দৈত্যরাজ শুম্ভের আদেশ পেয়েই ষাট হাজার অসুর সৈন্যে পরিবেষ্টিত হয়ে দ্রুতবেগে দেবীর কাছে ছুটে চলল। কিছুদূর যাওয়ার পরই সেই অসুর সেনাপতি ধূম্রলোচন হিমাচলে অবস্থিতা সেই কৌষিকীদেবীকে দেখে চিৎকার করে বলে আপনি শুম্ভ ও নিশুম্ভের নিকট তাড়াতাড়ি চলে যান। আজ যদি আপনি প্রীতির সঙ্গে নিজ ইচ্ছায় আমার প্রভু শুম্ভের কাছে না যান,তবে তাহলে আমিই আপনাকে জোর করে আপনার চুলের মুঠি ধরে বিবশ করে সেখানে টেনে নিয়ে যাব।

দেবী তাকে বললেন তুমি দৈত্যরাজ শুম্ভ কর্তৃক প্রেরিত, বলবান ও সৈন্য পরিবৃত। তুমি যদি আমাকে এভাবে জোর করে নিয়ে যাও, তাহলে আমি আর তোমাকে কি করতে পারি?

দেবীর ওই কথা শুনে সেই অসুর ধূম্রলোচন তাঁর দিকে তাড়া করে ছুটে যাওয়া মাত্র অম্বিকা দেবী সেই অসুর সেনাপতিকে শুধুমাত্র হুঙ্কারের দ্বারাই ভস্মীভূত করে ফেললেন। ধূম্রলোচনকে ভস্মীভূত হতে দেখে তার সৈন্যরা রেগে যায়। তারা তখন সেই অম্বিকা দেবীর

প্রতি তীক্ষ্ণ শর, শক্তি ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্র নিক্ষেপ করতে থাকে। তখন দেবীর নিজ বাহন সিংহ ক্রোধে কেশর দুলিয়ে ভীষণ গর্জন করে অসুর সৈন্যদের দিকে ধেয়ে যায়। দেবীর বাহন সেই সিংহ অসুর সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে কাউকে করাঘাতে, কাউকে কামড় দিয়ে এবং অন্যান্য মহাসুরদের মুখে চিবিয়েই তাদের মেরে ফেলে। সিংহ তার ধারালো নখের দ্বারাই কতকগুলি দৈত্যের উদর বিদীর্ণ করে এবং করাঘাতে কতকগুলির মাথা শরীর থেকে আলাদা করে ফেলে। সেই সিংহ অন্যান্য অনেক দৈত্যের বাহু ও মাথা ছিন্ন করে এবং কেশর দুলিয়ে কারও কারও উদর থেকে রক্ত পান করল। সিংহ পশুদের রাজা—সে অবশ্যই বলশালী। কিন্তু এ সিংহ যে মহাশক্তি মহামায়ার দেবীর বাহন, সুতরাং সে তো মহাপরাক্রমশালী। তাই দেখা যায়, সেই মহাপরাক্রমশালী অতি ক্রুদ্ধ দেবীর বাহন সিংহ কিছুক্ষণের মধ্যেই ধূম্রলোচনের সমস্ত সৈন্যকে একাই ধ্বংস করে ফেলে।

দেবীর হুঙ্কারে ধূম্রলোচন মারা গেছে। দেবীর বাহন সিংহ সকল দৈত্য সৈন্যদের সংহার করছে। এমন সংবাদ পেয়ে দৈত্যরাজ শুম্ভ অত্যন্ত রেগে যায়। রাগে তার শরীর কাঁপতে থাকে। সে সঙ্গে সঙ্গে চন্ড ও মুন্ড নামক দুই মহাসুরকে যুদ্ধে যাওয়ার আদেশ করে বলে—হে চন্ড, হে মুন্ড, তোমরা দুজনে বহু সৈন্য পরিবৃত হয়ে সেই দেবীর কাছে যাও। সেখানে যেয়ে তাঁর চুলের মুঠি ধরে টেনে অথবা তাঁকে বেঁধে শীঘ্র আমার এখানে নিয়ে এসো। আর যদি এ বিষয়ে তোমাদের কোন রকম সন্দেহ হয়, তবে সমস্ত অসুর সৈন্য একসঙ্গে নানা রকম অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে যুদ্ধে তাকে মৃতপ্রায় করবে। সেই দুষ্টা অম্বিকা দেবীকে অস্ত্রের আঘাতে আহত এবং তাঁর বাহন সিংহটি নিহত হলে অম্বিকা দেবীকে বেঁধে তাড়াতাড়ি আমার এখানে নিয়ে আসবে।

## চণ্ডিকাকে চামুণ্ডার চণ্ড-মুণ্ডের মুণ্ড প্রদান

শ্রোতা রাজা সুরথকে বক্তা মেধস্ ঋষি বলছেন — দৈত্যপতি শুম্ভের আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চণ্ড-মুণ্ড প্রমুখ মহাবীর দৈত্যগণ হাতী, ঘোড়া, রথ ও পদাতিক এই চতুরঙ্গ সৈন্যদল সহ অস্ত্র-শস্ত্র উদ্যত করে দেবীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। তাদের অন্তরের সঙ্কল্প যেভাবে হোক আজ দেবী অম্বিকাকে তারা তাদের রাজা শুম্ভের কাছে ধরে নিয়ে যাবেই। দৈত্য সেনাপতি ও তার সশস্ত্র সৈন্যদের আসতে দেখে এবং তাদের মনোভাব বুঝে দেবী মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন। দানব সৈন্যরাও কাঞ্চনময় হিমালয়ের অতি উঁচু চূড়ায় সিংহের উপরে আরূঢ়া মৃদু হাস্যময়ী দেবী অম্বিকাকে দেখতে পেল। দেবীকে দেখতে পেয়েই তারা উৎসাহিত হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে দেবীকে ধরবার জন্য উদ্যোগ নেয়। অন্যান্য কোন কোন সৈন্য ধনুকে শর যোজনা করে এবং হাতে খড়্গ নিয়ে দেবীর কাছে এগিয়ে যায়। তখন দেবী অম্বিকা সেই শত্রুগণের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হলেন। ভীষণ ক্রোধে তাঁর বদনমণ্ডল হল কৃষ্ণবর্ণা। তখন সেই অম্বিকা দেবীর ভ্রুকুটি কুটিল ললাটদেশ হতে শীঘ্র ভীষণ বদনা খড়্গ ও পাশধারিণী মা কালী নির্গতা হলেন।

প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে বিদ্রোহী করি কাজী নজরুলের অগ্নি-বীণায় লিখিত রক্তাম্বরধারিণী মা কবিতাটি। কবিও যেন অসুর শক্তির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে চাইছেন প্রতিকার। চাইছেন অসুর-সংহার। তাই তিনি লিখলেন -

রক্তাম্বর পর মা এবার
জ্বলে পুড়ে যাক শ্বেত বসন।
দেখি ঐ কার সাজে মা কেমন
বাজে তরবারি ঝনন্-ঝন
সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেল মা গো
জ্বাল সেথা জ্বাল কাল - চিতা
তোমার খড়্গ রক্ত হউক
স্রষ্টার বুকে লাল ফিতা।

এলোকেশে তব দুলুক ঝঞ্ঝা
কাল-বৈশাখী ভীম তুফান
চরণ আঘাতে উদ্গারে যেন
আহত বিশ্ব রক্তবান।
নিঃশ্বাসে তব পেঁজা-তুলো সম
উড়ে যাক মা গো এই ভুবন,
অসুরে নাশিতে হউক বিষ্ণু-
চক্র মা তোর হেম কাঁকন।
টুঁটি টিপে মারো অত্যাচারে মা
গল হার হোক নীল ফাঁসি,
নয়নে তোমার ধূমকেতু জ্বালা
উঠুক সরোষে উদ্ভাসি
হাস খল খল দাও করতালি
বল হর হর শঙ্কর!
আজ হতে মা গো অসহায় সম
ক্ষীণ ক্রন্দন সম্বর
মেখলা ছিঁড়িয়া চাবুক কর মা
সে চাবুক কর নভ-তড়িৎ
জালিমের বুক বেয়ে খুন ঝরে
লালে লাল হোক শ্বেত হরিৎ।

.....................................

দেখা মা আবার দনুজ-দলনী
অশিব-নাশিনী চন্ডী রূপ
দেখাও মা ঐ কল্যাণ করই
আনিতে পারে কি বিনাশ-স্তূপ।
শ্বেত শতদল-বাসিনী নয় আজ
রক্তাম্বর ধারিণী মা
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা!

আবার আমরা ঋষির মুখেই শুনি -

দেবী অম্বিকার ললাট থেকে উদ্ভুতা হলেন চামুন্ডা (মা কালী) দেবী। তাঁর রূপটি কেমন? তাঁর রূপটি হল—তিনি বিচিত্র নর কঙ্কাল-ধারিণী, নরমুন্ড মালিনী, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা, অস্থিচর্মসার দেহস্বরূপা। অতিভীষণা, বিশালবদনা, লোলজিহ্বা, ভয়ঙ্করী, কোটরগতা, আরক্ত চক্ষুবিশিষ্টা এবং সিংহনাদে দিঙ্‌মন্ডল পূর্ণকারিণী। তিনি সবেগে অসুর সেনার মধ্যে প্রবেশ করে প্রধান প্রধান অসুরগণকে বিনাশ করতে করতে অন্যান্য সৈন্যগণকে ভক্ষণ করতে লাগলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে মায়ের সেই ভয়ানক রূপ দেখেই কি সাধক কমলাকান্ত গাইলেন?—

রঙ্গে নাচে রণ মাঝে কার কামিনী মুক্তকেশী
হয়ে দিগম্বরী, ভয়ঙ্করী, করে ধরে তীক্ষ্ণ অসি।
ফেরে তিমির বরণী বামা নবীনা ষোড়শী।
গলে দোলে মুন্ডমালা মুখে মৃদু মৃদু হাসি।
বিনাশে দনুজগণে দেখে মনে ভয় বাসি।

আমরা শুনছিলাম দেবী কিভাবে অসুরদের বিনাশ করছেন সে-কথা। আবার তাই শুনি — সেই চামুন্ডা দেবী পৃষ্ঠরক্ষক, মাহুত, গজারূঢ় বীর ও গলায় ঘন্টাদি সংযুক্ত হাতিগুলিকে এক হাতে নিজের মুখের মধ্যে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। এভাবে চামুন্ডা অশ্বের সঙ্গে অশ্বারোহী যোদ্ধাকে এবং সারথি সমেত রথকে নিজের মুখের মধ্যে নিক্ষেপ করে দাঁত দিয়ে অতি ভীষণভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে লাগলেন। তিনি কারও চুলে, কারও বা গ্রীবাদেশে ধরলেন। কাউকে পা দিয়ে দলে দিলেন। কাউকে বা বুকে চেপে মেরে ফেললেন। তিনি বলবান ও বিশাল শরীর অসুরদের সেই সমস্ত সৈন্যের কতকগুলিকে পিষে মারলেন। কতকগুলিকে খেয়ে ফেললেন এবং বাকিদেরকে তাড়িয়ে দিলেন। কোন কোন অসুর খড়্গের আঘাতে নিহত হল। কারো কারো মৃত অসুরের পাঁজরের বা কঙ্কালের আঘাতে জীবন গেল। কেউ কেউ বা তাঁর দাঁতের আঘাতে মারা গেল। এভাবে ক্ষণকালের মধ্যেই অসুরদের সমস্ত সৈন্যকে নিহত হতে দেখে সেনাপতি চন্ড সেই অতি ভয়ঙ্করী মা কালীকে তাড়া করে ছুটে যায়।

মায়ের ওই রকম যুদ্ধের বিবরণ শুনে মনে পড়ে যায় সাধক কমলাকান্তের আর একটি গান -

পাগলীর বেশে মোহিনী কে বিহরে রে।
বিবসনা সমরে, নরকর কোমরে, অসিবর বাম করে ধরে।।
ডিমিকী ডিমিকী ডুমরু বাজে ......
রণ সমাজে, না করে লাজে। কুলরমণী বামা কে এল রে।

ঋষি বলে চলেছেন — চণ্ড অতি ভীষণ শরবর্ষণ করে এবং মুন্ড হাজার হাজার চক্রাস্ত্র নিক্ষেপের দ্বারা সেই ভীমনেত্রা মা কালীকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কাল মেঘের মাঝখানে অবস্থিত অসংখ্য সূর্যবিম্বের মত মুন্ডের নিক্ষেপিত অসংখ্য চক্র তাঁর মুখের মধ্যে প্রবেশ করে শোভা পেতে থাকল। তখন ভীমনাদিনী মা কালী চামুন্ডাদেবী ভয়ানক রাগে রাগান্বিতা হয়ে ভীষণ অট্টহাস্য করলেন। তাঁর করাল বদনের মধ্যে অবস্থিত ভীষণ দাঁতগুলির প্রভায় তিনি তেজোময়ী হলেন। তারপর দেবী তাঁর মহাখড়্গ তুলে ধরে রাগে 'হং' এই শব্দ করে চন্ডের দিকে ধেয়ে গিয়ে এবং তার চুলের মুঠি ধরে সেই খড়্গ দিয়ে এক কোপেই তার মাথাটি ছিন্ন করে দিলেন।

চন্ডকে দেবী বধ করেছেন দেখে রাগে মুন্ডও দেবী চন্ডীর দিকে ধেয়ে যায়। তখন চামুন্ডাদেবী রাগে তাঁর শাণিত খড়্গের একটি মাত্র কোপেই মুন্ডের দেহ থেকে মুন্ডটিকে পৃথক করে দিলেন। সেও ভূপতিত হল। চণ্ড ও মুণ্ডকে ওইভাবে বধ হতে দেখে বাকি যে সকল সৈন্য তখনও জীবিত ছিল তাঁরা যে যেদিকে পারল চামুন্ডার ভয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচল।

এদিকে মাকালী চন্ড ও মুন্ডের মাথা দুটি নিয়ে দেবী চন্ডিকার কাছে এসে বিকট অট্টহাসি হেসে বললেন—এই যুদ্ধরূপ যজ্ঞে আমি আপনাকে চন্ড ও মুন্ড নামে দুই মহাপশুর মস্তক উপহার দিলাম। এখন আপনি নিজেই শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করবেন। মা কালীর আনা মহাসুর চন্ড ও মুন্ডের মাথা দুটি দেখে মঙ্গলময়ী চন্ডিকাদেবী মধুর বাক্যে মা কালীকে বললেন - হে দেবি, যেহেতু তুমি চন্ড ও মুন্ডের মাথা দুটি আমার নিকট নিয়ে এসেছ, সেজন্য আজ থেকে তুমি জগতে 'চামুন্ডা' নামে বিখ্যাত হবে।

## রক্তপায়িনী মায়ের রক্তবীজ বধ

মেধস্ ঋষি বললেন - তারপর চন্ড ও মুন্ড নামে দুই দৈত্য এবং তাদের সঙ্গে বহু সৈন্য মারা যাওয়ার সংবাদ পেয়ে দৈত্যরাজ শুম্ভ রাগে অস্থির হয়ে ওঠে। তখন সে তার সমস্ত দৈত্যসৈন্যকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বলে। দৈত্য বলে আজই ছিয়াশী জন প্রধান দৈত্য অস্ত্র হাতে সকল সৈন্যসহ এবং কম্বুবংশ জাত চুরাশী জন দৈত্য নিজ সৈন্যে পরিবৃত হয়ে যুদ্ধে চলে যাক্। কোটিবীর্য নামে অসুরদের পঞ্চাশটি বংশ এবং ধূম্রবংশের অসুরদের একশ বংশ আমার আদেশে যুদ্ধে যাত্রা করুক। সেরকম কালক, দৌর্হৃদ, মৌর্য এবং কালকেয় প্রভৃতি অসুরেরা অবিলম্বে আমার আদেশে যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বের হোক। এভাবে সকল সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলে উগ্রশাসক অসুররাজ শুম্ভ বহু হাজার শ্রেষ্ঠ সৈন্যে পরিবেষ্টিত হয়ে নিজেও যুদ্ধের জন্য বের হয়।

দূর থেকে দেবী চন্ডিকা সেই সমস্ত অতি ভয়ঙ্কর অসুর সৈন্যদের আসতে দেখে তাঁর ধনুকে টঙ্কার দিয়ে এমন শব্দের সৃষ্টি করলেন যে সেই শব্দ পৃথিবী ও আকাশের মধ্যস্থল পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে গেল। তারপর দেবীর বাহন সিংহও অতি ভয়ঙ্কর গর্জন করে ওঠে এবং দেবী অম্বিকাও ঘন্টার ধ্বনি করে সেই শব্দসমূহকে আরও বাড়িয়ে তুললেন। করাল-বদনা মা কালী (চামুন্ডা দেবী) ভয়ঙ্কর হুঙ্কার শব্দ করে দিগ্ হতে দিগন্তর পূর্ণ করে তুললেন। তাঁর ভীষণ শব্দে সেই ধনুষ্টঙ্কার, সিংহের গর্জন ও ঘন্টার ধ্বনিকেও অভিভূত করে ফেলে। সেই মহাশব্দ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ায় দৈত্য সৈন্যরাও শুনতে পায়। তাতে তারা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তখন সেই ক্রুদ্ধ দৈত্য সৈন্যরা দেবী অম্বিকা, দেবীর বাহন সিংহ এবং মা কালীকে (চামুন্ডা দেবীকে ) চারিদিকে ঘিরে ধরে। এই অবসরে অসুরদের বিনাশ এবং অমরগণের বিজয়ের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নৃসিংহ, শিব, ইন্দ্র ও কার্তিকেয় প্রভৃতি দেবগণের মহাবীর্য ও মহাবল সম্পন্ন শক্তি সমূহ তাঁদের শরীর থেকে বের হয়ে তাঁদের অনুরূপা দেবী মূর্তি ধরে দেবী চন্ডিকার সামনে এসে উপস্থিত হলেন। যে দেবতার যেমন আকার, যেমন বসন ভূষণ ও বাহন, তাঁর শক্তিও সেরকমই আকারের,

তাঁর বসন-ভূষণ এবং একই রকম বাহন নিয়ে তাঁরা অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন। হংসযুক্ত বিমানে চেপে হাতে জপমালা ও কমণ্ডলু নিয়ে প্রথমেই আবির্ভূতা হলেন ব্রহ্মার শক্তি। নাম তাঁর ব্রহ্মাণী। ব্রহ্মাণীকে পণ্ডিত-সন্ন্যাসী ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী বলেছেন তিনি ব্রহ্মার মূলীভূতা শক্তি। তিনি সৃষ্টিশক্তি। নাদ ও শব্দ স্বরূপিণী। তাঁর জপমালার অর্থ হল মন্ত্রশক্তি আর কমণ্ডলুতে যে জল তা অমৃতবারি। তিনি ওই অমৃতবারি দিয়েই ভক্তকে করেন রক্ষা আর দুষ্টের করেন নাশ। হয়তো সে নাশ তাঁদের মতে জীবন বিনাশ না হয়ে অভক্তির বিনাশই হবে।

ব্রহ্মাণীর পরে যিনি এলেন, তিনিই হলেন মাহেশ্বরী। তিনি এলেন বৃষ বা ষাঁড়ের পিঠে চেপে। হাতে তাঁর শাণিত ত্রিশূল—যেমন থাকে শিবেরও হাতে। ললাটে তাঁরও শিবের মত অর্ধেন্দু শোভা পাচ্ছে। শিবের মত তাঁর অঙ্গে সর্প বা সাপ। তবে তাঁর হাতে সর্প বলয়াকৃতিতে। শিব রুদ্ররূপে করেন ধ্বংস। সেইজন্যই তাঁর হাতে শাণিত ত্রিশূল। ব্রহ্মা যেমন সৃষ্টির প্রতীক, তেমনি এখানে ব্রহ্মাণী হলেন সৃষ্টির প্রতীক। আর রুদ্র যেমন প্রলয়ের দেবতা এখানে মাহেশ্বরীও সেই প্রলয় বা বিনাশের জন্যই অবতীর্ণ। বৃষ হল ধর্মের প্রতীক। লোকে অনেক সময় যে ষাঁড় ছেড়ে দেয়, তাকে সকলেই বলে ধর্মের ষাঁড়। সেজন্য বৃষকে ধর্মের প্রতীক বলা হচ্ছে। শ্রদ্ধেয় ডঃ মহানামব্রতজীর মতে ত্রিশূলের তিনটি শূলে তিন গুণ নাশ করে। তার মানে সে নির্গুণের প্রতীক। চন্দ্রকলা সম্পর্কে বলা হচ্ছে চন্দ্রে থাকে স্নিগ্ধতা। তার মানে এ যুদ্ধ নিষ্ঠুরতার হলেও এতে আছে করুণার ধারা। দুই হাতে তাঁর দুটি সাপের বলয়। একটি সাপ অনন্ত ও অন্যটি বাসুকী। একটি করে আকর্ষণ অন্যটি করে বিকর্ষণ। একবার এক জনে ছেড়ে দেন, আর একবার অন্যজনে টেনে তোলেন। মহারাত্রিতে সকলে অবশ হলে তাতেই নিদ্রা যায়। আর ইনি অসুরের আসুরিকতা নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করেন।

মাহেশ্বরীর পরেই এলেন কার্তিকেয়রূপিণী মাতা কৌমারীদেবী। তাঁর মধ্যে কার্তিকের সম্পূর্ণ শক্তি বিদ্যমান। এঁর মধ্যে ক্ষাত্রশক্তির প্রকাশ। তাঁর বাহন ময়ূর। হাতে তাঁর শক্তি বা বর্শা।

এরপর এলেন বৈষ্ণবীশক্তি। যে নারায়ণকে আমরা জানি নারায়ণ

পরাগতিঃ অর্থাৎ নারায়ণই আমাদের একমাত্র গতি, একমাত্র আশ্রয়। এই বৈষ্ণবীশক্তি তাঁর থেকেই প্রকাশিতা। নারায়ণের বাহন হল গরুড়, এঁরও বাহন সেরকমই - গরুড়। আর তাঁর হাতের অস্ত্রগুলি হল—শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ও খড়্গ। আমরা জানি নারায়ণের হাতেও থাকে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। তবে তিনি প্রয়োজনে শার্ঙ্গ বা খড়্গও ধারণ করেন। তাই এখানে বৈষ্ণবী শক্তির হাতে নারায়ণের ব্যবহৃত সব অস্ত্রই দেখা যাচ্ছে।

বৈষ্ণবী শক্তির পরে যাঁর আগমন ঘটে তিনিই হলেন বারাহী। আমরা দ়শবতারের কথাতে পড়েছি বা জানি—

বসতি দশন শিখরে, ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ক কলেব নিমগ্না।
কেশবধৃত শূকররূপ জয়-জগদীশ হরে।।

তাহলে বরাহ অবতার তিনিই, যিনি পৃথিবী যখন জলমগ্ন হয়েছিল, তখন সেই অধোগামী পৃথিবীকে নিজ দাঁত দিয়ে তুলে ধরেছিলেন। সেসময় ইনিই হিরণ্যাক্ষ অসুরকে বধ করেছিলেন। দেবতাদের অসুরের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য ভগবান শ্রীহরি যে যজ্ঞ বরাহের রূপ ধারণ করেছিলেন—তাঁরই শক্তি নিয়ে এই বারাহী দেবীর আবির্ভাব।

বারাহীর পরে মা চন্ডীর পাশে থেকে অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যিনি এলেন তাঁর নাম নারসিংহী। এই নারসিংহী হলেন নরসিংহ বা নৃসিংহ অবতার। নৃসিংহ আর কেউ নন—স্বয়ং নারায়ণই। এই নৃসিংহ অবতারের কথাও আমরা পাই দশাবতার স্তোত্রে যেখানে বলা হয়েছে—

**তব করকমলবরে, নখমদ্ভুতশৃঙ্গম্।**
**দলিত হিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্।।**
**কেশব ধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে।।**

অর্থাৎ, সেই পরমব্রহ্ম নারায়ণই ভক্ত প্রহ্লাদের উপর অত্যাচারকারী হিরণ্যকশিপুকে বিনাশের জন্য ধরেছিলেন নরহরি রূপ বা নৃসিংহ রূপ। আজ সেই নৃসিংহই নারসিংহীরূপে পুনরায় অসুর নিধনে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। তাঁর গলদেশে কেশর। সেই কেশর সঞ্চালনে নক্ষত্ররাজি এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত হয় এমনই তাঁর শক্তি।

তারপরই এলেন সহস্রনয়না ঐন্দ্রি। তাঁর মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্রের পরিপূর্ণ শক্তি। তাঁরও হাতে ইন্দ্রের মতই বজ্রাস্ত্র। আর তাঁরও বাহন সেই হস্তী।

ওই সকল দেবশক্তিদের আবির্ভাব ঘটলে দেবশক্তিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে দেবাদিদেব মহাদেব দেবী কালিকাকে বললেন — আমার প্রীতির জন্য আপনি সত্বর অসুরদের বিনাশ করুন। তখন দেবীর শরীর থেকে অতি ভয়ঙ্করী, অতি উগ্রা অসংখ্য শব্দকারী শৃগালের দ্বারা বেষ্টিতা চন্ডিকা শক্তি আবির্ভূতা হলেন। সেই অপরাজিতা দেবী ধূম্রবর্ণ জটাধারী মহাদেবকে বললেন — হে ভগবন্, আপনি শুম্ভ ও নিশুম্ভের কাছে দূতরূপে বার্তা নিয়ে যান। সেই অতি গর্বিত দুই দানব শুম্ভ ও নিশুম্ভকে এবং তাদের সঙ্গে আরও যেসকল দৈত্য দানব সেখানে যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছেন তাদেরও বলুন —

দেবরাজ ইন্দ্র পুনরায় ত্রিলোকের অধিপতি হোন, দেবগণ যজ্ঞীয় আহুতি ভোগ করুন। তোমরা যদি বাঁচতে চাও তবে পাতালে চলে যাও। আর যদি তোমরা তোমাদের শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে যুদ্ধেরই আকাঙ্ক্ষা কর তবে এস, আমার শিয়ালেরা তোমাদের মাংস খেয়ে পরিতৃপ্ত হোক। সাক্ষাৎ শিবকে দূত রূপে নিযুক্ত করায় দেবী চণ্ডিকা তখন থেকে শিবদূতী নামে জগতে প্রসিদ্ধা হয়েছেন।

যাক্ সেকথা, শিব দেবীর কথামত অসুরদের কাছে গিয়ে দূতের কাজটি যথাযথভাবে করে এলেন। অসুরেরা শিবের মুখে দেবীর কথা শুনে রাগে হয়ে উঠল অগ্নিশর্মা। তারা রাগে অস্থির হয়ে যেখানে কাত্যায়নী দেবী ছিলেন সেখানেই গিয়ে হাজির হলেন। তারপর ক্রোধে উন্মত্ত অসুরেরাই প্রথমে শর, শক্তি ও খড়্গ বর্ষণ করে তাঁকে অর্থাৎ দেবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। দেবী করুণাময়ী। তিনি তাদের বাঁচার সুযোগ দিতেই পাতালে পালিয়ে যাওয়ার পথ বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সে পথে না গিয়ে শুরু করল যুদ্ধ। দেবীকে করল অস্ত্রে আচ্ছন্ন। সুতরাং দেবী এবার রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করলেন। তিনিও তাদের নিক্ষিপ্ত বাণ, চক্র ও কুঠার প্রভৃতি অস্ত্রগুলিকে অনায়াসে টঙ্কৃত ধনুক থেকে মুক্ত হওয়া বাণসমূহ দিয়েই ছিন্ন ভিন্ন করলেন। তখন মা কালীও সেইভাবে শত্রুদের শূলের আঘাতে বিদীর্ণ ও খট্টাঙ্গের প্রহারে মর্দন

করতে করতে দেবী চণ্ডিকার সামনে বিচরণ করতে লাগলেন।

এদিকে ব্রহ্মাণী যে যে জায়গায় গেলেন, সেই সেই জায়গায় শত্রুদেরকে কমন্ডলুর মন্ত্রপূত জল সিঞ্চন করে হতবীর্য ও নিস্তেজ করে ফেললেন। একইভাবে অতি ক্রুদ্ধা হয়ে দেবী মাহেশ্বরী ত্রিশূলের দ্বারা, বৈষ্ণবী দেবী চক্রদ্বারা এবং কৌমারী শক্তি অস্ত্র দ্বারা দৈত্যদেরকে বধ করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে ঐন্দ্রীর বজ্রাঘাতে শত শত দৈত্য ও দানবের দেহ বিদীর্ণ হয়ে তাদের বুকের রক্তস্রোত মাটিতে প্রবাহিত হতে থাকল। সেই দৈত্য-দানবগণ বারাহীর মুখ প্রহারে বিনষ্ট, তাঁর দাঁতের আঘাতে তাদের বুক ক্ষতবিক্ষত এবং চক্রের দ্বারা বিদীর্ণ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে থাকল। নারসিংহী অন্যান্য মহাসুরগণকে নিজ সুতীক্ষ্ণ নখের দ্বারা বিদীর্ণ করে খেতে খেতে সিংহের মত গর্জন করতে করতে দশদিক ও গগনমণ্ডল কাঁপিয়ে তুলে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করতে লাগলেন। শিবদূতী প্রচণ্ড অট্টহাস্য করতে থাকলে সেই হাসির ভয়ানক শব্দে অসুরেরা ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে যেতে থাকে। আর তখন সেই মাটিতে পড়ে থাকা অসুরদের ধরে ধরে তিনি খেতে থাকলেন। এভাবে যখন ক্রুদ্ধা মাতৃগণ নানারকমভাবে মহাসুরগণকে মর্দন করতে লাগলেন, তখন অসুর সৈন্যরা তা দেখে ভয়ে পালিয়ে যেতে থাকল। মাতৃগণের মর্দনে ভীত দৈত্য সৈন্যদের পালিয়ে যেতে দেখে মহাসুর রক্তবীজ রেগে ছুটে যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসে।

সেই রক্তবীজের শরীর থেকে যখনই একবিন্দু রক্ত মাটিতে পড়ে, তখনই সেই মাটি থেকে তারই মত আর একজন বলশালী অসুরের সৃষ্টি হয়। মহাসুর রক্তবীজ যুদ্ধক্ষেত্রে এসে প্রথমেই যুদ্ধ শুরু করে ইন্দ্রশক্তি ঐন্দ্রীর সঙ্গে। ঐন্দ্রীও তাকে নিজ বজ্রাস্ত্র দ্বারা আঘাত করতে থাকেন। রক্তবীজ বজ্রের আঘাতে হয়ে যায় আহত। তার শরীর থেকে দ্রুতবেগে রক্ত ঝরতে থাকে। আর সেই রক্ত মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারই মত চেহারা ও বলবান এবং পরাক্রমশালী অসংখ্য যোদ্ধার সৃষ্টি হতে লাগল। এভাবে রক্তবীজের শরীর থেকে যত সংখ্যক রক্তবিন্দু মাটিতে পড়তে থাকে, ততই তারই মত বল ও বীর্য সম্পন্ন বীরপুরুষের সৃষ্টি হতে তাকে। সেই রক্তবীজের রক্তসম্ভূত বীরগণও যুদ্ধক্ষেত্রে মাতৃগণের সঙ্গে অতি ভীষণ অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রয়োগ করে ভয়ানকভাবে

যুদ্ধ করতে থাকে। পুনরায় যখন ঐন্দ্রীর বজ্রাঘাতে রক্তবীজের মস্তক আহত হল, তখন মাটিতে তার রক্তের ধারা বইতে থাকে। আর সেই রক্তের ধারা থেকে উৎপন্ন হতে থাকে হাজার হাজার অসুর। যুদ্ধে বৈষ্ণবী রক্তবীজকে চক্রের দ্বারা এবং ঐন্দ্রী সেই অসুরদের গদা দিয়ে আঘাত করেন। বৈষ্ণবী চক্রের আঘাতে দেহ ছিন্ন হলে রক্তবীজের রক্তস্রাব আরও বেশী পরিমাণে হতে থাকে এবং তা থেকে জন্ম নিতে থাকে আরও হাজার হাজার অসুর। ফলে সারা জগৎ অসুরে অসুরে ছেয়ে যায়। কৌমারী শক্তি অস্ত্র দ্বারা, বারাহী শক্তি অসি দিয়ে এবং মাহেশ্বরী ত্রিশূল দিয়ে মহাসুর রক্তবীজকে আঘাত করলেন এবং সেই দৈত্য মহাসুর রক্তবীজও ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তার গদা দিয়ে সকল মাতৃগণকে একে একে আলাদা আলাদা করে আঘাত করতে থাকে। দেবীগণের শক্তি ও শূল প্রভৃতি অস্ত্রের আঘাতে মহাসুর আরও আহত হয়। আহত হওয়ার ফলে তার শরীর থেকে আরও প্রবলভাবে যে রক্তক্ষরণ হতে থাকে তার ফলে জন্ম নিতে থাকে আরও শত সহস্র অসুরেরা। সেই সৃষ্ট অসুরের সংখ্যা এতই হয়ে যায় যে, তা দেখে দেবতারা অত্যন্ত ভয় পেয়ে যান। দেবতারা অসুরদের দেখে ভয় পেয়েছেন—দেবী চণ্ডিকা তা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারেন। মা দেবতাদের আশ্বস্ত করলেন। তারপর মা কালীকে বললেন— হে চামুণ্ডে, তুমি শীঘ্র তোমার বদন বিস্তৃত কর। এবং তোমার ওই বিস্তৃত মুখ দিয়ে আমার শস্ত্রের আঘাতে রক্তবীজের শরীর থেকে যে রক্তবিন্দু ঝরবে তা খেয়ে ফেলবে। সেইসঙ্গে ওই রক্তবিন্দু থেকে জন্মলাভ করা অসুরদের খেতে খেতে তুমি সারা যুদ্ধক্ষেত্র ঘুরে বেড়াও। তাহলেই এই রক্তবীজ দৈত্য ক্রমশঃ রক্তশূন্য হয়ে পড়বে। আর তাতেই তার ক্ষয় বা মৃত্যুও হবে। পরন্তু তুমি দৈত্যদের খেয়ে ফেলতে থাকলে আর উগ্র দৈত্যদের জন্ম হবে না।

দেবী চণ্ডিকা মা কালীকে ওই রকম বলেই নিজের শাণিত শূল দিয়ে রক্তবীজকে আঘাত করলেন। তখন কালী রক্তবীজের রক্ত মাটিতে পড়তে না দিয়ে সেই রক্ত খেতে লাগলেন। রক্তবীজও দেবীর শূলের আঘাতে আহত হয়ে চণ্ডীকাকে গদা দিয়ে আঘাত করে। কিন্তু তার গদার আঘাতে চণ্ডিকার সামান্যতম ব্যথারও সৃষ্টি হল না। কারণ দেবী যে চিদানন্দরূপিণী। অথচ দেবীর তীক্ষ্ণ শূলের আঘাতে অসুরের দেহ

এমনইভাবে আহত হয় যে তা থেকে প্রচুর রক্ত ঝরতে থাকে। আর দেবী চামুণ্ডা তৎক্ষণাৎ নিজ মুখ দিয়ে সেই সমস্ত রক্ত পান করে ফেললেন। কালীর মুখে রক্তবীজের রক্ত পড়েও যে সকল মহাসুরের জন্ম হল চামুণ্ডা তাদেরও তৎক্ষণাৎ খেয়ে ফেললেন। সেই সঙ্গে রক্তবীজ অসুরেরও রক্ত পান করলেন। চামুণ্ডা রক্তবীজের রক্ত পান করলে চণ্ডিকা দেবী তাকে শূল, বজ্র, বাণ, অসি ও ঋষ্টি প্রভৃতি আঘাতে বধ করলেন। মহাসুর রক্তবীজ দেবীর অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে আহত ও রক্তশূন্য হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ভূতলশায়ী তার দেহ হল নিষ্প্রাণ। তখন রক্তবীজকে মারা যেতে দেখে দেবতারা খুবই আনন্দ করতে থাকলেন। এবং তাঁদের শরীর থেকে সৃষ্ট মাতৃগণ অসুরের রক্ত পানে উন্মত্তা হয়ে নৃত্য করতে থাকলেন। দেবীকে রক্তবীজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ও কালীকে তার রক্ত খেতে দেখে 'বিষের বাঁশী'তে জাগৃহী কবিতায় কবি নজরুল লিখলেন—

সুত — মৃত্যু কাতর, হাহা অট্টহাসি
হাসে — চণ্ডী চামুণ্ডা মা সর্বনাশী।
কাল — বৈশাখী ঝঞ্ঝারে সঙ্গে করি
রণ — উন্মাদিনী নাচে রঙ্গে মরি!
উর — হার দোলে নরমুণ্ড-মালা,
করে — খড়্গ ভয়াল, আঁখে বহ্নি-জ্বালা।
নিয়া — রক্তপানের কি অগস্ত্য-তৃষা।
নাচে — ছিন্ন সে মস্তা মা, নাইক দিশা!
দেরে — রক্ত দে' রক্ত দে' রণে ক্রন্দন,
বুঝি — থেমে যায় সৃষ্টির হৃৎ-স্পন্দন।

আর রণরঙ্গিণী মাকে যুদ্ধ করতে দেখে কমলাকান্ত গাইলেন—

সমরে বিহরে, কার বামা রিপুনাশে রে।
বামা লম্ফ দিয়ে দম্ফ করে ক্ষেপা পারা হাসেরে।।
এলো থেলো চাঁচর চুল, তায় দিয়েছে জবা ফুল।
নাশিছে দানব কুল, সুধায় দুকুল ভাসেরে।।
সঙ্গে যত সহচরী এলো থেলো দিগম্বরী।
কাটা মুণ্ড তুণ্ডে করি, বেড়ায় পাশে পাশে রে।

# নিশুম্ভনাশিনি শুভদায়িনি মা

## (নিশুম্ভ বধ)

রাজা সুরথ মেধস্ ঋষিকে বলছেন—হে ভগবন্, আপনি রক্তবীজ বধ সম্বন্ধে দেবীর যে চরিত্র-মহিমা এবং তাঁর প্রভাব সম্পর্কে আমাকে শোনালেন তা সত্যিই অদ্ভুত! কিন্তু রক্তবীজ মারা গেলে অতি কুপিত শুম্ভ এবং নিশুম্ভ যা যা করেছিল তাও আমি শুনতে ইচ্ছা করি।

ঋষি রাজার অনুরোধ মত বলতে শুরু করলেন—যুদ্ধে রক্তবীজ ও অন্যান্য দৈত্যেরা মারা গেলে দৈত্যরাজ শুম্ভাসুর ও তার ভাই নিশুম্ভ অত্যন্ত কুপিত হয়ে ওঠে। তারপর অসংখ্য অসুর সৈন্যকে দেবী নিহত করায় নিশুম্ভ রাগে অস্থির হয়ে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রধান প্রধান সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে চণ্ডিকার দিকে তাড়া করে যায়। নিশুম্ভের সামনে, পিছনে ও দুই পাশে যেসব মহাসুরেরা ছিল তারাও রাগে অস্থির হয়ে অধর দংশন করতে করতে দেবীকে বধ করার জন্য ছুটে আসে। মহাবীর শুম্ভও আর চুপ করে থাকতে না পেরে সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ব্রহ্মাণী ও অন্যান্য মাতৃগণের সঙ্গে যুদ্ধ করে রাগে চণ্ডিকাকে বধ করতে এগিয়ে যায়। দেবী চণ্ডিকাকে আক্রমণ করেই শুম্ভ এবং নিশুম্ভ বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘযুগলের ন্যায় অতি ভীষণভাবে বাণ বর্ষণ পূর্বক তাঁর সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করতে লাগল। চণ্ডিকা দেবীও নিজ বাণসমূহ দিয়ে শুম্ভ এবং নিশুম্ভের নিক্ষিপ্ত সকল বাণকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন। পরন্তু সেই দুই অসুরের সারা শরীরে অস্ত্রসমূহ দিয়ে আঘাত করলেন। নিশুম্ভ তখন এক হাতে তার শাণিত খড়্গ ও অন্য হাতে উজ্জ্বল ঢাল নিয়ে চণ্ডিকার শ্রেষ্ঠ বাহন সিংহের মাথায় আঘাত করল। দেবী নিজের বাহনকে আঘাত করতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে খুরপ্রাস্ত্র দিয়ে নিশুম্ভের সেই উৎকৃষ্ট খড়্গ এবং অষ্টচন্দ্রযুক্ত ঢাল কেটে ফেললেন। ঢাল ও খড়্গকে দেবী ছিন্ন করে দেওয়ায় সেই নিশুম্ভাসুর তৎক্ষণাৎ দেবীর দিকে শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করে। অসুরের নিক্ষেপিত শক্তি অস্ত্রকে আসতে দেখেই

দেবী সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চক্র দিয়ে শক্তি অস্ত্রকে দ্বিখণ্ডিত করে দেন। নিজ শক্তি অস্ত্রকেও দ্বিখণ্ডিত হতে দেখে নিশুম্ভাসুর রাগে আগুনের মত জ্বলে ওঠে। সে এবার দেবীর দিকে এক ভীষণ শূল নিক্ষেপ করে। শূলকে ছুটে আসতে দেখেই দেবী মুষ্ট্যাঘাতে তা চুরমার করে দেন। নিজের শূলাস্ত্রকে চুরমার হতে দেখে তখন নিশুম্ভ তার ভয়ানক গদাকে ঘুরিয়ে সেটি দেবীর দিকে নিক্ষেপ করে। দেবী সেই গদাকেও তাঁর ত্রিশূলের আঘাতে ভেঙ্গে দেন এবং ভস্মীভূত করে ফেলেন। তখন সেই দৈত্য কুঠার হাতে নিয়ে দেবীকে তেড়ে আসে। দেবী সঙ্গে সঙ্গে নিশুম্ভকে বাণের আঘাতে ভূতলশায়ী করে ফেলেন। নিশুম্ভ অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

বীরবিক্রমী ভাই নিশুম্ভকে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে শুম্ভ রাগে অস্থির হয়ে ওঠে। সে তখন দেবী অম্বিকাকে বধ করার জন্য ছুটে যায়। সেই মহাবীর শুম্ভ রথে চেপে অতুলনীয় ও সুদীর্ঘ তার আট হাতে উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে আকাশমণ্ডল জুড়ে ব্যাপ্ত হয়ে শোভা পেতে থাকল। দেবী চণ্ডিকা সেই শুম্ভকে যুদ্ধে আসতে দেখেই শঙ্খধ্বনি করলেন এবং অত্যন্ত দুঃসহ ধনুষ্টঙ্কার করলেন।

প্রসঙ্গতঃ এখানে একটা কথা বলে রাখি যুদ্ধক্ষেত্রে দেবীর এই শঙ্খধ্বনি করা বা ধনুষ্টঙ্কার এগুলি নূতন কিছু নয়। সেকালে যুদ্ধে শঙ্খধ্বনি ও ধনুষ্টঙ্কার করার রীতি ছিল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়ে আছে—

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ।।
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তিপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ।।
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ।।

**দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।**
**সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্।।**

অর্থাৎ — হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্ত নামক শঙ্খ এবং ঘোরকর্মা ভীম পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজালেন। কুন্তিপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয় নামক শঙ্খ এবং নকুল ও সহদেব যথাক্রমে সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খদ্বয় বাজালেন। হে পৃথিবীপতি ধৃতরাষ্ট্র, মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা বিরাট, অপরাজিত সত্যকি, রাজা দ্রুপদ, দ্রৌপদীর (প্রতিবিন্ধ্যাদি) পঞ্চপুত্র এবং মহাবীর অভিমন্যু নিজ নিজ শঙ্খ পৃথক পৃথকভাবে বাজালেন। দেবী চণ্ডীও তেমনি যুদ্ধে সেকালের যোদ্ধাদের রীতি মেনেই এখানে শঙ্খধ্বনি করেছেন।

সে যা হোক, ঋষির মুখে আমরা যা শুনেছিলাম এখন আবার তাই শুনব। তিনি বলছেন—দেবী সকল সৈন্যদের বলহানিকর নিজ ঘন্টার শব্দে দশদিক পরিপূর্ণ করলেন। তারপর দেবীর বাহন সিংহ এমন প্রবল গর্জন করে যে, সেই গর্জনের শব্দে হাতিদেরও মদস্রাব নিবারণ হয়ে যেতে পারে। মহাসিংহের সেই ভীষণ গর্জনের ফলে আকাশ, পৃথিবী ও যুদ্ধক্ষেত্রের দশদিক পূর্ণ হয়ে গেল। সে-সময় মা কালী লাফ দিয়ে আকাশে উঠে তার দুই হাত দিয়ে মাটিতে আঘাত করলেন। মায়ের সেই আঘাতের ফলে এমন প্রবল শব্দ হল যে, তার আগে শঙ্খধ্বনি, ধনুষ্টঙ্কার, ঘন্টাধ্বনি বা মহাসিংহের গর্জনের ফলে যে সকল শব্দ হয়েছিল, তা সবই তাতে মিলিয়ে গেল। শিবদূতী শত্রুদের ভীতিজনক মহা অট্টহাস্য করলেন। তাঁর সেই মহা অট্টহাসির শব্দে অসুরেরা যেমন খুবই ভয় পেয়ে যায়, তেমনি শুম্ভও অত্যন্ত রেগে যায়। এরপর যখন দেবী অম্বিকা শুম্ভকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন— ওরে দুষ্ট থাম্ থাম্; তখন আকাশমার্গে অবস্থানকারী দেবতারা মা চণ্ডীর জয়ধ্বনি করে উঠলেন। শুম্ভ যুদ্ধক্ষেত্রে এসেই দেবীর বিরুদ্ধে অতি

ভয়ানক শিখাযুক্ত অগ্নিরাশির মত তেজোময় শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করে। সেই ভয়ানক অস্ত্র দেবীর কাছে আসতে না আসতেই দেবী তাকে মহোল্কা নামক মহা জ্বালাবতী শক্তি অস্ত্র দিয়ে বিনষ্ট করে ফেলেন।

ঋষি বলছেন— হে রাজন্, শুম্ভের প্রবল সিংহনাদে ত্রিলোকের মধ্যলোক অর্থাৎ ভুবর্লোক পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। অকস্মাৎ ঘোর বজ্রধ্বনি শুম্ভের সেই হুঙ্কার শব্দকে অভিভূত করল। শুম্ভ দেবীর প্রতি শত শত হাজারে হাজারে অস্ত্র নিক্ষেপ করে চলেছে। দেবী সে-সব অস্ত্রকে নিজ শর যোজনা করে যেমন ছিন্ন করে চলেছেন, তেমনি দেবী যে সমস্ত শর নিক্ষেপ করছেন, সেগুলিকে শুম্ভ নিজ বাণে ছিন্ন করে দিতে থাকে। তখন চণ্ডিকা প্রবল রাগান্বিতা হয়ে শুম্ভকে শূল দিয়ে আঘাত করলেন। দেবীর শূলের আঘাত সহ্য করতে না পেরে শুম্ভ আহত ও মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

এদিকে যে নিশুম্ভ এতক্ষণ অচেতন হয়ে মাটিতে পড়েছিল সে হঠাৎ চেতনা পেয়ে উঠে বসে। এবং উঠেই সে আবার হাতে ধনু নিয়ে শর দ্বারা দেবী চণ্ডিকাকে, মা কালীকে এবং সিংহকে আঘাত করতে থাকে। পুনরায় দিতির পুত্র ও দানবদের অধিপতি নিশুম্ভ দশ হাজার বাহু বিস্তার করে দেবী চণ্ডিকাকে চক্রাস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করে। তখন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে যে মা তার সকল বিপদ দূর করেন, সেই মা বিপদতারিণী, ভয়নাশিনী ভগবতী দুর্গা-ই ক্রুদ্ধা হয়ে নিশুম্ভের নিক্ষিপ্ত সেই সকল চক্র ও বাণ নিজ বাণের দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেন। তখন তা দেখে দৈত্য সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে নিশুম্ভ গদা হাতে দেবী চণ্ডিকাকেই বধ করতে তাঁর দিকে দ্রুত বেগে ধেয়ে যায়। দেবীকে সে গদা নিক্ষেপও করে। অসুরের নিক্ষিপ্ত গদা গিয়ে দেবীর মাথায় প্রায় পড়ে যায়। এমন সময় নিশুম্ভের গদাটি চণ্ডিকা দ্রুত তীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারা ছেদন করেন। নিশুম্ভ তখন শূল হাতে নেয়। তখন চণ্ডিকা অতিবেগে ঘূর্ণায়মান নিজ শূল দ্বারা শূল হাতে আগমনকারী দেবতার

শক্র নিশুম্ভের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করে দিলেন। নিশুম্ভের শূলবিদ্ধ হৃদয় থেকে মহা বলবান ও মহাবীর্যবান এক মহাসুর থাম থাম বলতে বলতে বের হয়ে আসে। দেবী চণ্ডিকা সেই অসুরকে আসতে দেখে উচ্চৈঃস্বরে অট্টহাস্য করে নিশুম্ভের হৃদয় থেকে নিঃসৃত সেই অসুরের মাথাটি খড়্গ দিয়ে খণ্ডিত করে ফেলেন। সেই অসুর দ্বিখণ্ডিত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

প্রসঙ্গতঃ মনে হয়, মা মহামায়া—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মায়া তাঁর থেকেই তো উৎপন্না। সুতরাং অসুরেরা যতই মায়াবী হোক, যতই তারা মায়াকে অবলম্বন করুক, বহুরূপ দেখাক, বহু শক্তির প্রকাশ করুক তার দ্বারা কি আর মা মহামায়াকে অভিভূত বা পরাজিত করা যায়? তাই এখানে দেখা যাচ্ছে কে জানে মা তব মায়া মহামায়ারূপিণী, বিরাজো সর্বত্র মা বিশ্বব্যাপিনী। মায়া রূপধারী অসুর সে কি-না মায়ার বলে বলী হয়ে মা মহামায়াকেই বিনাশ করতে চেয়েছিল। কিন্তু মা তাকেই বিনাশ করলেন। আমরাও তো ঋষির মুখে মধু-কৈটভ বিনাশ হওয়ার আগেই শুনেছি তিনি বলছেন—তথাপি সংসারের স্থিতিকারিণী মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ মোহরূপ গর্তে ও মমতারূপ আবর্তে নিক্ষেপিত হয়। এমনকি এই মহামায়াই জগৎপতি শ্রীবিষ্ণুর যোগনিদ্রা বা তমঃপ্রধানা শক্তি। এই শক্তিই জগতের সকল জীবকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছেন। এমনকি যাঁরা বিবেকী তাঁরাও তাঁর মহামায়া থেকে নিস্তার পান না। অথচ ওই মূঢ় অসুর সেই মহামায়াকেই মায়া রূপ ধরে বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছিল। সে কতটুকু জানে মায়ের শক্তি! অবশ্য আমরাও কি বুঝি মায়ের সেই মহামায়া—আদৌ বুঝি না। কিন্তু তবু আমাদের মনে সততই কত মিথ্যা অহঙ্কার, অভিমান, বুদ্ধির গর্ব! যার ফলে আমরা পদে পদেই বিপদে পড়ি; তবু শিক্ষা হয় না, বিবেক জাগে না, জ্ঞান হয় না। তাইতো আমাদের এত দুঃখ, অশান্তি, দুর্ভোগ। তাহলে এর থেকে বাঁচার উপায়? উপায় মায়ের করুণাভিক্ষা। আর তাঁর শ্রীচরণে

পুনঃ পুনঃ ক্ষমাপ্রার্থনা।

যাহোক, অসুর মাটিতে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবীর বাহন সেই মহাসিংহ অসুরের ঘাড় তার তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে সেটি ভক্ষণ করতে থাকে। একই রকম ভাবে মা কালী ও শিবদূতীও অন্যান্য অসুরদের ভক্ষণ করতে থাকে।

হয়তো অসুরের রক্ত, মাংস খেতে খেতে মার গায়েই রক্তের ধারা বইছে, সেই দৃশ্য দেখে মাতৃসাধক রামপ্রসাদ এই গানের মধ্যে লিখলেন—.

"হাতে মা তোর মহাপ্রলয়,
মুখে হা হা অট্টহাসি, অঙ্গ বেয়ে রক্তধারা।
তারা, ক্ষেমঙ্করী, ক্ষেমা, অভয়ে, অভয় দে মা।"

অন্যদিকে কোন কোন মহাসুর কৌমারীর শক্তি অস্ত্রের আঘাতে বিনষ্ট হয়ে যায়। অন্য কেউ কেউ ব্রহ্মাণীর প্রণবপূত জলের দ্বারা দূরীকৃত হল। আরও অনেকে মাহেশ্বরীর ত্রিশূলের আঘাতে হয় বিদীর্ণ এবং অন্যান্য অনেকে বারাহীর মুখের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। বৈষ্ণবী যেমন চক্রের দ্বারা কোন কোন দৈত্যকে খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন, তেমনি ঐন্দ্রী তাঁর হস্তাগ্র নিক্ষিপ্ত বজ্রের দ্বারা অন্য কতকগুলি দৈত্যকে খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন। সেই মহাযুদ্ধে কোন কোন অসুর মারা গেল। কোন কোন অসুর প্রাণ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেল। আবার অন্যান্য অসুরদের মা কালী, শিবদূতী ও সিংহ খেয়ে ফেললেন।

# এই জগতে একমাত্র আমিই বিরাজিতা

## (শুম্ভ বধ)

রাজা সুরথের শোনার প্রবল আগ্রহ দেখে ঋষি মেধস্ এবার বলতে শুরু করেছেন দেবীর শুম্ভ বধ-লীলার কাহিনী। আমরাও সাগ্রহে তাঁরই মুখে শুনি শুম্ভ বধের কথা।

প্রাণপ্রিয় ভাই নিশুম্ভকে দেবী সংহার করেছেন। সে শুম্ভের চোখের সামনেই মাটিতে পড়ে আছে। তার পাশাপাশি দৈত্যরাজের অসংখ্য সৈন্যও ভূতলশায়ী হয়ে রয়েছে। তাদের রক্ত-মাংস কালী, শিবদূতী, সিংহ ও শিবাগণ খাচ্ছে। ওই দৃশ্য দেখে শুম্ভের মনে প্রচণ্ড রাগের সৃষ্টি হয়। সে দেবীকে উদ্দেশ্য করে বলে—হে বলগর্বে উদ্ধতা দুর্গে, তুমি নিজের বলের জন্য গর্ব করো না। কারণ অতিগর্বিতা হয়েও অন্যান্য দেবিগণের শক্তিকে আশ্রয় করেই তুমি যুদ্ধ করছ।

অসুর অসুরই। তার দেহ-মন-বুদ্ধি সবই আসুরিক প্রবৃত্তিতে আচ্ছন্ন। সে ঘোর তমসাচ্ছন্ন। তার কি বুঝার সাধ্য আছে—মা কে? তিনি কাদের নিয়ে যুদ্ধ করছেন? মা'র সৈন্যরা কোন শক্তিতে শক্তিমান? কোন বলে বলীয়ান? কোন তেজে তেজীয়ান? তাই মা যেন তার মন-বুদ্ধির সেই তমসাকে দূর করে দিতেই বললেন—

ঐকেবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্তো মদ্‌বিভূতয়ঃ।।

অর্থাৎ, এই জগতে এক আমিই আছি। আমি ছাড়া আমার সাহায্যকারিণী আর কে আছে? ওরে দুষ্ট ভাল করে দেখ, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তি আমারই অভিন্না বিভূতি বা শক্তি। এই দেখ তারা আমার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। তখন ব্রহ্মাণী প্রমুখ সেই সমস্ত দেবীগণ অম্বিকা দেবীর শরীরে বিলীনা হয়ে গেলেন। থাকলেন বলতে একমাত্র দেবী চণ্ডিকাই। এবার দেবী বললেন, এই যুদ্ধে আমি নিজের শক্তির প্রভাবে যে বহু মূর্তিতে অবস্থান করছিলাম, তা এখন সংহরণ বা উপসংহার করে নিয়ে আমি একাই যুদ্ধক্ষেত্রে থাকলাম। তুমি যুদ্ধে স্থির হও।

প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার কথা। এখানে মা-ই যে

আদ্যাশক্তি, পরমা প্রকৃতি তা যেমন তিনি অসুরকে দেখিয়ে দিয়ে তার মনের ভ্রান্তি দূর করলেন, তেমনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণও কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে নিজ বিশ্বমূর্তি শ্রীঅর্জুনের কাছে প্রকাশ করে তাঁর সংশয় নিরসন করে বলছেন—

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতা বা ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষি কেউই আমার উৎপত্তি অবগত নন। কেন না, আমি দেবতাবৃন্দ ও মহর্ষিগণের সর্বপ্রকারে আদি কারণ।

যিনি আমাকে অনাদি, জন্মরহিত ও সর্বলোকের মহেশ্বর বলে জানেন, মানুষের মধ্যে তিনিই মোহশূন্য হয়ে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ সকল পাপ থেকে মুক্তি পান।

অন্তঃকরণের সূক্ষ্ম বিষয়ের বোধসামর্থ্য, আত্মাদি পদার্থের জ্ঞান, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ক্ষমা, সত্য, বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়ের সংযম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমচিত্ততা, সন্তোষ, তপস্যা, দান, ধর্মনিমিত্ত কীর্তি ও অধর্মনিমিত্ত অকীর্তি—এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রাণিগণের স্ব স্ব কর্ম অনুসারে আসা থেকেই উৎপন্ন হয়।

ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি, পুরাকালে সণকাদি চারজন মহর্ষি এবং স্বায়ম্ভুবাদি চৌদ্দজন মনু আমার সঙ্কল্পজাত এবং মদ্‌গতচিত্ত বলে আমার শক্তিসম্পন্ন মনুগণ ও ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষি এই জগতেই স্থাবরজঙ্গমাদি সকল প্রজা সৃষ্টি করেছেন।

আমি (বাসুদেবাখ্য ব্রহ্মমূর্তি) সমস্ত জগতের উৎপত্তিস্থান, আমা হতেই সমস্তই প্রবর্তিত হয়—একথা জেনেই তত্ত্বজ্ঞানিগণ পরমার্থতত্ত্বে অভিনিবেশ পূর্বক আমার ভজনা করেন।

এরপর শ্রীভগবান নিজের অনন্ত বিভূতির কিছুমাত্র পরিচয় দিয়ে বলছেন—

আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত প্রত্যগাত্মা এবং আমিই প্রাণিগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের স্থান। দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু নামক আদিত্য। প্রকাশকগণের মধ্যে আমি কিরণশালী সূর্য, উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে আমি মরীচি এবং আমি নক্ষত্রগণের

অধিপতি চন্দ্র। চারবেদের মধ্যে আমি সামবেদ। দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র। আমি ইন্দ্রিয় সকলের প্রবর্তক মন এবং প্রাণিদেহে অভিব্যক্ত চেতনা অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি। আমি একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে আমি কুবের। অষ্টবসুর মধ্যে আমি অগ্নি এবং উচ্চ শৃঙ্গযুক্ত পর্বত সকলের মধ্যে আমি মেরু পর্বত। আমি পুরোহিতগণের মধ্যে দেবগুরু বৃহস্পতি। সেনানায়কগণের মধ্যে আমি দেব সেনাপতি কার্তিকেয় এবং দেবখাত জলাশয়সমূহের মধ্যে আমি সাগর। মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু। শব্দসমূহের মধ্যে আমি একাক্ষর ব্রহ্মবাচক ওঁ-কার। যজ্ঞ সকলের মধ্যে আমি জপরূপ যজ্ঞ এবং স্থাবর পদার্থসমূহের মধ্যে দেবতাত্মা হিমালয়।....আমি সামসমূহের মধ্যে মোক্ষ প্রতিপাদক বৃহৎ সাম। ছন্দো বিশিষ্ট ঋক্ সমূহের মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্র। দ্বাদশ মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ এবং ষড়্ঋতুর মধ্যে পুষ্পাকর বসন্ত। আমি ছলনাকারিগণের মধ্যে অক্ষক্রীড়ারূপ ছল। তেজস্বিগণের তেজ, বিজয়িগণের বিজয়, উদ্যমকারিগণের অধ্যবসায় এবং সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের সত্ত্বগুণ। আমি বৃষ্ণি বংশীয়দের মধ্যে তোমার সখা কৃষ্ণ। পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জুন। মুনিগণের মধ্যে বেদব্যাস এবং সূক্ষ্মার্থী বিবেকীদের মধ্যে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য। শ্রীভগবান এরকম নিজ আরও বহু বিভূতির পরিচয় দিয়ে শেষে বলছেন—

**যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।**
**তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্।।**

অর্থাৎ—যা যা ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন বা উৎসাহশালী সে-সকলই আমার শক্তির অংশসম্ভূত বলেই জানবে। আরও চূড়ান্ত কথা বলছেন—

**অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।**
**বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।**

যার অর্থ—হে অর্জুন, আমার বিভূতির এত অধিক জানার তোমার প্রয়োজন কি? এটুকুই মাত্র জেনে রাখ যে, আমিই এক পাদমাত্র দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করে রয়েছি।

ভাবলে অবাকই হতে হয় যে, পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও পরমা

প্রকৃতি আদ্যাশক্তি মা নিজ নিজ স্বরূপ প্রকাশ করছেন যুদ্ধক্ষেত্রে। পার্থক্য শুধু একজন সখা, অন্যজন শত্রু। আর সে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে শ্রীশ্রীগীতার দশম অধ্যায়ে এবং শ্রীশ্রীচণ্ডীরও দশম অধ্যায়ে। তবে শ্রীভগবান বলেছেন বিস্তৃতভাবে, আর মা বলেছেন সংক্ষেপে।

যাক্ এবার আমরা আবার ঋষির মুখে শুনি দেবী ভগবতী মা-চণ্ডী ও দৈত্যরাজের মধ্যে রোমহর্ষক যুদ্ধের কথা—

ঋষি বলছেন — অন্তরীক্ষে যুদ্ধ অবলোকনকারী অর্থাৎ যাঁরা আকাশমার্গে থেকে যুদ্ধ দেখছেন সেই সমস্ত দেবতা ও ভূমিতে অবস্থানকারী অসুরগণের সামনে দেবী চণ্ডিকা ও শুম্ভ দু'জনের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হল। সে ভয়ানক যুদ্ধে উভয়েরই নিক্ষেপিত তীরে যেন বাণবৃষ্টি হতে থাকল। তদুপরি শাণিত অস্ত্র ও দারুণ অস্ত্র সমূহে উভয়ের মধ্যে ভীষণ সঙ্ঘর্ষে সমগ্র ত্রিলোকই যেন ভয় পেয়ে গেল। দেবী অম্বিকা যে-সকল শত শত দিব্য অস্ত্র অসুরের প্রতি প্রয়োগ করতে থাকলেন, দৈত্যরাজ শুম্ভ তার প্রতিষেধক অস্ত্রশস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করে সে-সবগুলিকে খণ্ডন করে দিতে থাকল। একইভাবে শুম্ভ যে সমস্ত অস্ত্র দেবীকে নিক্ষেপ করতে থাকে, সে-সকল দিব্যাস্ত্র সমূহকে দেবী হুঙ্কার শব্দাদির দ্বারাই ভেঙ্গে দিতে লাগলেন। তখন সেই অসুর শত শত শর বর্ষণ করে দেবীকে আচ্ছাদিত করে এবং সেই দেবীও তাতে ক্রোধান্বিতা হয়ে বাণসমূহ দিয়ে অসুরের শরের সঙ্গে ধনুও কেটে ফেলেন। ওইভাবে দেবীর শরে ধনুক ছিন্ন হওয়ায় দৈত্যরাজ শুম্ভ শক্তি অস্ত্র গ্রহণ করে। দেবীও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চক্র দিয়ে অসুরের হাতের শক্তি অস্ত্রকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেন। তখন দৈত্যরাজাধিরাজ শুম্ভ শত চন্দ্র চিহ্নিত ঢাল এবং সূর্যের মত উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় খড়্‌গ দিয়ে দেবীর দিকে তাড়া করে যায় ও তা দেবীর প্রতি নিক্ষেপ করে। দেবী দৈত্যের নিক্ষিপ্ত সূর্যকিরণের মত উজ্জ্বল এবং শাণিত খড়্‌গ ও ঢাল তাঁর দিকে আসতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে নিজ ধনুক থেকে তীক্ষ্ণশর সমূহ নিক্ষেপ করে সেগুলি খণ্ড খণ্ড করে ফেলেন। দৈত্যেশ্বর তখন অশ্বহীন, ভগ্নধনু ও সারথি শূন্য। সেই অবস্থায় সে দেবী অম্বিকাকে বধ করার জন্য ভীষণ মুগুর হাতে তুলে নেয়। অম্বিকা দেখছেন শুম্ভ বিরাট

মুগুর হাতে তাঁর দিকে ধেয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিশিত শরের দ্বারা সেটিকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেন। শুম্ভ তখন মুষ্টি উদ্যত করে দ্রুতবেগে দেবীর দিকে তাড়া করে যায় এবং সে গিয়ে অম্বিকা দেবীর হৃদয়ে সজোরে আঘাত করে। দেবীও শুম্ভকে তাঁর করতল দিয়ে অসুরের বুকে আঘাত করেন। সেই দৈত্যরাজ শুম্ভ দেবীর চপেটাঘাতে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আবার মহাবেগে উঠেও পড়ে। এবার শুম্ভ দেবীকে ধরে নিয়ে লাফ দিয়ে আকাশমার্গে উঠে পড়ে। সেখানে দেবী নিরালম্বনা হয়েই শুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। শূন্যমার্গে দেবী ও অসুরের সঙ্গে বাহুযুদ্ধ সিদ্ধগণ ও নারদ প্রভৃতি ঋষিগণ বিস্ময়ান্বিত হয়ে দেখছেন। দেবী অম্বিকা শুম্ভের সঙ্গে বহুক্ষণ যাবৎ বাহুযুদ্ধ করে তাকে কন্দুকবৎ শূন্যে তুলে ঘুরিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে মারলেন। দুরাত্মা শুম্ভ মাটিতে পড়েই আবার সঙ্গে সঙ্গে উঠেই মুষ্টি উদ্যত করে চণ্ডিকাকে বধ করার জন্য দ্রুতবেগে তাঁর দিকে ধেয়ে যায়। তখন দেবীও তাঁর দিকে আগমনকারী সেই দৈত্যেশ্বর শুম্ভকে তার বক্ষস্থলে ভীষণ শূলবিদ্ধ করে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলেন। শুম্ভ দেবীর শূলের অগ্রভাগের দ্বারা আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। মহাসুর মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাগর, দ্বীপ, পর্বত সব কেঁপে উঠে। শুম্ভের দেহ থেকে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়।

দুরাত্মা শুম্ভ মারা গেলে সারা বিশ্ব অত্যন্ত সুখী ও সুস্থ হয়ে উঠল। এমন-কি আকাশও নির্মল হল। শুম্ভকে দেবী বধ করার আগে যে সকল উৎপাতসূচক মেঘগুলি উল্কাবৃষ্টি করত, শুম্ভ বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে তারা হল শান্ত। নদীগুলি তাদের উৎস অভিমুখে না প্রবাহিত হয়ে পুনরায় নিজ নিজ পথে প্রবাহিত হতে থাকল। শুম্ভকে নিহত দেখে দেবতাদের হৃদয় আনন্দিত হল। বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্বগণ মধুর স্বরে গান করতে শুরু করলেন। কেউ কেউ বাদ্য বাজাতে লাগলেন। উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরাগণ নৃত্য করতে থাকলেন। চারিদিকে পুণ্য বায়ু প্রবাহিত হল। সূর্যদেব হলেন দীপ্তশালী। এবং যজ্ঞাগ্নি সকল দিকের সকল অশুভ শব্দগুলি বন্ধ করে দিয়ে সৌম্যভাবে জ্বলে উঠল।

# হে নিখিল বিশ্বজননি, তুমি প্রসন্না হও

## (দেবী-স্তুতি)

এতক্ষণ আমরা মেধস্ ঋষির শ্রীচরণতলে বসে শুনছিলাম—কিভাবে নবোদিতা রবিতুল্য প্রভাময়ী, ভুবনেশ্বরী মা চণ্ডিকা অসুরদের নিধন করছেন সেই রোমাঞ্চকর যুদ্ধ-কাহিনী। যুদ্ধে যিনি জয়া, বিজয়া নামে চির প্রসিদ্ধা তাঁরই হয়েছে বিজয়। অর্থাৎ দেবতারা হলেন নিষ্কন্টক, হলেন শত্রুমুক্ত। যে শত্রুদের ভয়ে তাঁরা তাঁদের প্রিয় স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে গিরিগহ্বরে অশেষ দুঃখে দিন যাপন করছিলেন, সেই শত্রুরা আজ মায়ের শাণিত অসির আঘাতে ভূতলশায়ী। মা কালী, শিবদূতী, শিবাগণ তাদের রক্ত-মাংস আনন্দ সহকারে খাচ্ছেন। স্বভাবতই দেবতাদের আজ আর আনন্দের শেষ নেই। তাঁদের আজ মহা আনন্দের দিন। সুতরাং যে মায়ের জন্য তাঁরা শত্রুমুক্ত হলেন, স্ব-রাজ্য ফিরে পেলেন, হলেন অসুরদের অত্যাচার থেকে মুক্ত তাঁর প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতারও শেস নেই। যুদ্ধজয়ের আনন্দে, শত্রুপতনের আনন্দে দেবতারা শুরু করেছেন অসুর বিমর্দিনী, জগন্মাতার স্তব। এখন ঋষির মুখেই আমরা দেবতারা কিভাবে মায়ের স্তব করলেন তা শুনব। ঋষি বলছেন—

সেই যুদ্ধে অসুরদের অধিপতি শুম্ভ নিহত হলে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, পবন প্রমুখ দেবতারা শুম্ভবধরূপ অভীষ্ট সফল হওয়ার জন্য আনন্দিত মনে সকল দিক্ উদ্ভাসিত করে দেবী কাত্যায়নীকে স্তব করতে লাগলেন। দেবতারা দেবীর স্তব করে বলছেন—

হে ভক্তের দুঃখহারিণী দেবি, তুমি প্রসন্না হও। হে নিখিল বিশ্বজননি, তুমি প্রসন্না হও। হে বিশ্বেশ্বরি তুমি প্রসন্না হয়ে বিশ্বকে পালন কর। হে দেবি তুমিই তো এই চরাচর জগতের অধীশ্বরী। হে অপ্রতিহত বীর্যশালিনি দেবি, তুমি একাই জগতের আশ্রয় স্বরূপা, কারণ যেহেতু তুমি পৃথিবীরূপে বিরাজিতা। তুমিই জগৎরূপে অবস্থিতা হয়ে এই সারা জগৎকে পরিপুষ্ট করছ। অতএব তুমি সর্বাত্মিকা। হে দেবি,

তুমি অনন্ত বীর্যময়ী বৈষ্ণবী শক্তি। তুমিই জগতের বিশ্বের আদি কারণ মহামায়া। তুমিই এই সমগ্র জগতকে মোহিত করে রেখেছ। আবার তুমি প্রসন্না হলে ইহলোকে তোমার কৃপায় শরণাগত ভক্ত মুক্তি লাভ করে। হে দেবি, বেদ প্রভৃতি অষ্টাদশ বিদ্যা তোমারই অংশ। কলাবিদ্যা সমন্বিত এবং পাতিব্রত্যাদি গুণবিশিষ্টা সকল নারীই তোমারই বিগ্রহ স্বরূপা। তুমিই জননীরূপা হয়ে একাই এই ত্রিজগতের অন্তরে ও বাইরে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছ। স্তুতি বিষয়ে মুখ্য ও গৌণ বা প্রধান ও অপ্রধান সব কিছুই তো তুমি। অর্থাৎ তুমি যখন সকল উক্তিরূপা, তখন তোমার এরকম স্তুতি আর কি হতে পারে? তুমি সর্বভূতস্বরূপা। স্বর্গ ও মুক্তিদায়িনী এবং প্রকাশরূপিণী। এভাবে যখন তোমার স্তব করা হয়, তখন তোমার স্তবের উপযোগী শ্রেষ্ঠ বাক্য আর কি-ই বা হতে পারে? হে দেবি, তুমি সকল লোকের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা এবং স্বর্গ ও মুক্তি প্রদায়িনী। হে দেবি নারায়ণি, তোমাকে আমরা ভক্তিভরে প্রণাম করি। হে দেবি, তুমিই কলা, কাষ্ঠা ইত্যাদি সূক্ষ্ম কালরূপে জগতের পরিণামদায়িত্রী এবং জগতের ধ্বংস সাধনে সমর্থা। হে দেবি নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম করি। হে দেবি, তুমি সকল মঙ্গলের মঙ্গলরূপিণী, কল্যাণময়ী, সর্বাভীষ্টপূরিকা, সকলের আশ্রয় স্বরূপিণী ও ত্রিনয়না। হে গৌরি, হে মাতঃ তোমাকে বার বার প্রণাম করি। হে দেবি তুমি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের শক্তিরূপিণী। অর্থাৎ তুমি শৈবী, বৈষ্ণবী ও ব্রাহ্মী। তুমিই সনাতনী ও ত্রিগুণময়ী। হে নারায়ণি তোমাকে প্রণাম। হে দেবি তুমি শরণাগত, দীন ও আর্তজনের রক্ষাকারিণী এবং সকলের দুঃখনাশিনী। হে নারায়ণি তোমাকে বার বার প্রণাম করি। হে দেবি, তুমি ব্রহ্মাণীরূপে হংসযুক্তা বিমানে অবস্থিতা হয়ে কমণ্ডলু থেকে জলসিঞ্চন করে দৈত্যদের হতবীর্য কর। হে মাতঃ নারায়ণি, তোমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি। হে দেবি, তুমি মাহেশ্বরীরূপে ত্রিশূল, চন্দ্রকলা ও সর্পধারিণী এবং মহাবৃষ তোমার বাহন। তুমি মহেশ্বর শক্তিরূপা। তোমায় পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। হে দেবি, তুমি ময়ূর ও কুক্কুট বেষ্টিতা মহাশক্তিধারিণী। তুমি নিত্য শুদ্ধা এবং তুমি কৌমারী শক্তিরূপিণী।

হে মাতঃ নারায়ণি, তোমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি। দেবি, তুমি শঙ্খ, চক্র, গদা ও শার্ঙ্গ ধনু এ-সকল মহা অস্ত্র ধারণ করে রয়েছ। তুমি বৈষ্ণবী শক্তি। হে মাতঃ নারায়ণি, তুমি প্রসন্না হও। তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। হে দেবি, তুমি ভীষণ মহাচক্রধারিণী এবং বরাহরূপে জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধারকারিণী, তুমি মঙ্গলময়ী। হে মাতঃ নারায়ণি তোমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি। হে দেবি, ভয়ঙ্কর নরসিংহ মূর্তি ধরে তুমিই দৈত্যগণকে বধ করতে উদ্যতা হয়েছিলে। তুমিই ত্রিভুবনকে রক্ষা কর। হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম। হে দেবি, তুমি মুকুটধারিণী ও মহা বজ্রধারিণী। তুমি সহস্র নয়নে দীপ্তিময়ী। তুমি বৃত্রাসুরের প্রাণ হরণকারিণী। তুমিই ইন্দ্রশক্তি স্বরূপিণী। হে দেবি, তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। দেবি, তুমি শিবদূতীরূপে বিশাল অসুর সৈন্যকে বিনাশ করেছ। তুমি ভয়ঙ্কর মূর্তিধারিণী ও ভীষণ গর্জনকারিণী। হে মাতঃ নারায়ণি তোমাকে ভক্তি ভরে প্রণাম করি। হে চামুণ্ডে দেবি, তুমি বিকট দন্ত বিশিষ্টা। তুমি ভীষণ বদনা। তুমি নরমুণ্ডমালিনী ও মুণ্ডাসুরনাশিনী। হে মাতঃ নারায়ণি, তোমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি। হে দেবি, তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই লজ্জা, তুমি ব্রহ্মবিদ্যা, তুমি শ্রদ্ধা, তুমি পুষ্টি ও তুমিই স্বধারূপিণী। দেবি, তুমি নিত্যা, তুমি মহাপ্রলয় রূপা রাত্রি ও মহামোহরূপা অবিদ্যা। হে নারায়ণি তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। হে দেবি, তুমি মেধা, তুমি বিদ্যাদাত্রী সরস্বতী। তুমি শ্রেষ্ঠা, তুমি সত্ত্বগুণময়ী, রজোগুণময়ী ও তমোগুণময়ী। তুমি দৈবশক্তি এবং ঈশ্বরী। তুমি প্রসন্না হও। হে মাতঃ নারায়ণি, তোমাকে বারংবার প্রণাম করি। হে দেবি, তুমি সর্বস্বরূপা, সর্বেশ্বরী ও সর্বশক্তিময়ী। তুমি আমাদের সকল ভয় থেকে পরিত্রাণ কর। হে মাতঃ দুর্গে তোমাকে ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রণাম করি। দেবি কাত্যায়নি, তোমার ত্রিনয়ন শোভিত সৌম্য বদন আমাদের সকল প্রাণী থেকে রক্ষা করুক। হে মাতঃ তোমায় ভক্তি ভরে প্রণাম করি। হে দেবি, ভদ্রকালি, প্রচণ্ড দীপ্তিমান, অতি তীক্ষ্ণ, অসংখ্য অসুর বিনাশকারী তোমার ত্রিশূল আমাদের সকল রকম ভয় থেকে রক্ষা করুক। তোমাকে প্রণাম। দেবি, তোমার যে ঘন্টার ধ্বনি

জগতকে পরিপূর্ণ করে দৈত্যদের তেজ হরণ করে, তা মা যেমন পুত্রকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেন, সেরকমই আমাদের সকল পাপ থেকে রক্ষা করুক। চণ্ডিকে, তোমার হস্তস্থিত তেজোময় এবং রক্ত ও মেদরূপ কাদায় লিপ্ত খড়্গ আমাদের কল্যাণ সাধন করুক। তোমার শ্রীচরণে আমরা প্রণাম করি। হে দেবি, তুমি সন্তুষ্টা হলে সকল রকম রোগ বিনাশ করে দাও। আবার তুমি রুষ্টা হলে সকল কাম্যবস্তু বিনষ্ট কর। তোমার আশ্রিত লোকেদের কোনরকম বিপদ হয় না। যাঁরা তোমার শ্রীচরণাশ্রিত তাঁরা অন্য সকলেরও আশ্রয়যোগ্য হন। হে দেবি সম্প্রতি তুমি ব্রাহ্মী প্রভৃতি ও কালি ইত্যাদি মূর্তিতে নিজ স্বরূপ বহু রকমে প্রকটিত করে ধর্মবিদ্বেষী মহাসুরগণের এই যে বিনাশসাধন করলে, অম্বিকে তা তুমি ভিন্ন অন্য কার পক্ষে সম্ভব হতে পারে? হে দেবি, নানারকম বিদ্যায়, শাস্ত্রজ্ঞানে, উপনিষদ প্রভৃতি বিবেকবিদ্যায় এবং আদিশাস্ত্র বেদবিদ্যায় মানুষকে তুমি ভিন্ন আর কে প্রবর্তিত করতে সমর্থা? আবার গভীর অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে ও মমতাপূর্ণ সংসারগর্তে মানুষকে তুমি ছাড়া আর কে বার বার ভ্রমণ করাতে পারে? হে দেবি, যেখানে রাক্ষসগণ ও তীব্র বিষধর সর্প সকল আছে, যেখানে শত্রুগণ, দস্যুদল ও দাবাগ্নি রয়েছে, সে সকল স্থানে এবং সমুদ্রের বুকে সর্বত্র তুমি অবস্থান করে জগতকে পরিপালন করছ। হে বিশ্বেশ্বরি, তুমিই জগতকে প্রতিপালন করছ। তুমি বিশ্বরূপা, সেজন্য বিশ্বকে ধরে রেখেছ। তুমি ব্রহ্মা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেবতাগণেরও বন্দনীয়া। যাঁরা ভক্তিপূর্ণ চিত্তে তোমার শরণাপন্ন হয়, তাঁরা বিশ্বের আশ্রয়স্থল হন। হে দেবি, তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্না হও। সম্প্রতি তুমি যেরকম ক্ষণকালের মধ্যেই অসুরগণকে বধ করে আমাদের রক্ষা করলে, সেরকম ভবিষ্যতেও সব সময় আমাদেরকে শত্রুর ভয় থেকে রক্ষা করো। হে দেবি, তুমি কৃপা করে জগতের সমস্ত পাপ ও অধর্মের পরিণামে উৎপন্ন দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি উপদ্রব সকল শীঘ্র নাশ কর। হে জগতের দুঃখহারিণি দেবি। তুমি প্রণত ভক্তগণের প্রতি প্রসন্না হও। হে ত্রিভুবনবাসিগণের আরাধ্য দেবি, তুমি সকল লোকের প্রতি বরদায়িনী হও।

প্রসঙ্গতঃ একটা কথা মনে হয়—

শ্রীশ্রীচণ্ডীর সঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার সাদৃশ্য কতখানি। এখানে আমরা যেমন দেখছি দেবগণ অসুরের সঙ্গে দেবী অম্বিকার যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করে তাঁর বিরাট রূপও বিশ্বমূর্তি দেখে মায়ের স্তুতি করছেন, সেখানেও তেমনি কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে যুদ্ধবিমুখ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবুদ্ধ করতে অর্জুনের কাছে শ্রীভগবান নিজ বিশ্বরূপের প্রকাশ করেছেন। অর্জুন সেই রূপ দেখে বিস্মিত ও স্তম্ভিত। তিনি শ্রীভগবানের শ্রীচরণতলে করজোড়ে স্তব করছেন। যেমন শ্রীশ্রীচণ্ডীতে স্তব করছেন মায়ের শ্রীচরণে প্রণত দেবগণ। আর দুটি ঘটনাই দুই গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়েই। যদিও একটি যুদ্ধের শেষে এবং অন্যটি যুদ্ধ শুরুর পূর্বে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবতারা যেমন দেবী অম্বিকাকে আদ্যাশক্তি, মহাশক্তি, সর্বশক্তিসম্পন্না, সকল কার্যের কারণ, তিনিই সৃষ্টিকারিণী, পালন কারিণী এবং তিনি ধ্বংসকারিণী ইত্যাদি বলে বন্দনা করেছেন, তেমনি অর্জুনও ভগবানকে সেভাবেই বন্দনা করেছেন। যার দ্বারা শ্রীভগবানের সর্বশক্তিমানতা, তিনিই সব কিছুর আদি, তিনিই জগতের একমাত্র শক্তি, তিনি আদি, মধ্য, অন্ত ইত্যাদি বলে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে শ্রীঅর্জুন শ্রীভগবানের শ্রীচরণে বসে যে স্তব করেছেন তার কিছু তুলে ধরছি।

হে দেব, আপনার এই বিশ্বরূপে সকল দেবতা, চরাচর জগৎ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ, বাসুকি প্রভৃতি সর্পসকল ও পৃথিবী পদ্মের মেরুকর্ণিকাসনে অবস্থিত সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে দেখছি। হে বিশ্বেশ্বর, সর্বত্র বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্র বিশিষ্ট আপনার বিরাট মূর্তি দেখছি। হে বিশ্বরূপ আমি আপনার আদি, মধ্য ও অন্ত দেখছি না। কিরীট, গদা ও চক্রধারী, সর্বত্র দীপ্তিমান, তেজঃপুঞ্জ স্বরূপ দুর্নিরীক্ষ্য। প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের মত প্রভাবিশিষ্ট এবং অপ্রমেয়স্বরূপ আপনাকে আমি সর্বত্র দেখছি। আপনি পরব্রহ্ম এবং একমাত্র জ্ঞাতব্য। আপনি বিশ্বের পরম আশ্রয় ও সনাতন ধর্মের রক্ষক। আপনি সনাতন পরমাত্মা—ইহাই আমার অভিমত—

**ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং**
**ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।**
**ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা**
**সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে।।**

আরও বলছেন—আমি দেখছি, আপনার আদি, মধ্য ও অন্ত নেই। আপনি অনন্ত শক্তিশালী ও অসংখ্য বাহুবিশিষ্ট; চন্দ্র ও সূর্য আপনার নেত্র। আপনার মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত অগ্নির জ্যোতিঃ এবং আপনি নিজ তেজে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করছেন। হে ভগবন, স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ এবং দশদিক আপনি পরিব্যাপ্ত করে আছেন। আকাশের এই অদ্ভুত উগ্র বিশ্বরূপ দেখে ত্রিলোক অত্যন্ত ভীত হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ভূভারহরণার্থ ধরাতলে অবতীর্ণ ওই যুধ্যমান মনুষ্যদেহধারী বসু আদি দেবতাগণ আপনাতেই প্রবেশ করছেন। কেউ কেউ ভয় পেয়ে করজোড়ে আপনার গুণগান করছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ জগতের কল্যাণ হোক বলে প্রচুর স্তুতি বাক্য দ্বারা আপনার স্তব করছেন। যেমন নদী সমূহের বহু জলস্রোত সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে দ্রুতবেগে সমুদ্রে বিলীন হয়, সেরকম এই বীরপুরুষগণ আপনার সর্বত্র প্রজ্জ্বলন্ত মুখবিবরে প্রবেশ করছেন। যেমন পতঙ্গগণ দ্রুতগতিতে ধাবিত হয়ে মরণের জন্যই জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেরকম এই লোক সকলও মৃত্যুর নিমিত্ত অতিবেগে আপনার মুখগহ্বর সমূহে প্রবেশ করছেন। উগ্রমূর্তি আপনি কে? আমাকে বলুন। আপনাকে প্রণাম করি। হে দেবশ্রেষ্ঠ প্রসন্ন হোন। আদি পুরুষ আপনাকে আমি জানতে ইচ্ছা করি। কারণ আপনার প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারছি না। তারপরেও আবার বলছেন—হে মহাত্মা, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, আপনি ব্রহ্মারও গুরু এবং আদি কারণ। আপনাকে সকলে কেন নমস্কার করবেন না? যাহা ব্যক্ত ও যাহা অব্যক্ত তা আপনি এবং এই উভয়ের অতীত যে অক্ষর ব্রহ্ম তাও আপনি। আপনি ভিন্ন ত্রিভুবনে কিছু নেই। হে অনন্ত রূপ, আপনি আদিদেব ও অনাদি পুরুষ এবং বিশ্বের পরম প্রলয় স্থান। যা কিছু বেদ্য, তৎসমূহে বেদিত আপনি। যা কিছু বেদ্য তাও আপনি।

আপনি পরম ধাম এবং আপনিই জগতকে পরিব্যাপ্ত করে আছেন—

**ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-**
**স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।**
**বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম**
**ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।।**

আপনি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ ও চন্দ্র। আপনি কশ্যপাদি প্রজাপতিরূপ লোকপিতা এবং পিতামহ ব্রহ্মারও জনক। আপনাকে সহস্রবার নমস্কার করি। আপনাকে পুনরায় নমস্কার করি। আবার আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। হে সর্বাত্মা, আপনাকে সম্মুখে নমস্কার করছি। আপনাকে পশ্চাতে নমস্কার করছি। আপনাকে সকল দিক থেকে নমস্কার করছি। হে অনন্ত বীর্য, আপনি অসীম বিক্রমশালী, আপনি সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন, অতএব আপনি সর্বস্বরূপ। আপনি ভিন্ন অন্য কিছুরই স্বতন্ত্র সত্তা নেই। হে অমিত প্রভাব, আপনি এই চরাচর জগতের স্রষ্টা। পূজ্য, গুরু এবং গুরুরও গুরু। অতএব, ত্রিভুবনে আপনার সমান আর কেউ নেই। ত্রিভুবনে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ অন্য কে হতে পারে? ..... ইত্যাদি অনেক স্তব করেন;—যার মধ্য দিয়ে শ্রীভগবানই যে জগতের একমাত্র শক্তি, কার্য, কারণ, সবই যে তিনি তাই প্রমাণিত হয়। যেমন প্রমাণিত হয়েছে দেবতাদের দ্বারা মায়ের স্তুতির মাধ্যমে মায়ের সর্বব্যাপকতা ও আদ্যাশক্তি রূপটি।

যাহোক, এখন আমরা আবার ঋষির চরণতলে বসে শুনি দেবতাদের স্তবে জগজ্জননী মা প্রসন্না হলেন কি-না, বা প্রসন্না হয়ে তিনি কি করলেন—ইত্যাদি কথা।

দেবী বলছেন, হে দেবতাগণ, আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। তোমাদের বর দিতে চাই। জগতের কল্যাণের জন্য তোমরা যেমন খুশী বর প্রার্থনা কর। আমি তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত বরই প্রদান করব।

দেবতারা দেবী চণ্ডিকার কথা শুনে বললেন—হে অখিলেশ্বরি, তুমি এখন আমাদের শত্রুকে বিনাশ করে যেরকম ত্রিভুবনের সকল বিঘ্নের প্রশমন করলে ভবিষ্যতেও কৃপা করে তেমনটিই করবে।

দেবী বললেন—বৈবস্বত মনুর অধিকারের সময়ে (সপ্তম মন্বন্তরে) অষ্টা-বিংশতিতম চতুর্যুগে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে অন্য দুই মহাসুরের সৃষ্টি হবে, তখন আমি নন্দগোপ গৃহে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে বিন্ধ্যাচলে অবস্থান পূর্বক সেই দুই অসুরকে বিনাশ করব। পুনরায় আমি অতি ভয়ঙ্করী মূর্তিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হয়ে বিপ্রচিত্তি-বংশীয় দানবদের বধ করব। সে-সকল উগ্রস্বভাব বিপ্রচিত্তি বংশীয়দের ভক্ষণ করতে করতে আমার দাঁতগুলি দাড়িম্বযুগলের মত রক্তবর্ণ হবে। সেজন্য স্বর্গে দেবতাগণ ও মর্ত্যে মানবগণ আমাকে স্তব করতে করতে সবসময় রক্তদন্তিকা নামে কীর্তন করবে। পুনরায় শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির কারণে পৃথিবী জলশূন্যা হলে মুনিগণের স্তবে আমি জলশূন্য পৃথিবীতে অযোনি সম্ভবা রূপে আবির্ভূতা হব। তখন আমার স্তবকারী মুনিদের আমি শতনয়ন দ্বারা নিরীক্ষণ করব। সে কারণে মনুষ্যগণ আমাকে শতাক্ষী বলে কীর্তন করবে। হে দেবগণ, তখন আমি আমার দেহ থেকে উৎপন্ন পত্রাদি শাক দ্বারা যতদিন না বৃষ্টি হয়, ততদিন পর্যন্ত সারা জগতকে পালন করব। আর তখন আমি পৃথিবীতে শাকম্ভরী নামে বিখ্যাত হব। আর সে-সময় অর্থাৎ শাকম্ভরী অবতারে দুর্গম নামক মহাসুরকে বধ করব। সেকারণে আমি জগতে দুর্গাদেবী নামে প্রসিদ্ধা হব। পুনরায় যখন আমি হিমালয়ে ভীষণ মূর্তি ধারণ করে মুনিগণের পরিত্রাণের জন্য রাক্ষসগণকে বিনাশ করব, তখন সমস্ত মুনিগণ প্রণত দেহে আমার স্তব করবেন। এজন্য আমি ভীমাদেবী নামে বিখ্যাত হব। এরপর যখন অরুণ নামক অসুর ত্রিভুবনে মহা বিঘ্ন উৎপাদন করবে, সে সময় আমি অসংখ্য ভ্রমরবিশিষ্ট ভ্রামরী মূর্তি ধরে ত্রিভুবনের মঙ্গলের জন্য সেই মহাসুরকে বধ করব। সেজন্য সকলে সর্বত্র আমাকে ভ্রামরী নামে স্তব করবে। এই রূপে যখন যখনই জগতে দানবগণের প্রাদুর্ভাববশতঃ উপদ্রব উপস্থিত হবে, তখন-তখনই আমি অবতীর্ণা হয়ে দেবশত্রু অসুরগণকে বিনাশ করব।

**ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।**
**তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।। (শ্রীশ্রীচণ্ডী)**

প্রসঙ্গতঃ মায়ের শেষের এই আশ্বাস বাক্যটি শুনে মনে এসে যায়—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই আশ্বাস বাক্যেরই কথা। তিনি বলেছেন—

**যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।**
**অভ্যুত্থানম্ অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।**
**পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।**
**ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।** (৪/৭-৮)

অর্থাৎ—হে ভারত, যখন প্রাণিগণের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের কারণ বর্ণাশ্রমাদি ধর্মের অধঃপতন ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজ মায়াবলে যেন দেহবান হই, যেন জাত হই।

সাধুদের রক্ষার জন্য, দুষ্টদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে নরাদিরূপে অবতীর্ণ হই।

যা-হোক, মায়ের ওই অভয় আশ্বাস পেয়ে দেবতাদের যেমন দেশে যতই আসুরিক শক্তির প্রাদুর্ভাব হোক আর কোন ভয় নেই, তেমনি আমাদেরও কোনো ভয় নেই। মা-ই আমাদের রক্ষা করবেন। এখন সেই অপার আনন্দে আমরা গাইব সঙ্ঘ-সঙ্গীত—

জয় জয় জয় জয়। আর নাহি কোন ভয়
অভয়া মোদের দিয়েছেন অভয় মৃত্যুঞ্জয় সাথে।
আগুয়ান, আগুয়ান! ওরে রে তরুণ প্রাণ।
শোন্ পেতে কান মহা আহ্বান
জীবনেরি সুপ্রভাতে।।
ওরে রে সন্তান আয় ছুটে চলে,
আর কত রবি মাতৃস্মৃতি ভুলে?
প্রাণ ভরে আজি ডাকি মা-মা বলে
জাগাব সুপ্ত মেদিনী।।
মাতৃ নামের এমনি শৌর্য্য
জাগিবে বক্ষে অমর বীর্য্য
মা যে অসুরমর্দিনী।...

## জগন্মাতার করুণায় সফল মনোরথ সুরথ-সমাধি

এতক্ষণ আমরা ঋষি মেধসের শ্রীমুখে দেবী চণ্ডিকা কিভাবে অসুর সংহার করেছেন,—সেকথা শুনেছি। আমরাও চাই অসুর বিনাশ। তাই অসুর বিনাশের কাহিনীতে আমরাও আনন্দিত। এবার আমরা তাঁরই মুখে শুনবো কিভাবে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য মায়ের পূজো করে মায়ের বরলাভ করলেন—সেই চিত্তাকর্ষক কাহিনী। ঋষিবর তো আমাদের রাজা সুরথ ও সমাধির প্রসঙ্গ দিয়েই গল্পে শ্রীশ্রীচণ্ডী বলার কথা শুরু করেছিলেন। সুতরাং শেষ পর্যন্ত তাঁদের কি হল তা জানার জন্য তো আমাদের মনে অনেকক্ষণ ধরেই কৌতুহল। আমরা সেই কৌতুহল মনের মধ্যে চেপে রেখেছি—তাই না? তাহলে এবার শুনি ঋষি কি বলছেন।

মেধস্ ঋষি বললেন—হে রাজন্। এই যে উত্তম সর্বার্থসাধক দেবীমাহাত্ম্য তোমাকে বললাম, সেই দেবীর মহিমা এরকমই। তিনিই এই নিখিল বিশ্ব ধারণ করে আছেন। সেই বিষ্ণুমায়াই আবার করুণা করে মানুষকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করে থাকেন। তিনিই তোমাকে, এই বৈশ্যকে এবং অন্যান্য বিবেকাভিমানী পণ্ডিতগণকে আগে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছেন, এবং এখনও মোহগ্রস্ত করছেন এবং পরবর্তীকালেও মোহযুক্ত করবেন। হে মহারাজ সেই ভগবতী পরমেশ্বরীরই তোমরা শরণাগত হও। তাঁকে ভক্তিভরে আরাধনা করলে তিনিই ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে স্বর্গসুখ ও মুক্তিপ্রদান করবেন।

মার্কণ্ডেয় মুনির কথা কি স্মরণে আছে। থাকা দরকার। কারণ প্রথমেই বলেছি আমরা যে শ্রীশ্রীচণ্ডীর লীলামাহাত্ম্য শুনছি তা কিন্তু সরাসরি সেই ঋষি মার্কণ্ডেয়র মুখ থেকেই। তিনিই তো এই গল্প শোনাচ্ছিলেন তাঁর শিষ্য ভাগুরিকে।

যাহোক, মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁর শিষ্য ভাগুরিকে বললেন—হে মহামুনি ভাগুরি, মেধস্ ঋষির ওই রকম কথা শুনে রাজা সুরথ তাঁর শত্রুদের

দ্বারা অপহৃত রাজ্য উদ্ধারের জন্য এবং সমাধি নামক বৈশ্য পুত্র-মিত্র-কলত্রাদির প্রতি অধিক মমতাকে ছিন্ন করার জন্য বৈরাগ্যবান হয়ে মেধস্ ঋষির উপদেশ অনুযায়ী কঠোর ব্রতনিষ্ঠ মহাত্মা সেই ঋষিকে প্রণামপূর্বক তৎক্ষণাৎ তপস্যা করার জন্য যাত্রা করবেন বলে মনে ঠিক করেছেন।

কিন্তু যাওয়ার আগে রাজা সুরথ মেধস্ ঋষিকে করজোড়ে জিজ্ঞাসা করছেন, হে ভগবন্ দেবী চণ্ডিকার অবতার সমূহের কথা তো আপনি আমাদের সুন্দরভাবেই বলেছেন। হে ব্রহ্মণ্ এঁদের প্রধান প্রকৃতির (প্রাধানিক রহস্যের) কথা এখন আমাকে কৃপা করে বলুন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনাকে আমি প্রণাম করছি। দেবীকে যে স্বরূপে এবং যে বিধিতে আরাধনা করা উচিত তা আমাকে যথাযথভাবে বলুন।

মেধস্ ঋষি বললেন, হে রাজন্, তুমি যা জানতে চাইছ তা পরম গোপন রহস্য। একে অনাখ্যেয় অর্থাৎ অত্যন্ত গোপনীয় বলা হয়। তা-কি সহজেই কাউকে বলা উচিত? কিন্তু যেহেতু তুমি দেবীর একান্ত ভক্ত, সেজন্য তোমাকে আমার না বলার কিছু নেই। তাহলে শোন—

ত্রিগুণময়ী পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মীই সকল কারণের আদি কারণ। তিনিই লক্ষ্যা ও অলক্ষ্যা বা দৃশ্য ও অদৃশ্য রূপে সারা বিশ্ব জুড়ে রয়েছেন। এই দেবীর চার হাতে লেবু বা শ্রীফল, গদা, ঢাল ও পানপাত্র আর মাথায় নাগ, লিঙ্গ ও যোনি ধারণ করেন। (নাগ অর্থাৎ ব্রহ্মার চিহ্ন, লিঙ্গ অর্থাৎ শিবের পুং চিহ্ন এবং যোনি অর্থাৎ বিষ্ণুর স্ত্রী চিহ্ন)। তাঁর দেহের বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের মত। তিনি তপ্ত স্বর্ণময় অলঙ্কারে ভূষিতা। দেবী নিজ তেজে এই শূন্য অর্থাৎ মহাকাশ পরিপূর্ণ করে রয়েছেন। পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী এই সারা বিশ্বকে শূন্য দেখে কেবল তমোগুণ দ্বারা আর এক উৎকৃষ্ট রূপ ধারণ করেছিলেন। সেই উৎকৃষ্ট রূপ মহাকালী রূপে প্রকাশ পান। তাঁর শরীরের কান্তি ঘন অঞ্জনতুল্য গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ কালো। তাঁর মুখমণ্ডল সুন্দর দন্ত পংক্তিতে সুশোভিতা এবং তিনি বিশালনয়না ও মধ্যম অবয়বা হলেন। তাঁর চার হাতে খড়্গ,

পানপাত্র, ঢাল ও নরমুণ্ডে শোভিত। তিনি বক্ষোদেশে মালা ও মাথায় মুণ্ডমালা ধারণ করেন। সেই নারীশ্রেষ্ঠা তামসী মহাকালী দেবীকে মহালক্ষ্মী বললেন—তোমার যেমন যেমন কাজ আছে, সেই অনুযায়ী তোমার নামকরণ করছি। তুমি মহামায়া, মহাকালী, মহামারী, ক্ষুধা, তৃষা, নিদ্রা, একবীরা, কালরাত্রি এবং দুরত্যয়া—তোমার এই নামগুলি তোমার কর্ম অনুযায়ী প্রতিপাদ্য অর্থাৎ প্রসিদ্ধ। নাম অনুযায়ী তোমার এসব কর্ম জেনে যিনি চণ্ডীপাঠ করেন তিনি সুখলাভ করেন। হে রাজন্ মহাকালীকে একথা বলে মহালক্ষ্মী অতি শুদ্ধা সত্ত্বগুণ দ্বারা অন্য আর এক রূপ ধারণ করলেন; যা চন্দ্রের মত গৌরবর্ণা (মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতীর রূপ ধরলেন)। সেই শ্রেষ্ঠা নারী মহাসরস্বতী নিজ হাতে অক্ষমালা, অঙ্কুশ, বীণা ও পুস্তক ধারণ করেছেন। মহালক্ষ্মী তাঁকেও মহাবিদ্যা, মহাবাণী, ভারতী, বাক্, সরস্বতী, আর্যা, ব্রাহ্মী, কামধেনু, বেদগর্ভা ও ঈশ্বরী (সুরেশ্বরী) এসব নাম দিলেন। তারপর মহালক্ষ্মী, মহাকালী ও মহাসরস্বতীকে বললেন, তোমরা উভয়ে নিজ নিজ অনুরূপ এক দেব (পুরুষ) ও এক দেবী (নারী) সৃষ্টি কর। তাদের ওই কথা বলে মহালক্ষ্মী নিজেই একটি পুরুষ ও তাঁর অনুরূপ একটি নারী সৃষ্টি করলেন। এঁরা দু'জনে হিরণ্য গর্ভ (বা বিশুদ্ধ জ্ঞান দেহ), সুন্দর ও কমলাসনে বিরাজিত। তারপর মহালক্ষ্মী সেই পুরুষকে ব্রহ্মা, বিধি, বিরিঞ্চি ও ধাতা বলে সম্বোধন করলেন এবং সেই নারীকে শ্রী, পদ্মা, কমলা, লক্ষ্মী ও মাতা—এই সকল নাম রাখলেন। তারপর মহাকালী ও ভারতী যে যে পুরুষ ও নারীযুগল সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের নাম ও রূপ ছিল এরকমই—মহাকালী—শ্বেতবর্ণা, নারী এবং নীলকণ্ঠ, রক্তবালু শ্বেতাঙ্গ ও ললাটে চন্দ্রবিশিষ্ট পুরুষ সৃষ্টি করলেন। সেই পুরুষ রুদ্র, শঙ্কর, স্থাণু, কপর্দী-অর্থাৎ জটাধারী ও ত্রিলোচন নামে অভিহিত হলেন এবং নারীর নাম হল—ত্রয়ী, বিদ্যা, কামধেনু, স্ত্রীভাবা (বালভাবা), অক্ষরা এবং স্বরা। মহাসরস্বতী এক গৌরবর্ণা নারী এবং এক শ্যামবর্ণ পুরুষ

সৃষ্টি করলেন। সেই পুরুষের নাম—বিষ্ণু, কৃষ্ণ, হৃষীকেশ, বাসুদেব ও জনার্দন এবং সেই নারীর নাম উমা, গৌরী, সতী, চণ্ডী, সুন্দরী, সুভগা ও শিবা। এরপর সেই তিন যুবতীই সেসময় পুরুষত্ব প্রাপ্ত হলেন। এ তত্ত্ব শুধুমাত্র জ্ঞানীদের পক্ষেই বোধগম্য সাধারণের জন্য নয়। হে রাজন, মহালক্ষ্মী ব্রহ্মাকে ত্রয়ী (সরস্বতী), রুদ্রকে বরদাত্রী বা গৌরী এবং বিষ্ণুকে শ্রী পত্নীরূপে প্রদান করলেন। ব্রহ্মা সরস্বতী মিলে এক অণ্ডের সৃষ্টি করলেন। বীর্যবান ভগবান রুদ্র গৌরীর সঙ্গে সেই অণ্ডকে বিভক্ত করলেন। সেই অণ্ডের মধ্যে প্রধানাদি মহৎ তত্ত্বের কার্যসমূহ এবং পঞ্চ মহাভূতাত্মক সকল স্থাবর জঙ্গমরূপ জগতের সৃষ্টি হল। লক্ষ্মীর সঙ্গে ভগবান বিষ্ণু মিলিত হয়ে সেই জগতের পোষণও করলেন এবং প্রলয়কালে গৌরীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মহেশ্বর সারা জগতকে ধ্বংস করলেন। হে মহারাজ, মহালক্ষ্মীই সর্বস্বত্বময়ী তথা সকল রকম স্বত্বের অধীশ্বরী। তিনিই নিরাকার ও সাকাররূপে অবস্থান করে নানারকম নাম ধারণ করেন। সগুণ বাচক, সত্য, জ্ঞান, আনন্দ, চিত্ত, মহামায়া প্রভৃতি নানা নামে তাকে বুঝবার চেষ্টা করা উচিত। কেবল একমাত্র নাম (মহালক্ষ্মী) দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে তাঁর বর্ণনা হয় না।

মেধস্ ঋষি বলছেন—যে ত্রিগুণময়ী দেবীর তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী—এই তিনরকম মূর্তির কথা বলা হয়েছে। তিনি শর্বা, চণ্ডিকা, দুর্গা, ভদ্রা ও ভগবতী ইত্যাদি নামে অভিহিতা হন। তমোগুণা মহাকালীকে ভগবান বিষ্ণুর যোগনিদ্রা বলা হয়। মধু ও কৈটভকে বিনাশের জন্য পদ্মাসন ব্রহ্মা যাঁর স্তব করেছিলেন তিনিই মহাকালী। তার দশ মুখ,দশ হাত ও দশটি পদ। তিনি কাজলের মত কাল ও বিশাল ত্রিশটি নয়নমালার সঙ্গে বিরজমানা। সুন্দর ও উজ্জ্বল দন্তযুক্তা এবং ভীমরূপা হলেও তিনি ভক্তগণের রূপ, সৌভাগ্য ও কান্তি প্রভৃতি মহা শ্রীর আশ্রয়। হাতে তাঁর খড়্গ, বাণ, গদা, শূল, শঙ্খ, চক্র, ভুশণ্ডি,

পরিঘ, ধনুক ও রক্ত ক্ষরণশীল কাটা মুণ্ড। এই দুরত্যয়া বা দুরতিক্রমণীয়া বিষ্ণুমায়ার পূজা করলে চরাচর জগৎকে পূজাকারীর (নিজ ভক্তের) বশীভূত করেন। সকল দেবতাদের শরীর থেকে যে অমিতপ্রভা দেবীর আবির্ভাব হয়েছিল। তিনিই ত্রিগুণময়ী মহিষমর্দিনী সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী। তাঁর আনন বা মুখ শ্বেতবর্ণ। হাত নীল। তাঁর স্তনমণ্ডল অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ। কটিদেশ ও চরণযুগল রক্তবর্ণ এবং জঙঘা ও উরু নীল রঙের। তিনি ব্রহ্মানন্দে উন্মাদিনী। তিনি সুচিত্র-জঘনা। বিচিত্র মাল্য ও বস্ত্রে বিভূষিতা, নানারকম অনুলেপন (গন্ধ) যুক্তা এবং তিনি কান্তি, রূপ ও সৌভাগ্যমণ্ডিতা। তিনি হাজার ভুজা রূপে পূজিতা হলেও অষ্টাদশরূপে পূজ্যা। তাঁর উভয় হাতের উপর থেকে নীচের পর্যন্ত যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র শোভিত রয়েছে সেগুলি হল—রুদ্রাক্ষ মালা, পদ্ম, বাণ, অসি, বজ্র, গদা, চক্র, ত্রিশূল, পরশু, শঙ্খ, ঘণ্টা, পাশ, শক্তি, দণ্ড, চর্ম (ঢাল), ধনু, পানপাত্র ও কমণ্ডলু। সর্বদেবময়ী ঈশ্বরী এই মহালক্ষ্মীকে যিনি পূজা করেন, তিনি সর্বলোকের ও দেবগণের প্রভু হন। যে সত্ত্বগুণময়ী দেবী পার্বতীর শরীর থেকে উদ্ভুতা হয়েছিলেন ও যিনি শুম্ভাসুরকে বধ করেন তিনিই সাক্ষাৎ সরস্বতী। এই অষ্টভূজা মহাসরস্বতীর আট হাতে আছে বাণ, মুষল, শূল, চক্র, শঙ্খ, ঘণ্টা, লাঙ্গল ও ধনু। এই শুম্ভ-নিশুম্ভ দৈত্যনাশিনী দেবীকে ভক্তিপূর্বক পূজা করলে তিনি পূজারীকে সর্বজ্ঞত্ব প্রদান করেন।

হে রাজন্ এভাবে মহাকালী প্রভৃতি তিন মূর্তির স্বরূপ তোমাকে বলা হল। এখন আলাদাভাবে তাঁদের উপাসনা বিষয়ে শোন—

মহালক্ষ্মীর পূজা যখন করবে, তখন দক্ষিণে মহাকালী ও উত্তরে (বামে) মহাসরস্বতী ও পশ্চাতে যুগলমূর্তিরূপে তিন দেবতার পূজা করবে। মাঝখানে সরস্বতীসহ ব্রহ্মার ডানদিকে গৌরীসহ রুদ্র (শিব), বামে লক্ষ্মীসহ বিষ্ণু এবং সামনে তিন দেবতার পূজা করবে। হে রাজন্, যখন শুধুমাত্র অষ্টাদশভূজা মহালক্ষ্মী অথবা দশাননা কালী বা অষ্টভূজা

সরস্বতীর পূজা করবে, তখন সকল অরিষ্ট (বিঘ্ন) প্রশান্তির জন্য দক্ষিণ ও উত্তরদিকে যথাক্রমে মহাকাল ও মহামৃত্যুর পূজা করবে। যখন শুম্ভাসুরনাশিনী অষ্টভুজার পূজা করবে, তখন তাঁর শৈলপুত্রী প্রভৃতি নবশক্তির এবং রুদ্র ও গণেশের পূজা করবে এবং নমো দেব্যৈ ইত্যাদি স্তোত্র দ্বারা মহালক্ষ্মীর অর্চনা করবে। দেবীর তিন অবতারের পূজার সময় সেই সেই চরিত্রের যে যে স্তোত্র আর মন্ত্র আছে সেগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করবে। অষ্টাদশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী মহালক্ষ্মীও বিশেষভাবে পূজনীয়া। কারণ তিনি মহালক্ষ্মী, মহাকাল ও মহাসরস্বতী নামে প্রসিদ্ধা। তিনিই পাপ-পুণ্যের ফলদাত্রী এবং সর্বলোকের মহেশ্বরী। মহিষাসুরের বিনাশকারিণী দেবী যাঁর দ্বারা পূজিতা হন, তিনি জগতের প্রভু হন। অতএব ভক্তবৎসলা দেবী জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকার ভক্তি করে পূজা করবে। হে নৃপ, অর্ঘ্যাদি, অলঙ্কার সকল, গন্ধপুষ্প এবং আতপ তণ্ডুল, ধূপ, দীপ, নানা আহার্য সমন্বিত নৈবেদ্য; রুধিরসিক্ত বলি, মাংস, মদ, প্রণাম, আচমনীয়, সুগন্ধি চন্দন এবং কর্পূরযুক্ত তাম্বুলাদি উপচার দ্বারা ভক্তিভাবে দেবীর পূজা করবে। দেবীর সামনে বামভাগে দেবীর সাযুজ্য প্রাপ্ত ছিন্ন শির মহাসুর মহিষকে এবং ডানদিকের পুরোভাগে সমগ্র ধর্মস্বরূপ দেবীর বাহন চরাচরধারী ভগবান সিংহের পূজা করবে। দেবীর বাহন সিংহ চরাচর বিশ্বধারণ করেন। তারপর করজোড়ে এই চরিত্রসমূহ দ্বারা দেবীর স্তব করবে। একমাত্র মধ্যম চরিত্র দ্বারাই স্তব করতে পার। কিন্তু কেবলমাত্র প্রথম বা উত্তর চরিত্র দ্বারা স্তব করবে না। চরিতার্ধ পাঠ করাও উচিত নয়। এরূপ পাঠে পূজার অঙ্গহানি হয়। অথবা মস্তকে কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম সহকারে সকল স্তোত্ররূপ মন্ত্র পাঠ পূর্বক দেবীর স্তব করবে। কোনরকম আলস্য না করে বার বার জগদ্ধাত্রীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রতিটি শ্লোক পাঠ করে তিলযুক্ত ঘি ও পায়স দিয়ে হোম করবে। অথবা কেবল শুদ্ধ ঘি দিয়ে প্রতিটি শ্লোক পাঠ করে চণ্ডিকার উদ্দেশ্যে হোম করবে

এবং নমো নমঃ ইত্যাদি পদ দ্বারা (পঞ্চম অধ্যায়ের স্তব দিয়ে) সমাহিত চিত্তে দেবীর পূজা করবে। সংযতচিত্তে করজোড়ে প্রণাম করে প্রাণায়ামের সঙ্গে দীর্ঘ সময় দেবী চণ্ডিকার চিন্তা করতে করতে তন্ময় হবে। এভাবে যিনি প্রতিদিন ভক্তিপূর্বক পরমেশ্বরীর পূজা করেন, তিনি তার আকাঙ্ক্ষা মত বস্তু ভোগ করে অন্তর্কালে দেবীর সাযুজ্য পান। যিনি ভক্তবৎসল দেবী চণ্ডিকার পূজা প্রতিদিন না করেন, পরমেশ্বরী তাঁর সকল পুণ্য ভস্মীভূত করেন। অতএব হে রাজন্ তোমাকে যেভাবে বললাম সেভাবেই সর্বলোক-মহেশ্বরী দেবী চণ্ডিকার তুমি পূজা করবে। তাহলেই ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হবে।

মেধস্ ঋষি আবার বলছেন—

ভগবতী নন্দা নামে যে নন্দদুহিতা ভবিষ্যতে আবির্ভূতা হবেন, তাঁকে স্তব ও পূজা করলে ত্রিভুবন বশীভূত হয়। সেই দেবীর উজ্জ্বল সুবর্ণ কান্তি। তাঁর বস্ত্রাদিও স্বর্ণপ্রভ। তিনি কনকবর্ণা ও স্বর্ণালঙ্কার শোভিতা। তাঁর চারিটি হাত পদ্ম, অঙ্কুশ, পাশ ও শঙ্খ দিয়ে শোভিত। তিনি ইন্দিরা, কমলা, লক্ষ্মী ও শ্রী নামে অভিহিতা এবং তাঁর আসন স্বর্ণ-পদ্মতুল্য। হে অনঘ (নিষ্পাপ) রক্তদন্তিকা নামে যে দেবীর কথা বললাম, সকল ভয় নাশকারী সেই দেবীর কথা বলছি শোন—

তিনি রক্তবসনা, রক্তবর্ণা, রক্তালঙ্কারে তাঁর সারা অঙ্গ শোভিত; তিনি রক্তবর্ণ অস্ত্রধারিণী, রক্তনয়না, রক্তকেশা ও অতিভীষণা। তাঁর তীক্ষ্ণ নখগুলি রক্তবর্ণ এবং তিনি রক্তজিহ্বা ও রক্ত-দংষ্ট্রা। নারী যেমন পতির প্রতি অনুরক্তা হন, তিনি সেরকমই ভক্তজনের প্রতি অনুরাগিনী। তাঁর শরীর বিশ্বের মত বিশাল। এবং তাঁর সুমেরু তুল্য স্তনযুগল দীর্ঘ, লম্বা, অতি স্থূল, অতীব মনোহর, কর্কশ হলেও অত্যন্ত কমনীয় এবং পূর্ণানন্দের সাগর সদৃশ। সর্বকামনা পূরক সেই স্তনযুগল দেবী তাঁর ভক্তগণকে পান করিয়ে থাকেন। দেবীর চার হাতে খড়্গ, পানপত্র, মুষল ও লাঙ্গল শোভিত। তিনিই রক্তচামুণ্ডা ও যোগেশ্বরী দেবী নামে

অভিহিতা। সমগ্র চরাচর জগৎ তাঁর দ্বারাই ব্যাপ্ত। যিনি তাঁকে ভক্তিপূর্বক পূজা করেন, তিনিও চরাচর জগতে পরিব্যাপ্ত হন। অর্থাৎ সর্বব্যাপিত্ব রূপ আত্মজ্ঞান লাভ করেন। যিনি রক্তদন্তিকা দেবীর এই স্তব নিত্য পাঠ করেন, নারী যেমন তার প্রিয়তম স্বামীর সেবা করে, দেবীও সেরকম স্নেহভরে তাঁর প্রতিপালন করেন। শাকম্ভরী দেবী নীল বর্ণা ও নীলপদ্ম নয়না। তাঁর নাভিদেশ গভীর এবং তাঁর উদর ক্ষীণ ও ত্রিবলী ভূষিত। তাঁর স্তনযুগল সুকর্কশ, সমান, উন্নত, সুগোল, স্থূল এবং ঘনসন্নিবিষ্ট। তিনি কমলাসনা। ইনি বাণপূর্ণ মুষ্টি, পদ্ম, শাকসমূহ ও প্রকাশমান ধনু ধরে থাকেন। ওই শাকসমূহ অনন্ত মনোবাঞ্ছিত রসযুক্ত এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা ও মৃত্যুভয় নাশকারী এবং পুষ্প, পল্লব, মূল ও ফলযুক্ত। সেই পরমেশ্বরী শাকম্ভরী দেবী উজ্জ্বল কান্তিযুক্তা ও শতনয়না। তিনিই দুর্গা নামে প্রসিদ্ধা। তিনিই বিশোকা, দুষ্টদমনী, পাপনাশিনী ও শতনয়না। তিনিই উমা, গৌরী, সতী, চণ্ডী, কালিকা ও পার্বতী নামে অভিহিতা। শাকম্ভরী দেবীকে স্তব, ধ্যান, জপ, পূজা ও প্রণাম করলে শীঘ্রই অন্ন-পানরূপ অমৃত ফল লাভ হয়। সেই ভীমাদেবী নীল বর্ণা। তাঁর দাঁড়া (লম্বা দাঁত) ও উজ্জ্বল দন্ত। সেই দেবী বিশাল নয়না, তাঁর স্তনযুগল গোলাকার ও স্থূল। তিনি হাতে চন্দ্রহাস নামে খড়্গ, ডমরু, মাথা ও পানপাত্র ধরে রয়েছেন। তিনি একবীরা ও কালরাত্রি নামে অভিহিতা। তিনি সংস্তুতা হলে স্তুতিকারীর সব অভীষ্ট পূর্ণ করেন। সেই দেবী ভ্রামরী। তাঁর অনেক বর্ণ। তাঁর তেজোমণ্ডলের জন্য তাঁকে দুর্দ্ধর্ষা দেখায়। তিনি নানা বর্ণ অনুলেপনে অনুলিপ্তা এবং বিচিত্র অলঙ্কারে বিভূষিতা। তিনি হাতে নানারকম ভ্রমর ধারণ করেন। এবং তিনি মহামারী (মহামৃত্যু) নামে অভিহিতা। হে পৃথিবীপতি, জগন্মাতা চণ্ডিকাদেবীর এই সমস্ত মূর্তির কথা তোমার কাছে বললাম। এই মূর্তিসমূহ কামধেনু রূপে অর্থাৎ সকল কামনা পূরণকারীরূপে কীর্তিতা। এই পরম মূর্তিরহস্য যাকে তাকে বলা উচিত নয়। এসব দিব্য মূর্তির আখ্যান

নিজে অর্থ বুঝে পাঠ করা উচিত। অতএব সর্বপ্রযত্নে নিরন্তর দেবীমাহাত্ম্য জপ অর্থাৎ পাঠ করবে। সপ্তশতী (শ্রীশ্রীচণ্ডীর) পাঠমাত্রই মানুষ সাত জন্মের অর্জিত ব্রহ্মহত্যা ও অন্যান্য ঘোর পাপ এবং সমস্ত কলুষ থেকে বিমুক্ত হয়। গুহ্য থেকে গুহ্যতর, মহৎ ও সমস্ত কামনার ফল প্রদানকারী এই দেবীধ্যান তোমাদের কাছে বললাম। অতএব এখন তোমরা সর্বপ্রযত্নে তাঁর অর্থাৎ শ্রীশ্রীচণ্ডিকাদেবীর আরাধনা কর।

রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য ঋষিবরের আদেশ ও আশীর্বাদ নিয়ে চললেন তপস্যা করার জন্য। তাঁরা জগন্মাতার সম্যক্ দর্শন লাভের জন্য নদীতীরে অবস্থান করে শ্রেষ্ঠ দেবীসূক্ত জপ করতে করতে তপস্যায় রত হলেন। দু'জনেই নদীর তীরে গিয়ে দুর্গাদেবীর মাটির মূর্তি তৈরি করলেন। মূর্তি তৈরি হয়ে গেলে পুষ্প, ধূপ-দীপ, হোম ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা তাঁর পূজা করতে লাগলেন। তাঁরা মায়ের আরাধনা কখনও নিরাহারী, কখনও-বা অল্পাহারী এবং সমাহিত হয়ে করতে লাগলেন। তাঁর শ্রীচরণেই মন-প্রাণকে পূর্ণ সমর্পণ করে নিজেদের দেহের রক্তসিক্ত বলি দেবীর চরণে নিবেদন করলেন। প্রসঙ্গতঃ আজকাল আমরা মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মহিষ, ছাগ, পায়রা প্রভৃতি নানারকম পশুর জীবন বলিদান করি। কিন্তু রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য মাকে দিয়েছিলেন নিজদেহের রক্তসিক্ত বলি। এভাবেই দুই মহা তপস্বী তিন বছর ধরে দেবীর আরাধনা করলে পর জগন্মাতা মা দুর্গা (দেবী চণ্ডিকা) প্রসন্না হলেন। তিনি তাঁদের কাছে প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূতা হয়ে বললেন—

হে রাজন্—তুমি যা প্রার্থনা কর এবং হে বৈশ্যকুল নন্দন—তুমি যা প্রার্থনা কর সে-সমস্তই আমি তোমাদের দেব। তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের অভিলষিত বর পাবে। তোমরা যা চাও তা বল।

তখন রাজা সুরথ পরজীবনে সাবর্ণি মনুরূপে চিরস্থায়ী রাজ্য এবং এই জীবনে নিজের শক্তিতে শত্রুসৈন্য ধ্বংস করে অপহৃত নিজ রাজ্যকে যাতে উদ্ধার করে আনতে পারেন তেমন প্রার্থনাই করলেন

মায়ের শ্রীচরণে। তাঁর সাধনসঙ্গী, বিবেকী, প্রজ্ঞাবান ও বৈরাগ্যবান সেই সমাধিবৈশ্য মায়ের নিকট বর প্রার্থনা করলেন—স্ত্রী-পুত্র-ধন এসব আমার এবং দেহাদি আমি এরকম সংসারের প্রতি আসক্তি বিনাশক তত্ত্বজ্ঞান যেন হয়।

দেবী প্রথমে রাজা সুরথের প্রার্থনা পূরণ করতে বর দিলেন—অতি অল্প দিনের মধ্যেই তুমি তোমার শত্রুদের বিনাশ করে নিজ রাজ্য পুনরায় লাভ করবে। তোমার সেই রাজ্যের আর বিচ্যুতি হবে না। অর্থাৎ তা হবে তোমার স্থায়ী রাজ্য। আর তোমার মৃত্যুর পর পুনরায় তুমি সূর্যদেব হতে তাঁর পত্নী সবর্ণার গর্ভে জন্মলাভ করে পৃথিবীতে সাবর্ণি নামে অষ্টম মনু হবে।

এরপর বৈশ্যশ্রেষ্ঠ সমাধিকে বর প্রদান করে দেবী বললেন—তুমি আমার কাছে যে বর প্রার্থনা করেছ আমি তোমাকে তাই প্রদান করছি। মুক্তি লাভের জন্য তোমার ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হবে।

জগন্মাতা দেবী দুর্গা উভয়কে তাঁদের প্রার্থনা অনুযায়ী বর প্রদান করে এবং তাঁদের দ্বারা ভক্তিপূর্বক সংস্তুতা হয়ে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হলেন। মায়ের এমন অপার করুণা দেখে নিজ মনস্কাম পূর্ণ করতে তাই হয়তো মাতৃসাধক রামপ্রসাদ গাইলেন—

মন রে শ্যামা মাকে ডাক, ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ।
পরিহরি ধন-মদ, ভজ পদ কোকনদ।
কালেরে নৈরাশ কর, কথা শুন কথা রাখ।।
কালী কৃপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
অষ্ট যামের অর্দ্ধ যাম, আনন্দেতে সুখে থাক্।
রামপ্রসাদ যেন কয় রিপুছয় কর জয়
মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা দুর ছাই করে হাঁক।।

# নবরূপে দেবী শ্রীশ্রীচণ্ডিকা
## (নবদুর্গা)

ঋষি মার্কণ্ডেয় ভগবান ব্রহ্মাকে বলছেন—হে পিতামহ, যা সকল লোকের পক্ষে কল্যাণকর, অথচ পরম গোপনীয় এবং অন্য কারও কাছে বলা হয়নি তা আমাকে আপনি দয়া করে বলুন।

উত্তরে ভগবান ব্রহ্মা তাঁকে দেবী কবচের কথা বলেন। সেই প্রসঙ্গে প্রথমেই তিনি নবদুর্গার কথা উল্লেখ করেন; যা দেবী জগৎ জননীর ন'টি রূপ ও ন'টি ভাব বলা চলে। দেবী কবচের শুরুতেই নবদুর্গা সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

**"প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী।**
**তৃতীয়ং চন্দ্রঘণ্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্।।**
**পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা।**
**সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্।।**
**নবমং সিদ্ধিদাত্রী চ নবদুর্গাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।"**

শ্লোকের অর্থটি এরকমই—প্রথম শৈলপুত্রী, দ্বিতীয় ব্রহ্মচারিণী, তৃতীয় চন্দ্রঘণ্টা, চতুর্থ কুষ্মাণ্ডা, পঞ্চম স্কন্দমাতা, ষষ্ঠ কাত্যায়নী, সপ্তম কালরাত্রি, অষ্টম মহাগৌরী এবং নবম সিদ্ধিদাত্রী—এঁরা নবদুর্গা নামে অভিহিতা হয়ে থাকেন বা এঁদেরকেই নবদুর্গা বলা হয়েছে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে।

দেবীর ওই নয় রূপ ও নয় ভাব সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায় তা এখানে উল্লেখ করছি। তবে তার আগে প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, দুর্গাপূজাকে নবরাত্রব্রতও বলা হয়। নবরাত্রব্রত অর্থাৎ নয়দিন উপবাস করে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান। শরৎকালে আশ্বিনে, বসন্তকালে চৈত্রমাসে শুক্লা প্রতিপদ থেকে শুক্লা নবমী পর্যন্ত নয়দিন ধরে নবরাত্র ব্রত পালন করা হয়। এই নয় দিনে দেবী দুর্গাকে নয়টি বিশেষ রূপে আরাধনা করা হয়। বাংলায় নবরাত্রব্রত কম দেখা গেলেও বাংলার বাইরে যথেষ্টই দেখা যায়।

নবদুর্গা প্রসঙ্গে প্রথমেই যে নামটি আমরা পেয়েছি তিনি হলেন—

শৈলপুত্রী। শৈল কথার অর্থ গিরি বা পর্বত। কিন্তু এখানে শৈল বলতে আমরা বুঝি গিরিরাজ হিমালয়কে। তিনি দেবীকে কন্যারূপে পাওয়ার জন্য কঠিন তপস্যা করেন। দেবী তাঁর তপস্যায় তুষ্টা হয়ে তাঁরই ঘরে তাঁরই কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য দেবীর আর এক নাম পার্বতীও। এ-প্রসঙ্গে এমনও শোনা যায়—দক্ষরাজা যজ্ঞসভায় শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। সেখানে সতীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তবুও সতী সেখানে উপস্থিত হলে পিতা রাজা দক্ষ তাঁর কাছে তাঁর পতিদেবতা শিবের নিন্দা করতে থাকেন। স্বামীর নিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতী সেখানেই দেহত্যাগ করেন। শিব সতীর মৃত্যু-সংবাদে ছুটে আসেন কৈলাস থেকে। দক্ষের যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। তাঁর মাথা যায় কাটা। শিব প্রিয়তমা পত্নীর দেহটিকে কাঁধে নিয়ে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য শুরু করেন। জগৎকে রক্ষা ও অশান্ত শিবকে শান্ত করতে বিষ্ণু নিজ সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহকে একান্ন খণ্ডে খণ্ডিত করেন। এক সময় শিব দেখেন তাঁর কাঁধে সতী নেই। তখন বসেন তপস্যায়। হন ধ্যানমগ্ন। এদিকে অসুরদের অত্যাচারে দেবকুল বিপর্যস্ত। তাঁরা যুদ্ধে অসুরদের পরাজিত করার চেষ্টা সত্ত্বেও নিজেরাই বিপর্যস্ত। কারণ তাঁদের মধ্যে যোদ্ধা থাকলেও নেই উপযুক্ত সেনাপতি। সেই সেনাপতির অভাব দূর করতে ব্রহ্মা তাঁদের পরামর্শ দিয়ে বললেন—হর-গৌরীর মিলনে যে কুমারের জন্ম হবে, সেই হবে দেবতাদের যোগ্য সেনাপতি। কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব? কারণ শিব তো পত্নীহারা। তাই দেবতারা ব্যাকুল হয়ে মা দুর্গার শ্রীচরণে প্রার্থনা জানান আবার ধূলার ধরণীতে তাঁর আবির্ভাবের জন্য। দেবী তাদের প্রার্থনা পূরণ করতেই হলেন শৈলপুত্রী।

**বন্দে বাঞ্ছিতলাভায় চন্দ্রার্ধকৃতশেখরাম্।**
**বৃষারূঢ়াং শূলধরাং শৈলপুত্রীং যশস্বিনীম্।।**

এই শৈলপুত্রীর বাহন বৃষ। তাঁর রূপ বর্ণনায় জানা যায়—দেবীর শিরে অর্ধচন্দ্র। তাঁর দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল, বাম হাতে কমল পুষ্প

সুশোভিত। শৈলপুত্রী দুর্গার মহত্ত্ব ও শক্তি অনন্ত। নবরাত্রি উপলক্ষ্যে দেবীর যে পূজা হয় তার প্রথম দিনেই পূজা হয় শৈলপুত্রীর। তন্ত্রসাধনার মতে প্রথমদিনের পূজায় যোগী তাঁর মনকে মূলাধার চক্রে স্থিত করেন। সেখান থেকেই তাঁর হয় সাধনার শুরু।

**ব্রহ্মচারিণী**

**দধানা করপদ্মাভ্যাম্ অক্ষমালাকমণ্ডলূ।**
**দেবী প্রসীদতু ময়ি ব্রহ্মচারিণ্যনুত্তমা।।**

মায়ের দ্বিতীয় যে রূপ আমরা প্রজাপতি ব্রহ্মার শ্রীমুখ থেকে শুনলাম, তিনি হলেন **ব্রহ্মচারিণী**। "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ তপস্যা। "ব্রহ্মচারিণী" অর্থাৎ তপশ্চারিণী বা তপঃ আচরণকারিণী। এই দেবীর যেমনি নাম, তেমনি তাঁর রূপ এবং কাজও। দেবীর রূপ সম্পর্কে আমরা যা জানতে পারি—তাতে তিনি হলেন—ব্রহ্মচারিণীরূপ জ্যোতিতে পরিপূর্ণা। তিনি অতি মহিমামণ্ডিতা। তাঁর ডান হাতে জপের মালা এবং বাম হাতে কমণ্ডলু। তিনি নাকি শিবকে স্বামীরূপে পাওয়ার জন্যই এই ব্রহ্মচারিণীর রূপ ধারণ করেছিলেন।

মা এই দ্বিতীয় রূপেও সাধক এবং ভক্তদের অনন্ত কল্যাণপ্রদান-কারিণী। তাঁর উপাসনা দ্বারা মানুষের স্বভাবে তপঃ, বৈরাগ্য, সদাচার ও সংযম অবিচল থাকে। তাঁর কৃপায় সর্বদা সিদ্ধি ও বিজয় লাভ ঘটে। দুর্গাপূজার দ্বিতীয় দিনে মায়ের এই রূপেরই আরাধনা করা হয়। তখন সাধকের মন স্বাধিষ্ঠান চক্রে স্থিত হয়। এই চক্রে চিত্ত প্রতিষ্ঠিত হলে যোগী তাঁর কৃপা ও ভক্তি লাভ করেন।

পণ্ডিতদের মতে এই ব্রহ্মচারিণীই উমা, হৈমবতী। ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করানোই তাঁর স্বভাব। ইনিই একবার দেবরাজ ইন্দ্রকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়েছিলেন। সে-বিষয়ে উপনিষদে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। উপনিষদের সেই কাহিনীটি এখানে তুলে ধরছি—

দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের একবার ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছিল। দেবতারা

যেমন শক্তিমান, তেমনি শারীরিক শক্তিতে অসুরেরাও শক্তিমান। কিন্তু অসুরেরা যখন দেবতাদের আক্রমণ করে তখন দেবতারা প্রথম দিকে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তারপর যুদ্ধ যখন আরম্ভ হয়েছে, তখন প্রাণ দিয়ে হলেও শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে হবে, যুদ্ধ-ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া তো আর যায় না—এরকম চিন্তা করেই দেবতারা প্রতিজ্ঞা করলেন অসুরদের হারাতেই হবে।

দেবতারা মনে মনে এমন প্রতিজ্ঞা করার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ করেই কিভাবে যেন তাঁদের মনের শক্তি বেড়ে গেল। বেড়ে গেল শরীরেরও শক্তি। অসুরদের কাছে হেরে যেতে পারি বলে প্রথম দিকে তাঁদের মনে যে ভয় হয়েছিল—তা কোথায় চলে গেল। তখন তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহে অসুরদের আক্রমণ করলেন।

অসুরেরা যুদ্ধে দেবতাদের প্রবল পরাক্রম দেখে ভয় পেয়ে যায়। তাদের মধ্যে যারা বড় বড় বীর তারাও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ভাবে, আজ বুঝি আর আমাদের জীবন-রক্ষা হবে না। তবুও দুই দলে তুমুল যুদ্ধ হল। শেষ পর্যন্ত দেবতাদের হাতে ভীষণ মার খেয়ে অসুরেরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে প্রাণে বাঁচল। যুদ্ধে দেবতারাই হলেন জয়ী।

অসুরদের হারিয়ে দেবতাদের আর আনন্দের সীমা নেই। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র রাজসভার মাঝে রত্নোজ্জ্বল সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁর পাশাপাশি বসে আছেন অগ্নি, বায়ু, যম, বরুণ থেকে শুরু করে আরো অন্যান্য সকল গণ্য-মান্য বড় বড় দেবতারা। তাঁরা সভায় বসে অসুরদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া যুদ্ধের বিষয়ে নানা কথাবার্তা বলছেন। সবাই নিজের নিজের শক্তি ও বুদ্ধির গর্ব করছেন। বলছেন একটু বাড়িয়েই। যেন তাঁদের বুদ্ধির জোর ছাড়া দেবতাদের পক্ষে জয় কিছুতেই সম্ভব হত না। সকলেই নিজ নিজ প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নিজেদের শক্তির কথা চিন্তা করে তাঁদের যেন গর্বে বুক ফুলে ফুলে উঠছে।

ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ। এই বিশ্ব-চরাচরে তাঁর অজানা কিছুই নেই। তিনি

দেবতাদের এই মিথ্যা অহঙ্কারের কথা মনে মনে বুঝতে পারলেন। বুঝতে পেরে তাঁদের গর্ব চূর্ণ করার জন্য এক অতি সুন্দর যক্ষের রূপ ধরে সেই দেবরাজ ইন্দ্রের সভার কিছুদূরে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন। দেবতাদের আলোচনায় মগ্ন হয়ে থাকলেও ইন্দ্র কিন্তু ওই সুন্দর যক্ষকে দেখেন। যক্ষকে দেখতে পেয়ে দেবরাজের মাথা শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে যায়। কিন্তু যক্ষ দেবসভার দিকে এগিয়ে না আসায় এবং তাঁদের দিকে একইভাবে তাকিয়ে থাকায় তাঁর সন্দেহ হয়। তাই ইন্দ্র বললেন—ওই সুন্দর জ্যোতির্ময় পুরুষটিকে দেখলেই শ্রদ্ধা হয়। কিন্তু উনি আসতে আসতে হঠাৎ ওখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? আমাদের দিকে উনি ওভাবে তাকিয়েই-বা আছেন কেন? দেবতারা সবাই দেখলেন, কিন্তু কেউই তাঁকে চিনতে পারলেন না। এবার দেবরাজ তাঁর পাশেই বসে থাকা অগ্নিদেবকে বললেন—"হে জাতবেদা, তুমি একবার ওই যক্ষের কাছে গিয়ে জেনে আসতে পার যে—তিনি কে? তিনি এখানে কেন এসেছেন? আর কি-ই বা তিনি চান?

অগ্নিদেব সানন্দে দেবরাজের আদেশ পাওয়া মাত্র যক্ষের কাছে চলে গেলেন। তাঁর মনের ভাবটা এরকমই যেন, এত বড় ভীষণ যুদ্ধ জয় করে এলাম, আর এইটুকু কাজ আর আমার কাছে কি!

অগ্নিদেব যক্ষকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন কি তার আগেই যক্ষ অগ্নিদেবকে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি কে? আপনার পরিচয় কি?

অগ্নি বলেন—আমি অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ। আবার আমি জাতবেদা বলেও বিখ্যাত।

যক্ষ বলেন—তুমি যে অগ্নি তার প্রমাণ কি? তোমার কি ক্ষমতা আছে?

তার উত্তরে অগ্নিদেব বলেন—আমি মনে করলে এই জগৎ-সংসারে যেখানে যা-কিছু আছে সব পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতে পারি।

যক্ষ যেন বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে গিয়ে বলেন—আমি বিনা প্রমাণে

তোমার কথায় বিশ্বাস করতে পারছি না। বেশ, এই ঘাসটিকেই পোড়াও তো দেখি। বলেই তাঁর সামনে একটি ঘাস রাখলেন।

অগ্নি নিজের ক্ষমতার গর্বে উৎসাহিত হয়ে সেই ঘাসটির দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর ভাবখানা যেন এইরকমই যে, আমি ইচ্ছা করলে জগৎ-সংসারকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারি। কত বড় বড় বন, উপবন, মহাবন পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছি, সেই আমার সামনে ইনি কি-না একখানা ঘাস রেখে বলছেন পুড়িয়ে দিতে। ইনি জানেনই না যে আমি কত বড় শক্তিমান। বেশ, আজ একবার ওঁকে দেখিয়ে দিতে চাই আমার কত ক্ষমতা। তারপর অগ্নি সেই ঘাসটাকে পোড়ানোর জন্য প্রথমে অল্প তেজ দিলেন। ভাবলেন এইটুকু ঘাস এতেই ভস্মীভূত হয়ে যাবে। কিন্তু না, কিছুই হল না। তখন আরও একটু তেজ দিলেন—না তাতেও কিছু হল না। তখন আরও একটু তেজ—তাতেও না। অগ্নিদেব বিস্মিত হয়ে যাচ্ছেন ব্যাপারটা কি! এদিকে যক্ষের মুখে তখন হাসির রেখা। তা দেখে রাগে তিনি তখন সমস্ত তেজ প্রয়োগ করে দিলেন। সেই বিপুল তেজে ওই ঘাসটুকু কেন যক্ষেরও কিছুই অবশিষ্ট থাকার কথা নয়, এমন-কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও তো পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু যক্ষ তো দূরের কথা, সেই ঘাসটুকুর সামান্যতম অংশকেও তিনি পোড়াতে পারলেন না।

লজ্জায়, অপমানে অগ্নিদেব মাথা নীচু করে দেবসভায় ফিরে এসে দেবরাজকে বললেন—এই পূজনীয়-স্বরূপ যে কে, তা আমি জানতে পারলাম না। তারপর সব ঘটনা দেবরাজ ইন্দ্রকে খুলে বললেন।

তখন দেবতারা বায়ুকে বললেন—হে বায়ু, তুমি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ওই যক্ষের কাছে গিয়ে জেনে এস যে—তিনি কে?

বায়ুও সোৎসাহে যক্ষের কাছে চলে গেলেন। তাঁরও তো ক্ষমতার গর্ব কম নয়। নিজেকে তিনি কম তো ভাবেনই না, পরন্তু অগ্নির চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান্ বলেই মনে করেন। কারণ তাঁর সাহায্য না পেলে

অগ্নির শক্তি আর কতটুকু? তাছাড়া অগ্নি যে কাজ করতে পারেননি, তা তিনি যদি করতে পারেন, তবে তো তাঁর মান আরো বেড়ে যাবে, তাই বায়ু বীরদর্পে যক্ষের কাছে গিয়ে পৌঁছালে সেই যক্ষরূপী ব্রহ্ম বললেন—তুমি কে? তোমার পরিচয় কি?

বায়ু বললেন—আমি বায়ু নামে জগতে প্রসিদ্ধ। আবার মাতরিশ্বা নামেও আমার জগতে খ্যাতি আছে।

বায়ুর কথা শুনে যক্ষ বললেন—তোমার যে এমন নাম তার সার্থকতা কি? তোমার কি শক্তি আছে?

বায়ু বললেন—আমি ইচ্ছা করলে এই জগতের সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি।

তখন যক্ষ বলেন—তোমার মুখের কথায় তো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। ঠিক আছে, বাস্তবে তুমি আমাকে করে দেখাও। দেখি—তোমার ক্ষমতা কি রকম? তুমি এই ঘাসটিকেই উড়িয়ে ফেলে দাও। বলে যক্ষ একখানি ঘাস তাঁর সামনে রাখলেন।

বায়ু অবহেলা ভরে সেখানে এগিয়ে গিয়ে সেই ঘাসটিকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। প্রথমে অল্প শক্তি প্রয়োগ, তারপর ক্রমশঃ শক্তি বাড়িয়ে বাড়িয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। তবুও সেই ঘাসটিকে এক চুলও নড়াতে পারলেন না। লজ্জায়, অপমানে বায়ুদেবের মুখখানা যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। অসুরদের জয় করে যে বায়ু এত শক্তির গর্ব করছিলেন, তিনিও মাথাটি নীচু করে দেবরাজের কাছে গিয়ে বললেন—এ পূজনীয়-স্বরূপ যে কে, তা আমি জানতেই পারলাম না।

তারপর দেবরাজ ইন্দ্রকে দেবতারা বললেন— হে মঘবন্, তুমি নিজে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা যক্ষের কাছে গিয়ে জেনে এসো ইনি প্রকৃতপক্ষে কে?

অগ্নি এবং বায়ু দু'জনকেই যক্ষের কাছে গিয়ে নিজেদের শক্তির গর্ব চূর্ণ হতে দেখে এবং তাঁরা যক্ষের পরিচয় না জানতে পারায়—ইন্দ্র

ধরেই নিয়েছিলেন—ইনি সাধারণ কেউ নন, ইনি নিঃসন্দেহে কোন অসাধারণ শক্তিমান। তাই এবার তাঁর নিজেরও যক্ষের কাছে যাওয়া উচিত মনে করছিলেন। সেজন্য দেবতারা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্র যক্ষের উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি রওনা হলেন।

কিন্তু ইন্দ্র তাঁর মুখোমুখি হওয়ার আগেই সেই যক্ষ গেলেন অদৃশ্য হয়ে।

দেবরাজ অবাক হয়ে গিয়ে ভাবছেন—একি! যিনি এতক্ষণ ছিলেন, তিনি গেলেন কোথায়? এই কথা ভাবতে ইন্দ্র দেখেন—মূর্তিমতী ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপিণী ব্রহ্মচারিণী উমা হৈমবতীকে। দেবরাজ তখন তাঁর কাছেই এগিয়ে গেলেন।

তাঁকে প্রণাম করে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করছেন—মা, এই পূজনীয় স্বরূপ যক্ষটি কে? তিনি আমাকে দেখা না দিয়েই কেন চলে গেলেন?

দেবরাজের ব্যাকুলতায় ব্রহ্মচারিণী উমা হৈমবতী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—তুমি যাঁকে দেখতে পাওনি, জানতে পারনি—উনিই সেই ব্রহ্ম। উনিই এই জগতের বিধাতা। ওঁর শক্তিতেই সবাই শক্তিমান। ওঁর শক্তি না পেলে কারও কিছুই করার ক্ষমতা থাকে না। ওঁরই ইচ্ছায় তোমার কাছে আমি এসেছি।

তোমরা অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছ। জয়ী হয়েছ। কিন্তু যাঁর দয়ায় তোমরা জয়ী হলে, তাঁরই দয়ার কথা না মনে রেখে তোমরা তোমাদের ক্ষমতার গর্বেই মেতে উঠেছিলে। তার জন্য তোমাদের কত গর্ব, কত অহঙ্কার। সে-জন্যই উনি এসে তোমাদের সাবধান করে দিলেন।

শুনে ইন্দ্র খুব আনন্দিত হলেন এবং বুঝতে পারলেন—কি ভীষণ ভুলই না হচ্ছিল! দেবসভায় ফিরে এসে তিনি নিজের অভিমানের কথা ভুলে সেই সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের অনন্ত শক্তির কথাই চিন্তা করতে থাকলেন।

ব্রহ্মজ্ঞান স্বরূপিণী ব্রহ্মচারিণীর কৃপায় দেবরাজ ইন্দ্রের সত্যস্বরূপ

ব্রহ্মানুভূতি হল।

শোনা যায়, দেবী যখন হিমালয়ের কন্যারূপে জন্মেছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদের পরামর্শে শিবকে স্বামীরূপে লাভের জন্য তিনি কঠোর তপস্যা করেন। সেই তপস্যার সময় তিনি হাজার বছর ধরে শুধুমাত্র ফলমূল খেয়েই ছিলেন। তারপর একশ বছর খেয়েছেন শুধু শাক। এরপর কিছুদিন কঠোর উপবাস করে খোলা আকাশের নীচে বর্ষা ও গ্রীষ্মের দাবদাহে কাটান। তারপর তিন হাজার বছর গাছ থেকে পড়ে যাওয়া শুধুমাত্র বেলপাতা খেয়েই তিনি শিবের সাধনা করেন। পরে একসময় সেই বেলপাতাও খাওয়া ছেড়ে দেন। এবার কয়েক হাজার বছর খাওয়া তো দূরে থাক, জলপান পর্যন্ত না করে তাঁর কঠোর তপস্যা চলতে থাকে। ওই পাতা পর্যন্তও খাওয়া ত্যাগ করে দেওয়ায় দেবীর নাম হয় অপর্ণা। হাজার হাজার বছর কঠোর তপস্যার ফলে পার্বতীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হয়ে যায়। তাঁর সেই শরীরের অবস্থা দেখে মা মেনকার মনে অত্যন্ত কষ্ট হয়। তিনি চাইলেন তাঁর মেয়েকে তপস্যা থেকে নিরত করতে। তাই বললেন—'উঃ মা আর নয়'। সে থেকেই দেবীর নাম হল উমা।

যাহোক দেবীর সেই কঠোর তপস্যা দেখে ত্রিলোকেই হাহাকার পড়ে গেল। মুনি, ঋষি, দেবতা সিদ্ধগণ সবাই তাঁকে ধন্য ধন্য করতে থাকেন। পিতামহ ব্রহ্মা তাঁর দুশ্চর তপস্যায় পরিতুষ্ট হয়ে বর দিতে এসে বললেন—দেবি, তোমার মত তপস্যা আজ পর্যন্ত কেউ করেনি। এ কঠোর তপস্যা তোমার পক্ষেই সম্ভব। তোমার মনের কামনা পূর্ণ হবে। তুমি ভগবান শঙ্করকে স্বামীরূপে লাভ করবে।

**চন্দ্রঘন্টা**

**পিণ্ডজ-প্রবরারূঢ়া চণ্ডকোপাস্ত্রকৈর্যুতা।**
**প্রসাদং তনুতে মহ্যং চন্দ্রঘন্টেতি বিশ্রুতা।।**

মায়ের তৃতীয় রূপটির নাম হল **চন্দ্রঘণ্টা**। এ প্রসঙ্গে জানা যায়—

মহিষাসুর বধের জন্য সম্মিলিত দেবতাদের শক্তির মূর্ত রূপ হলেন মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী দেবী দুর্গা। দেবতারা তাঁকে সমর সজ্জায় সজ্জিতা করতে নিজ নিজ অস্ত্রের অনুরূপ অ, তাঁর হাতে তুলে দেন। সেসময় দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে একটি ঘণ্টা দি ছিলেন। এই দেবী দশভুজা। তাঁর শ্রীহস্তে রয়েছে খড়্গাদি শস্ত্র এবং  প্রভৃতি অস্ত্র। তাঁর বাহন সিংহ। মায়ের গাত্রবর্ণ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। তাঁর প্রচণ্ড ঘণ্টাধ্বনিতে দুরাচারী দানব, দৈত্য ও অসুরদের হৃদয় সর্বদা কম্পিত হয়ে ওঠে। নবরাত্রির দুর্গাপূজার তৃতীয় দিনের পূজা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তন্ত্র-সাধকেরা বলেন, এদিন সাধকের মন মণিপুর চক্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাতা চন্দ্রঘণ্টার কৃপায় সাধকের অলৌকিক বস্তুর দর্শন হয়। দিব্য সুগন্ধীর অনুভব হয় এবং নানারকম দিব্য ধ্বনি তিনি শুনতে পান। মায়ের কৃপায় সাধকের সকল বাধাবিঘ্ন নষ্ট হয়ে যায়।

**কুষ্মাণ্ডা**

কুষ্মাণ্ডা মায়ের চতুর্থ রূপের নাম। মহাজ্ঞানী সন্ন্যাসী ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর মতে উষ্মা শব্দে বুঝায় তাপ। কুৎসিত তাপের নাম কুষ্মা। এই মরণশীল জগতে আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক ভেদে তিনরকমের তাপ। এই দুর্বিষহ ত্রিতাপই কুষ্মা। অন্ড শব্দে উদর। কুষ্মা বহন করেন যিনি উদরে তিনিই কুষ্মাণ্ডা।

কারও কারও মতে কুমড়োকে সংস্কৃত ভাষায় বলা হয় কুষ্মাণ্ড। দেবীর উদ্দেশ্যে যে সকল বলি প্রদান করা হয়, তারমধ্যে তাঁর সবথেকে প্রিয় নাকি কুমড়ো বা কুষ্মাণ্ড। সেজন্যও নাকি দেবীকে কুষ্মাণ্ডা দেবী বলা হয়ে থাকে। যা হোক, দেবী কিন্তু অষ্টভূজা। তাঁর সাতটি হাতে সাতটি উপকরণ যথাক্রমে—কমণ্ডলু, ধনু, বাণ, পদ্মফুল, অমৃতপূর্ণ কলস, চক্র এবং গদা ধারণ করে রয়েছেন। তাঁর অষ্টম হাতে রয়েছে সকল সিদ্ধি ও নিধি প্রদানকারী জপমালা। দেবীর বাহন সিংহ।

**সুরাসম্পূর্ণকলশং রুধিরাপ্লুতমেব চ।**
**দধানা হস্তপদ্মাভ্যাং কুষ্মাণ্ডা শুভদাস্তমে।।**

নবরাত্র পূজার চতুর্থ দিনে এই কুষ্মাণ্ডা দেবীরই আরাধনা করা হয়। এদিনে সাধকের মন "অনাহত" চক্রে অবস্থান করে। সুতরাং এদিনে সাধকের অত্যন্ত পবিত্র ও অচঞ্চল মনে কুষ্মাণ্ডা দেবীর ধ্যান করতে করতে পূজারাধনা করা উচিত। মা কুষ্মাণ্ডা দেবীর আরাধনা করলে সকল রোগ দূরে যায়। তাঁর প্রতি ভক্তির দ্বারা আয়ু, বল, যশঃ ও আরোগ্য লাভ করা যায়। মানুষ পবিত্র হৃদয়ে তাঁর শরণাপন্ন হলে সে সুষ্ঠুভাবেই পরম পদ লাভেও সক্ষম হয়।

**স্কন্দমাতা**

মায়ের পঞ্চম রূপটি হল **স্কন্দমাতা**। স্কন্দ হলেন দেবসেনাপতি কার্তিক। দেবী কার্তিক -জননী, তাই তিনি স্কন্দমাতা। তিনি কিভাবে স্কন্দমাতা হলেন সেকথা অনেকটাই বলা হয়েছে দেবীর প্রথম রূপ শৈলপুত্রীর বর্ণনায়। তদুপরি যা বলার থাকে তা হল—দেবী জগজ্জননী হিমালয়ের ঘরে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। নাম উমা। তিনি তখন কৈশোরে। দেবতাদের পরামর্শ অনুযায়ী কামদেব শিবের ধ্যান ভাঙ্গানোর জন্য ফুলধনু ধারণ করলেন। কিন্তু ফুলধনু হাতে নিতে না নিতেই মহাদেবের রুদ্র দৃষ্টিতে মদন ভস্মীভূত হয়ে যান। পার্বতী সে সংবাদ জেনে বুঝলেন এভাবে শিবকে বিচলিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তখন তিনিও বসলেন তপস্যায়। সে কঠোর তপস্যায় শিবের ধ্যান ভাঙ্গে। তপস্যায় জয়ী হন পার্বতী। উভয়ের হয় মিলন—মহামিলন। দেবতাদেরও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। জন্ম নেন দেবসেনাপতি কার্তিক। মা'ও জগতে পরিচিতা হলেন স্কন্দমাতা নামে।

**স্কন্দমাতা নিত্যং পদ্মাশ্রিতকরদ্বয়া।**
**শুভদাস্তু সদা দেবী স্কন্দমাতা যশস্বিনী।।**

এই স্কন্দমাতার যে রূপ বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় ইনি চতুর্ভুজা। কোলে তাঁর বালকরূপী স্কন্দ। তিনি ডানদিকের উপরের হাতে বালককে ধরে রয়েছেন। এবং নীচের হাতটি উপরের দিকে রয়েছে।

তাতে রয়েছে পদ্মফুল। দেবীর বামদিকের উপরের হাতটি নীচে নেমেছে বরাভয় মুদ্রারূপে, আর নীচের হাতটি উপরে উঠেছে। তাতেও একটি পদ্মফুল। দেবী পদ্মের উপর সমাসীনা। তাঁর বাহন সিংহ।

নবরাত্র পূজার পঞ্চম দিনে এঁর আরাধনা করা হয়। সাধকের মন এ-দিন বিশুদ্ধ চক্রে অবস্থান করে। মাকে আরাধনায় ভক্ত-সাধকের সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। এই পৃথিবীতেই তিনি পরম শান্তি ও সুখ লাভ করেন। দেবীর কৃপায় মোক্ষও তাঁর করায়ত্ত হয়ে যায়। দেবীর পূজা করার সঙ্গে সঙ্গে স্কন্দ ভগবানেরও আরাধনা করার নিয়ম।

**কাত্যায়নী**

দেবী ভগবতীর ষষ্ঠরূপের নাম **কাত্যায়নী**। মহর্ষি কাত্যায়ন এই দেবীর প্রথম অর্চনা করেন বলে এঁর নাম কাত্যায়নী। দেবতারা নিজ নিজ দেহের তেজ দ্বারা এই দেবীকে সৃষ্টি করেন। মহিষাসুর নিজের সৈন্য ও সেনাপতিসহ এই দেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে সদলবলে নিহত হন। দশভুজা সিংহবাহিনী দেবী আশ্বিনের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে সৃষ্ট হন ও শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমীতে ঋষি কাত্যায়নের পূজা নিয়ে দশমীতে মহিষাসুরকে বধ করেন। বাংলায় ও বাংলার বাইরে যে দুর্গাপূজা হয়, তা এই দেবীরই পূজা। এমনও জানা যায় সতীর দেহ একান্ন খণ্ডে খণ্ডিত হলে তার একটি খণ্ড শ্রীধাম বৃন্দাবনেও পড়ে। সেখানে দেবী কাত্যায়নীরূপে বিরাজিতা। অনেকের মতে দেবী কাত্যায়নী চতুর্ভুজা। তাঁর গাত্রবর্ণ সোনার ন্যায় উজ্জ্বল। রূপ অতি সুষমামণ্ডিত এবং দিব্য। দেবীর ডানদিকের উপরের হাতে অভয়মুদ্রা এবং নীচের হাতে বরমুদ্রা। বামদিকের উপরের হাতে তলোয়ার এবং নীচের হাতে পদ্মপুষ্প শোভিতা। দেবী সিংহবাহনা।

**চন্দ্রহাসোজ্জ্বলকরা শার্দূলবরবাহনা।**
**কাত্যায়নী শুভং দদ্যাদ্‌দেবী দানবঘাতিনী।।**

দুর্গাপূজার ষষ্ঠদিনে দেবীর এই রূপের পূজা হয়। তন্ত্র-সাধকদের

মতে—এদিন সাধকের মন 'আজ্ঞা' চক্রে স্থিত হয়। যোগসাধনায় এই আজ্ঞাচক্রের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই চক্রে স্থিত মনসম্পন্ন সাধক মা কাত্যায়নীর শ্রীচরণে নিজের সর্বস্ব নিবেদন করেন। পরিপূর্ণভাবে আত্মনিবেদনকারী এরকম ভক্ত মা কাত্যায়নীর সহজেই দর্শন লাভ করে এবং তার ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ ফলপ্রাপ্তিও ঘটে। প্রসঙ্গতঃ, ভাগবতে দেখা যায়, গোপকুমারীগণ নন্দ-গোপসুতকে পতিরূপে পাবার জন্য, দেবী কাত্যায়নীর অর্চনা করেছিলেন এবং দেবী তাঁদের আরাধনায় তুষ্টা হয়ে প্রার্থনা পুরণ করেছিলেন।

**কালরাত্রি**

**একবেণী জপাকর্ণপূরা নগ্না খরাস্থিতা।**
**লম্বোষ্ঠী কর্ণিকাকর্ণী তৈলাভ্যক্তশরীরিণী।।**
**বামপাদোল্লসল্লোহলতাকণ্টকভূষণা।**
**বর্ধনমূর্ধধ্বজা কৃষ্ণা কালরাত্রির্ভয়ঙ্করী।।**

মা দুর্গার সপ্তম শক্তি ও রূপের নাম হল **কালরাত্রি**। দেবীর রূপ বর্ণনায় বলা হয়েছে— তাঁর গাত্রবর্ণ ঘন অন্ধকারের মত কালো। মাথার চুলগুলি এলোমেলো। গলায় বিদ্যুৎ চমকের মতো উজ্জ্বল মালা। তাঁর তিনটি নেত্র। নেত্রগুলি ব্রহ্মাণ্ডের মতো গোল গোল। এবং সেই নেত্রগুলি থেকে বিদ্যুতের মত দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এঁর নাসিকার শ্বাস-প্রশ্বাসে ভয়ঙ্কর আগুনের শিখা নির্গত হয়। দেবীর বাহন গর্দভ। তাঁর ডানহাতে বরমুদ্রা, ডানদিকের নীচের হাতে অভয় মুদ্রা। এবং বামদিকের উপরের হাতে লোহার কাঁটা ও বামদিকের নীচের হাতে খড়্গ ধরে রয়েছেন।

দেবী কালরাত্রির রূপ যদিও ভয়ানক, তবুও ইনি সবসময় শুভ ফলই প্রদান করেন। সেজন্য দেবীর আর একনাম "শুভঙ্করী" তিনি দুষ্টের বিনাশকারিণী এবং শিষ্টের পালনকর্ত্রী।

দুর্গাপূজায় নবরাত্রির সপ্তম দিনে মা কালরাত্রির পূজা করার বিধান।

তন্ত্রসাধকদের মতে—সেদিন সাধকের মন "সহস্রার" চক্রে অবস্থান করে। সে কারণে ব্রহ্মাণ্ডের সকল সিদ্ধির দ্বার তাঁর নিকট উন্মুক্ত হয়ে যায়। এই চক্রে অবস্থিত সাধকের মন সম্পূর্ণভাবে মা কালরাত্রির স্বরূপে অবস্থান করে। তাঁর দর্শন লাভ হলে সাধক মহাপুণ্যের ভাগী হন। তাঁর সমস্ত পাপ ও বাধা-বিঘ্ন দূর হয়ে যায়। তিনি হন অক্ষয় পুণ্যধামের অধিকারী।

**মহাগৌরী**

**শ্বেতে বৃষে সমারূঢ়া শ্বেতাম্বরধরা শুচিঃ।**
**মহাগৌরী শুভং দদ্যান্ মহাদেবপ্রমোদদা।।**

মা দুর্গা অষ্টম শক্তির যে রূপ—তিনিই হলেন মহাগৌরী। এঁর গাত্রবর্ণ সম্পূর্ণ গৌর। তাঁর গাত্রবর্ণ এতই গৌর যে তা একমাত্র শঙ্খ, চন্দ্র এবং কুন্দ ফুলের সঙ্গেই তুলনীয়। দেবীর চারটি হাত। সেই চার হাতে রয়েছে যথাক্রমে—ডানদিকের উপরের হাতে অভয় মুদ্রা, নীচের হাতে ত্রিশূল। বামদিকের উপরের হাতে ডমরু এবং নীচের হাতে বরমুদ্রা। তাঁর ভঙ্গিমা অত্যন্ত শান্ত। দেবী বৃষভবাহনা।

শোনা যায়—শিবকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য দেবী কঠোর তপস্যা করেন। সে তপস্যার প্রভাবে তাঁর সুন্দর গাত্রবর্ণ কালো হয়ে যায়। এরপর তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান শঙ্কর তাঁর প্রার্থনা পূরণ করলেন এবং তাঁকে গঙ্গার জলে স্নান করান। তখন তাঁর শরীর বিদ্যুৎ প্রভার ন্যায় অতি কান্তিময়ী গৌরবর্ণা হয়ে যায়। সেই থেকেই দেবীর নাম হল মহাগৌরী।

আরো কেউ কেউ বলেন—দেবাদিদেব একদিন কালরাত্রি দেবীকে উপহাস করলেন কালো মেয়ে বলে। দেবীর তাতে অভিমান হল। কালো রং দিলেন স্বামীকে। আর নিজে হলেন গৌরী। শুধু গৌরী নন; মহাগৌরী বিদ্যুৎবর্ণা। দেবাদিদেব হলেন নারায়ণ এবং দেবী হলেন শ্রীলক্ষ্মী।



শৈলপুত্রী



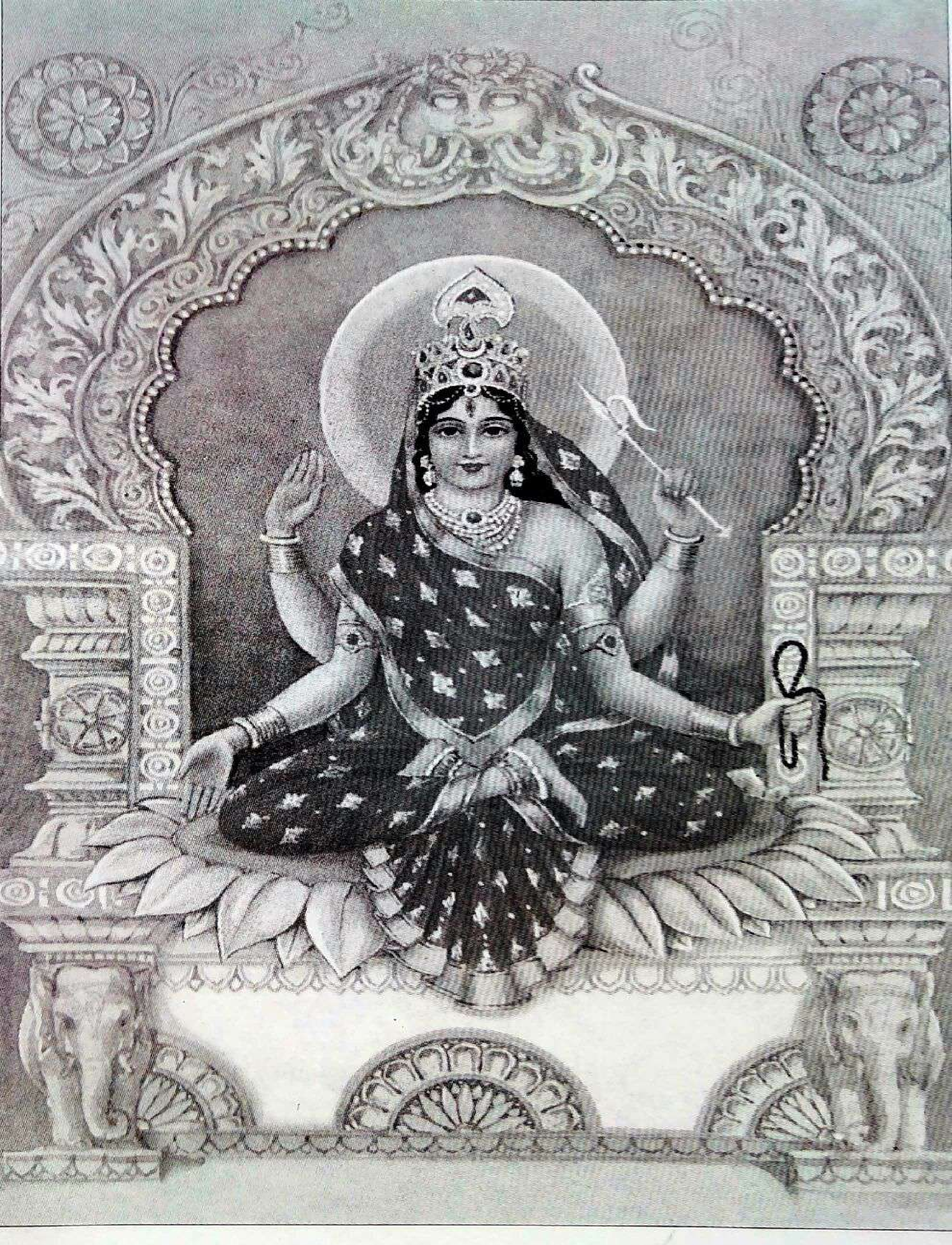
ব্রহ্মচারিণী



চন্দ্রঘণ্টা



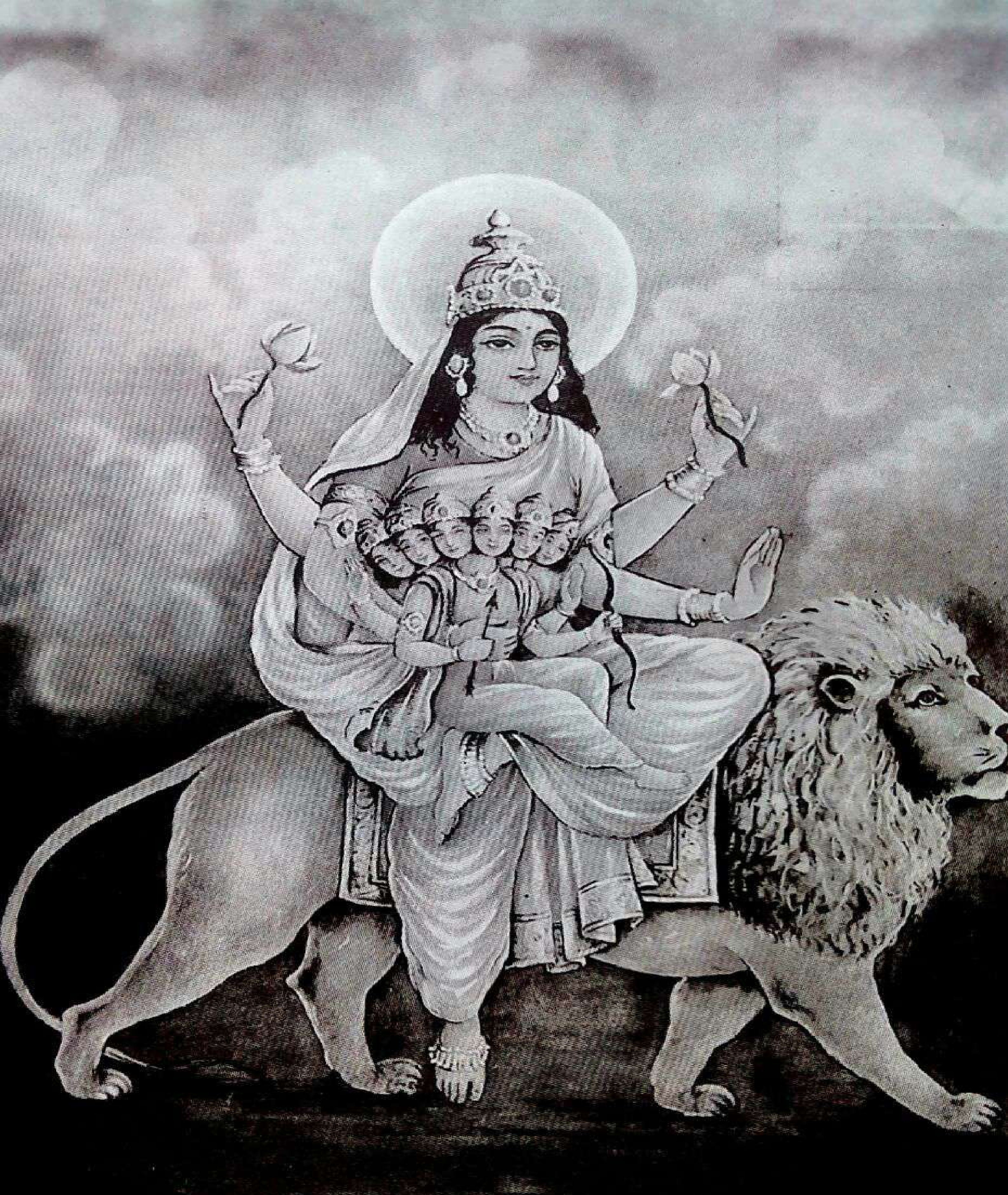
কূষ্মাণ্ডা



ভুবনেশ্বরী



ত্রিপুরভৈরবী



স্কন্দমাতা



কাত্যায়নী



কালরাত্রি



মহাগৌরী



সিদ্ধিদাত্রী



কালী



তারা



ছিন্নমস্তা



ষোড়শী



ধূমাবতী



বগলামুখী



মাতঙ্গী



কমলা

দুর্গাপূজায় নবরাত্রির অষ্টম দিনে মহাগৌরী পূজার বিধান। এঁরও শক্তি অমোঘ এবং দেবী সদ্য ফলদায়িনী। এঁর উপাসনায় ভক্তের সকল কলুষনাশ হয়। তার পূর্ব সঞ্চিত পাপও দূরে যায়। ভবিষ্যতেও পাপ-তাপ, দুঃখ-দৈন্য কখনও তার কাছে আসে না। সে সবরকম পবিত্রতা ও অক্ষয় পুণ্যের অধিকারী হয়। মা মহাগৌরীর ধ্যান, স্মরণ-মনন্ এবং পূজা ও আরাধনা ভক্তের পক্ষে সর্ববিধ কল্যাণপ্রদ।

**সিদ্ধিদাত্রী**

**সিদ্ধগন্ধর্বযক্ষাদ্যৈর্ অসুরৈর্ অমরৈরপি।**
**সেব্যমানা সদা ভূয়াৎ সিদ্ধদা সিদ্ধিদায়িনী।।**

সাধককে সকল কাজে সিদ্ধি প্রদান করেন যিনি তিনিই **সিদ্ধিদাত্রী**। সেটিই মায়ের নবম রূপ। মায়ের রূপ বর্ণনায় জানা যায়—তাঁর হাত চারটি। বাহন সিংহ। আবার কখনও তিনি পদ্মাসনা। এঁর ডানদিকের নীচের হাতে চক্র, উপরের হাতে গদা এবং বামদিকের নীচের হাতে শঙ্খ এবং উপরের হাতে পদ্মফুল। নবরাত্রির নবম দিনে দেবী সিদ্ধিদাত্রীর পূজা করা হয়। এদিন শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী এবং পূর্ণ নিষ্ঠাসহ যিনি তাঁর সাধনা করেন, তাঁর সকল সিদ্ধি প্রাপ্তি ঘটে। জগতে কোন কিছুই তাঁর অধরা থাকে না। তিনি পূর্ণ বিজয় লাভের ক্ষমতা লাভ করেন।

ইনি সবরকমের সিদ্ধিপ্রদান করেন। অণিমা, গরিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব এবং বশিত্ব এই আট রকমের সিদ্ধিই দেবী সিদ্ধিদাত্রীর করুণায় সাধক পেতে পারেন।

মহাভারতে দেখা যায়—কুরক্ষেত্র রণাঙ্গনে কৌরব ও পাণ্ডবের মধ্যে যখন যুদ্ধ সমাসন্ন, সে-সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য তুমি মা দুর্গার স্তব কর। স্তবটি এই গ্রন্থেও উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে শ্রীভগবান অর্জুনকে দেবীর যে রূপের স্তব করতে আদেশ করেন—তিনিই সিদ্ধিদাত্রী স্বরূপিণী। অর্জুনের স্তবে সন্তুষ্টা দেবী তাঁকে দর্শন দিয়ে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত বরও প্রদান করেন।

# দশরূপে মা মহামায়া

## (দশ মহাবিদ্যা)

ব্রহ্ম স্বরূপিণী জগন্মাতার কথা কি বলে শেষ করা যায়? কার সাধ্য তাঁর কথা বলে শেষ করতে পারে? আর যিনি ব্রহ্মময়ী তাঁর কথা কে-বা জানে কতটুকু? তবু শাস্ত্র থেকে জেনে যদি কেউ মায়ের কৃপায় মায়ের কথা বলতে চায়, তবে দেখা যাবে মায়ের অনন্ত রূপ, অনন্ত ঐশ্বর্য, অনন্ত লীলা। সবই সেই আদ্যাশক্তি মহাশক্তি মহামায়ারই লীলা। এসব তাঁরই প্রকাশ, তিনিই সব, আবার সবই তিনি। মায়ের প্রসঙ্গে আলোচনা হলে মায়ের দশ মহাবিদ্যার কথাটিও সঙ্গতভাবেই এসে যায়। দশ মহাবিদ্যা হল মায়েরই দশ রূপ, ঘটনা প্রসঙ্গে যা প্রকাশিত হয়েছিল। আবার সেই লীলার মধ্য দিয়েও জগৎ-কল্যাণকারিণী মা জগতকল্যাণ, জীবেরই কল্যাণই হয়তো করে চলেছেন। তিনি মহামায়া, সুতরাং তাঁর মায়াময় লীলার রহস্য বোধগম্য হওয়া অতীব দুষ্কর। অবশ্য তাঁদেরই পক্ষে তাঁকে অর্থাৎ মাকে বা মায়ের লীলাকে কিছুমাত্রও বুঝতে পারা সহজ হয়—যাঁরা তাঁর করুণাবলে বলীয়ান, তাঁর আশীর্বাদে পুষ্ট, তাঁর শক্তিতে শক্তিমান। তবে মায়ের লীলার যতই আলোচনা হয় তার দ্বারা জীবেরই কল্যাণ হয়—একথা যেমন দ্বিধাহীনভাবে সঠিক, তেমনি একথাও আরও সঠিক যে, যিনি নিরাকারা, নির্গুণা আবার প্রয়োজনে তাঁর রূপেরও অন্ত নেই—যে যেভাবেই তাঁর পূজা করুক, আরাধনা করুক না কেন তার দ্বারা একমাত্র সেই মা অম্বিকা, সেই পরমেশ্বরীরই আরাধনা করা হয়। যেজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদগীতার চতুর্থ অধ্যায়ের এগারো নং শ্লোকে বলেছেন—

**যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।**
**মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।**

অর্থাৎ—হে পার্থ, যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে আমি তাকে সেইভাবে তুষ্ট করি। মনুষ্যগণ যে যে পথের অনুসরণ করুক না কেন,

সেসব আমারই পথ।

সে কথা যাক্, এবার আমরা তাহলে শুনি মায়ের দশ মহাবিদ্যার প্রকাশ কেন হল? কবে হল? সেসব রূপের বর্ণনাই বা কি?

দেবাদিদেব মহাদেবের স্ত্রী ছিলেন সতী। সতী ছিলেন দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। তখ্নও সতী শিবের ঘরণী হননি। তবে হওয়ার আয়োজন হচ্ছে। অর্থাৎ মহারাজ দক্ষ তাঁর পক্ষ থেকে ছোট মেয়েটির বিয়ের জন্য তখনকার নিয়ম অনুযায়ী স্বয়ম্বর-সভা ডেকেছেন। সকল গুণে গুণসম্পন্না পরমা সুন্দরী ষোড়শী সতীকে স্ত্রীরূপে পাওয়ার আশায় অসংখ্য রাজা-মহারাজা, দেব ও অমরবৃন্দ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। মহারাজ দক্ষ সকল অতিথির যথাযথ সম্মানের ব্যবস্থা করায় অতিথিগণ সকলেই খুশী। স্বয়ম্বর সভা দেখতে বহু মানুষের ভীড় হয়েছে, তারপর যথা সময়ে ঘোষক এসে সভায় ঘোষণা করলেন যে, এখন স্বয়ম্বর সভার কাজ শুরু হল। অর্থাৎ সতী এখন নিজেই সমাগত অতিথিদের মধ্য থেকে তাঁর মনোমত পতি নির্বাচন করে নেবেন। সলজ্জ নয়নে, সখিগণে পরিবৃতা হয়ে সতী হাতে বরমাল্য নিয়ে উপস্থিত হলেন সভায়। অতিথিগণও উৎকণ্ঠিত। কারণ সকলেই তো সতীর পতি হতে চান, অতএব তাঁরা তাঁর বরমাল্যেরও প্রত্যাশী। সকলেই ভাবছেন সতী হয়তো তাঁর গলাতেই বরমাল্য দিয়ে তাঁকেই পতিরূপে বরণ করবেন। কিন্তু অনন্যচিত্তা সতী কোন লোকের দিকে না তাকিয়ে, ধীর পদে সকলকে অতিক্রম করে সকলের শেষে আসনে উপবিষ্ট শ্মশানচারী ভোলা মহেশ্বরের গলায় দিলেন বরমাল্য। তাঁকেই করলেন নিজ পতিরূপে নির্বাচন।

মহারাজ দক্ষ নিজ কন্যার এমন আচরণে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। কারণ স্বভাবতঃই বাবা-মা'রা চান তাঁর জামাই হবেন গুণে গুণী, ধনে ধনী ও মানে মানী। কিন্তু শিব তো শ্মশানে-মশানে থাকেন। ভূত-প্রেত নিয়ে ঘুরে বেড়ান। গায়ে মাখেন ছাই-ভস্ম। খান ভিক্ষা করে।

সুতরাং তিনি কি সতীর মত রূপবতী গুণবতী মেয়ের স্বামী বা প্রজাপতি দক্ষের জামাই হওয়ার উপযুক্ত ! ঘটনায় নিজেকে বড়ই অপমানিত বোধ করলেন প্রজাপতি। হলেন রাগান্বিতও। তখন রাগে অস্থির রাজা দক্ষ সতী ও শিবকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আয়োজন করলেন এক শিবহীন যজ্ঞের। স্বর্গ-মর্ত্যের সকল দেবতারা ও রাজারা সেই যজ্ঞের আমন্ত্রণ পেলেন, কিন্তু আমন্ত্রিত হলেন না শুধুমাত্র কন্যা-জামাতা সতী ও শিব।

প্রসঙ্গতঃ বলি শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—দক্ষ রাজার আহূত যজ্ঞসভায় সকল দেবতা, মুনি-ঋষির সমাগমে পরিপূর্ণ। সে-সভায় দক্ষ প্রজাপতি এসে উপস্থিত হলে দেবতা, মুনি, ঋষি সকলেই তাঁকে উঠে দাঁড়িয়ে সম্বর্ধনা দিলেন। সভায় দাঁড়ালেন না ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। রাজা দক্ষের মনে হল ব্রহ্মা আমার পিতা, বিষ্ণু ত্রিজগতের পালন কর্তা সুতরাং এঁরা না দাঁড়িয়ে ঠিকই করেছেন। কিন্তু শিব কেন উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে অভিবাদন জানালো না? সে তো সতীর বর, আমার জামাই। শ্বশুরকে দেখে জামাই কেন সম্মান দেখাবে না? সুতরাং তার ফলে প্রজাপতি দক্ষ খুবই অপমানবোধ করলেন। তারপর জামাই শিবকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্যই ওই যজ্ঞের আয়োজন করেন।

যা হোক, সতীকে আমন্ত্রণ না জানানো হলেও তিনি খবর পেয়ে গেলেন যে, তাঁর বাবা বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। যদিও আমন্ত্রণ পাননি, তবুও বাপের বাড়ীতে যেতে মেয়ের আপত্তি কি? চিন্তা করে সতী ঠিক করেন তাঁকে আমন্ত্রণ না জানানো হলেও তিনি যজ্ঞে যোগ দিতে বাবার বাড়ীতে যাবেন। সেই চিন্তা করে স্বামী শিবের কাছে গিয়ে বাবার বাড়ীতে যাওয়ার আদেশ চাইলেন। কিন্তু শিব তাঁকে আদেশ দিতে রাজী হলেন না। সতী তবু বারে বারে স্বামীর কাছে কাতর অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগলেন আদেশ দেওয়ার জন্য। প্রিয়তমা অর্ধাঙ্গিনীর মানসিক অবস্থা অবগত হয়ে শিব যজ্ঞের মর্মার্থ সম্পূর্ণ রূপে পরিজ্ঞাত

হয়ে সতীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—প্রিয়ে, সেখানে তোমার বাবার বাড়ী হলেও তুমি এখন বিবাহিতা কন্যা। অতএব বিনা নিমন্ত্রণে সেখানে যাওয়া তোমার উচিত নয়। অনাহূতা হয়ে যদি তুমি সেখানে যাও, তাহলে তুমি অপমানিতা হবে। তোমার স্বামীর নিন্দা তোমাকে শুনতে হবে। তুমি আমার প্রাণপ্রিয়া, প্রিয়তমা। স্বামীর নিন্দা শোনা তোমার পক্ষে হবে ভীষণ কষ্টের। তুমি তা সহ্য করতে পারবে না। আর তার পরিণামে যে বিষম পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তার ফলে তোমার, আমার, এমনকি তোমার বাবার পক্ষেও তা মহা অকল্যাণকর। সুতরাং তুমি তোমার বাবার বাড়ী যাওয়ার সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর।

শিব এত ভাবে বোঝানো সত্ত্বেও সতী নিজ সঙ্কল্পে রইলেন অটুট। শিব তখনও মহা অমঙ্গল পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে সতীকে বার বার নিষেধ করতে লাগলেন। কিন্তু সে নিষেধ শুনতে রাজী নন সতী। বাসনা যখন বাধা পায়, তখন মানুষের মনে আসে ক্রোধ। বারে বারে বাধা পেয়ে সতীর অন্তরও তখন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে লাগল। ক্রোধী মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সতীরও সেরকমই হল। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সতী তখন ভীমা ভয়ঙ্করী রণরঙ্গিণী কালী মূর্তি ধরে শিবের মনে ভয় দেখিয়ে তাঁর যাওয়ার অনুমতি আদায়ের চেষ্টা করলেন। কিন্তু যিনি স্বয়ং ভূতনাথ, বিশ্বজীবের সকল ভয়কে নিঃশেষে দূর করার ইচ্ছায় ভূতগণে পরিবৃত হয়ে অভয়দাতা রূপে যিনি শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ান, তাঁকে ভয় দেখানো যে বাতুলতা মাত্র! শিব তখন সতীকে সে রূপে দেখে মনে মনে হাসলেন। ব্যর্থকাম সতী তখন পুনরায় নিজের ইচ্ছা পূরণ করার আকাঙক্ষায় তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশরূপে প্রকাশিতা হলেন। যা শ্লোকাকারে—

**কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী**
**ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।**

বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা,
এতা দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।

(শ্রীমহাভাগবত পুরাণ)

এই দশ মহাবিদ্যারূপে প্রকটিতা হয়ে শিবের পথ আগলে দাঁড়ালেন সতী। শিব সতীর ওই দশ মহাবিদ্যা মূর্তি দেখে প্রসন্ন মুখে মৃদু হেসে রাগে উন্মত্তা প্রিয়তমা পত্নীকে সম্বোধন করে বললেন— "দেবি, তুমি আমার সংস্পর্শে রয়েছো বলেই এই মহা শক্তির অধিকারিণী হয়েছ্। আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে গেলে তোমার এই্ শক্তি আর থাকবে না। অতএব তুমি এই মহা অঘটন এড়াতে বাবার বাড়ীতে যাওয়ার বাসনা মন থেকে দূর করে দাও।"

শিব এত বলা সত্ত্বেও সতী নিজ সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হলেন না। বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়ে শিব সতীকে আর বাধা দিলেন না। স্বামীর আদেশ অমান্য করেই সতী বাবা দক্ষের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর আমরা জানি শিবহীন যজ্ঞে অনাহূতা সতীকে বাবা দক্ষ চূড়ান্ত অপমান করেন ও স্বামী শিবের নিন্দা শুনে শোকে দুঃখে সতী দেহত্যাগ করলেন। এরপর রুদ্র ও তাঁর ভৈরববাহিনীর তাণ্ডবে দক্ষযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হল। শিব সতীর মরদেহ কাঁধে করে প্রলয় নাচন নাচতে শুরু করেন। নারায়ণ সৃষ্টি রক্ষায় শিবের তাণ্ডব নৃত্য থামিয়ে দিতে সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহকে একান্ন খণ্ডে খণ্ডিত করলেন। যা আজও মায়ের একান্ন পীঠরূপে পৃথিবীতে বিদ্যমান।

এখানে সতীর যে দশ মহাবিদ্যার প্রকাশের কথা আমরা জানলাম, পুরাণমতে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এ-রকমই—

## কালী

মেঘাঙ্গী বিগতাম্বরা শবশিবারূঢ়া ত্রিনেত্রাপরা
কর্ণালম্বিতবাণযুগ্মলসিতা মুণ্ডাবলীমণ্ডিতা।
বামাধোর্ধ্বকরাম্বুজে নরশিরঃ খড়্গঞ্চ সব্যেতরে
দানাভীতিবিমুক্তকেশনিচয়া ধ্যেয়া সদা কালিকা।।

অর্থ—মেঘের বর্ণের মত অঙ্গকান্তিবিশিষ্টা, বিবসনা, শবকল্প শিবের উপরে দণ্ডায়মানা, ত্রিনয়না, দুই কর্ণ হতে দোদুল্যমান কুণ্ডলে বিভূষিতা, নরমুণ্ডসমূহে শোভিতা, বামদিকের নিম্ন ও ঊর্ধ্ব করকমলে নরমুণ্ড ও খড়্গধারণকারিণী, দক্ষিণদিকের দুই হস্তে বর ও অভয় দানকারিণী, আলুলায়িতা কেশকুন্তলা দেবী কালিকা সর্বদা (আমাদের সকলের) ধ্যানযোগ্যা।

### তারা

**প্রত্যালীঢ়সমর্পিতাঙ্ঘ্রিশবহৃদ্ ঘোরাট্টহাসা পরা।**
**খড়্গেন্দীবরকর্ত্তৃখর্পরভূজহূংকারবীজোদ্ভবা।**
**খর্ব্বানীলবিলাসপিঙ্গলজটাজুটোগ্রনাগৈর্যুতা**
**জাড্যং ন্যস্য কপালকে ত্রিজগতাং হন্ত্যুগ্রতারা স্বয়ম্।।**

অর্থ — শবদেহের বক্ষের উপরে প্রত্যালীঢ়* ভঙ্গিতে চরণস্থাপনকারিণী, ভয়ঙ্কর অট্টহাস্যে মুখরিতা, (হস্তে) খড়্গ, নীলপদ্ম, পরশু এবং নরকরোটি ধারণকারিণী, হুঙ্কাররূপ বীজ হতে সমুৎপন্না, বহুসহস্র ঘন নীল এবং পিঙ্গল বর্ণের জটাজালে পরিবৃতা, ত্রিভুবনের (সকল) জড়তা উগ্রমূর্তি তারা স্বয়ং পাত্রে একত্রিত করে (পৃথিবীর সকল অশুভ) দূর করেন।

### ষোড়শী

**বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্ব্বাহুং ত্রিলোচনাম্।**
**পাশাঙ্কুশশরাংশ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাং শ্রয়ে।।**

অর্থ—নবোদিত সূর্যমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তিমতী, চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না, (হস্তে) পাশ, অঙ্কুশ, বাণ (তীর) এবং চাপ (ছিলা) ধারণকারিণী মঙ্গলময়ীর (দেবী ষোড়শীর আমি) শরণাগত হই।

---

* প্রত্যালীঢ়—ধনুর্ধারীদের তীর নিক্ষেপের বিশেষ ভঙ্গিমা। এই ভঙ্গিতে বামপদ সামনে পুরোপুরি মাটিতে চরণতল জানুপর্যন্ত দণ্ডের মত উত্থিত। দক্ষিণ পদ থাকবে পিছনে ভূমি সংলগ্ন হয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার ভঙ্গিমায়।

### ভুবনেশ্বরী

**সূর্য্যকরদ্যুতিম্ ইন্দুকিরীটাং তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়যুক্তাম্।**
**স্মেরমুখীং বরদাঙ্কুশপাশাং ভীতিকরীং প্রভজেদ্ ভুবনেশ্বরীম্।।**

অর্থ—সূর্যরশ্মির ন্যায় দ্যুতিসম্পন্না, মুকুটে চন্দ্রধারণকারিণী, স্ফীতবক্ষা, ত্রিনয়না, স্মিতবদনা, (হস্তে) বর, অঙ্কুশ ও পাশ ধারণকারিণী, ভয়ঙ্করী দেবী ভুবনেশ্বরীকে (ভক্তের সর্বদাই) সম্যক্ ভজনা করা উচিত।

### ভৈরবী

**উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিম্ অরুণক্ষৌমাং শিরোমালিকাং**
**রক্তালিপ্তপয়োধরাং জপবটীং বিদ্যাম্ অভীতিং বরম্।**
**হস্তাব্জৈর্দ্দধতীং ত্রিনেত্রবিলসদ্ রক্তারবিন্দশ্রিয়ং**
**দেবীং বদ্ধহিমাংশুরত্নমুকুটাং বন্দে সমন্দস্মিতাম্।।**

অর্থ — উদীয়মান সহস্র সূর্যের ন্যায় কান্তিবিশিষ্টা, অরুণবর্ণের পট্টবস্ত্র পরিহিতা, মস্তকে মাল্য ধারণকারিণী, রক্তধারায় বক্ষদেশ অনুলিপ্ত, করকমলে জপমালা, পুস্তক, অভয় এবং বর ধারণকারিণী, রক্তপদ্মের ন্যায় উজ্জ্বল ত্রিনয়নে ভূষিতা, চন্দ্রকিরণের ন্যায় স্নিগ্ধ রত্নে নির্মিত মুকুটে শোভিতা, ঈষৎ স্মিতহাস্য-বিশিষ্টা দেবীকে (ভৈরবীকে আমি) বন্দনা করি।

### ছিন্নমস্তা

**প্রত্যালীঢ়পদাং সদৈব দধতীং ছিন্নং শিরঃ কর্ত্তৃকাং**
**দিগ্বস্ত্রাং স্বকবন্ধশোণিতসুধাধাং পিবন্তীং মুদা।**
**নাগাবদ্ধশিরোমণিং ত্রিনয়নাং হৃদ্যুৎপলালঙ্কৃতাং**
**রত্যাসক্তমনোভবোপরি দৃঢ়াং ধ্যায়েজ্ জবাসন্নিভাম্।।**

অর্থ — প্রত্যালীঢ় ভঙ্গীতে বর্তমানা, সর্বদা ছিন্ন মস্তক ও খড়্গে ভূষিতা, দিগ্‌বসনা, নিজ কবন্ধের দ্বারা সানন্দে অমৃতকল্প রক্তধারাপানে নিরতা, সর্পের মুকুটমণি দ্বারা ভূষিতা, ত্রিনয়না, বক্ষদেশ পদ্মে ভূষিত,

বিপরীত বিহারে রতা, জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণা দেবীকে (ছিন্নমস্তাকে সাধকের) দৃঢ়নিশ্চয়ে ধ্যান করা উচিত।

### ধূমাবতী

**বিবর্ণা চঞ্চলা রুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা।**
**বিমুক্তকুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা।।**
**কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিতপয়োধরা।**
**সূর্পহস্তাতিরুক্ষাক্ষী ধৃতহস্তা বরান্বিতা।।**
**প্রবৃদ্ধঘোণা তু ভৃশং কুটিলা কুটিলেক্ষণা।**
**ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা নিত্যং ভয়দা কলহপ্রিয়া।।**

অর্থ —নিষ্প্রভা, চঞ্চলস্বভাবা, কোপপরায়ণা, সুদীর্ঘা, মলিনবস্ত্র-পরিহিতা, মুক্তকেশা, রুক্ষমূর্তি, বিধবা, বিরল-দন্তা, অগ্নিময় রথে আরূঢ়া, শিথিলবক্ষা, হস্তে কূলাধারণকারিণী, অতিশয় রুক্ষনেত্র-বিশিষ্টা, বরপ্রদা, ছিন্নহস্ত-ধারিণী, চঞ্চুতুল্য দীর্ঘ নাসিকা-বিশিষ্টা, অত্যন্ত কুটিল প্রকৃতি এবং কুটিল দৃষ্টি-সম্পন্না। ক্ষুধা এবং পিপাসায় পীড়িতা, কলহপ্রিয়া (দেবী ধূমাবতী) সর্বদাই ভীষণা।

### বগলামুখী

**মধ্যে সুখাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদী-**
**সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।**
**পীতাম্বরাং কনকমাল্য-বিভূষিতাঙ্গীং দেবী স্মরামি**
**ধৃত মুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্।।**

অর্থ — সুখসাগরের মধ্যে মণিময় মণ্ডপে আচ্ছাদিত রত্ননির্মিত বেদীর উপরে স্থাপিত সিংহাসনে উপবিষ্টা, পীতবর্ণা, পীতবস্ত্র পরিহিতা, সুবর্ণনির্মিত মাল্যে সর্বশরীর বিভূষিত, (হস্তে) মুদ্গর (মুগুর) এবং শত্রুর জিহ্বা ধারণকারিণী দেবী বগলামুখীকে (আমি সর্বদা) স্মরণ করি।

### মাতঙ্গী

**শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রত্নসিংহাসনস্থিতাম্।**
**বেদৈর্ব্বাহু-দণ্ডৈরসি-খেটক-পাশাঙ্কুশধরাম্।।**

অর্থ—শ্যামাঙ্গ-বিশিষ্টা, মস্তকে চন্দ্রধারণকারিণী, ত্রিনয়না, রত্ন-নির্মিত সিংহাসনোপরি উপবিষ্টা, চার সুদৃঢ় বাহুতে খড়্গ, খেটক, পাশ এবং অঙ্কুশ ধারণকারিণী (দেবী মাতঙ্গীকে) আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

### কমলা

**কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভ্যাং হিমগিরিপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈ-**
**র্হস্তোৎক্ষিপ্তহিরন্ময়াপ্তামৃতঘটৈরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্।**
**বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মম্ অভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাং**
**ক্ষৌমাবদ্ধনিতম্বললিতাং বন্দেঽরবিন্দস্থিতাম্।।**

অর্থ — যিনি দীপ্তিতে হিরণ্যতুল্যা, সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী যে দেবীকে হিমালয়ে উদ্ভুত চারটি হস্তী শুণ্ডের দ্বারা অমৃতপূর্ণ কলসের জলে সর্বদা অভিষেকে রত, যিনি তাঁর চারিটি হস্তে বর, পদ্মযুগল এবং অভয় ধারণ করে আছেন, মস্তকে যিনি উজ্জ্বল মুকুটধারণকারিণী, যিনি কটিদেশে ক্ষৌমবস্ত্র পরিহিতা, লাবণ্যময়ী এবং পদ্মাসনে উপবিষ্টা (সেই দেবী কমলাকে আমি) বন্দনা করি।

আমরাও এখন মায়ের দশ মহাবিদ্যার সেই গানটি গেয়ে বলি—

কে জানে মা তব মায়া মহামায়ারূপিণী
বিরাজ সর্বত্র তুমি মা বিশ্বব্যাপিনী।
প্রথমে মা মহাকালী, দ্বিতীয়ে মা তারা
তৃতীয়ে ষোড়শী রূপী পূজিলে ত্রিপুরা
চতুর্থে ভুবনেশ্বরী, পঞ্চমে ভৈরবী নারী
কেমন বিচিত্রময়ী মা হরমনোমোহিনী।

ষষ্ঠেতে ছিন্নমস্তারূপ ধারণ করিলে
নিজ মুণ্ড খণ্ড করি করেতে ধরিলে
ত্রিধারাতে রক্ত পড়ে একধারা নিজে পান করে
দুই ধারা দুই ধারে পড়ে মা দুই ধারে দুই যোগিনী।
সপ্তমেতে ধূমাবতী অষ্টমে বগলা
নবমে মাতঙ্গী রূপ দশমে কমলা
আসা-যাওয়া বারে বারে
প্রাণে তো সহে না আর এ
নিজগুণে ক্ষমা কর মা
অজ্ঞানে জ্ঞানদায়িনী।

## শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠে অপরাধের জন্য দেবীর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা কেন?

যাঁরা শাস্ত্রবিষয়ে সুপণ্ডিত বা অত্যন্ত জ্ঞানী তাঁদেরই পক্ষে শাস্ত্র যথানিয়মে ও যথাযথভাবে পাঠ করা সম্ভব। কিন্তু যাঁরা তা নন—তাঁদের ভুলভ্রান্তি অসম্ভব নয়। আর ওই ভুল হয়তো সামান্য, কিন্তু তারই জন্য অপরাধ হয়ে যায় ভীষণ — যার ফলও হতে পারে মারাত্মক। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—একই রকমের উচ্চারণ কিন্তু অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন—দীপ, দ্বিপ, দ্বীপ। এখানে উচ্চারণের ও বানানের তারতম্য অনুযায়ী অর্থ হবে—দীপ—অর্থাৎ প্রদীপ, দ্বিপ—অর্থাৎ হাতি, দ্বীপ— অর্থাৎ চারিদিকে জলের মাঝখানে যে ভূমিখণ্ড। সুতরাং লেখার সময় বানান যেমন সঠিক হওয়া প্রয়োজন, তেমনি উচ্চারণের সময়ও যথেষ্ট সতর্কতা দরকার।—যার অভাব অসম্ভব নয়। আরও বলা যায়—'সাবর্ণিস্তনয়ো রবেঃ'—কথাটির অর্থ —রবির পুত্র সাবর্ণি। কিন্তু উচ্চারণের সময় যদি বিসর্গ উচ্চারিত না হয়, তবে অর্থ হয়ে যাবে — 'শব্দে পুত্র সাবর্ণি'—যা সম্পূর্ণ ভুল। এ-রকমই হল—'জ্ঞানেঽপি সতি'। অর্থ হল — জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, কিন্তু সতি উচ্চারণের সময় দীর্ঘ হয়ে গেলে তা হয়ে যাবে 'সতী'। তখন অর্থ পরিবর্তিত হয়ে পুরো কথাটির অর্থ হবে—'জ্ঞান দক্ষকন্যা সত্ত্বেও'। আরো একটি উদাহরণ দিই—'নন্দগোপগৃহে জাতা', অর্থাৎ নন্দগোপের গৃহে জাত। জাতা কথাটি উচ্চারণের সময় য হয়ে গেলে অর্থ হয়ে যাবে—নন্দগোপের গৃহে গত বা স্বামীর ভ্রাতৃবধূ।

তাই শাস্ত্র আমাদের যেমন যথাযথভাবে পাঠ করার চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে, তেমনি শাস্ত্রপাঠের সময় অজ্ঞাতসারে বা অনিচ্ছায় হয়তো ভুল হয়েই থাকতে পারে মনে করেই আমাদের জ্ঞানী শাস্ত্রকারগণ শাস্ত্রপাঠ শেষে শাস্ত্রপাঠজনিত অপরাধের জন্য সেই শাস্ত্রের দেবতার

বা দেবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার ব্যবস্থা করেছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠের পরেও তেমন ক্ষমা প্রার্থনা করার ব্যবস্থা আছে। এটিকে বলা হয় — "শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠাপরাধ-ক্ষমাপণ-স্তোত্রম্।" স্তোত্রটি এখানে অর্থসহ উল্লেখ করা হল—

**ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।**
**পূর্ণং ভবতু তৎ সর্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি।। ১**
**যদত্র পাঠে জগদম্বিকে ময়া বিসর্গবিন্দ্বক্ষরহীনমীরিতম্।**
**তদস্তু সম্পূর্ণতমং প্রসাদতঃ সঙ্কল্পসিদ্ধিশ্চ সদৈব জায়তাম্।।২**
**যন্মাত্রা-বিন্দু-বিন্দুদ্বিতয়-পদ-পদদ্বন্দ্ব-বর্ণাদিহীনম্।**
**ভক্ত্যা ভক্ত্যানুপূর্বং প্রসভকৃতিবশাদ্** ব্যক্তম্ অব্যক্তমম্ব।**
**মোহাদ্ অজ্ঞানতো বা পঠিতম্ অপঠিতং সাম্প্রতং তে স্তবেঽস্মিন্**
**তৎ সর্বং সাঙ্গমাস্তাং ভগবতি বরদে ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রসীদ।।৩**
**প্রসীদ ভগবত্যম্ব। প্রসীদ ভক্তবৎসলে।।**
**প্রসাদং কুরু মে দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে।।৪**
**যস্যার্থে পঠিতং স্তোত্রং তবেদং শঙ্করপ্রিয়ে।**
**তস্য দেহস্য গেহস্য শান্তির্ভবতু সর্বদা।।৫**

**ওঁ তৎ সৎ ওঁ**

অর্থাৎ—হে দেবি মহেশ্বরি। এই শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ করার সময় (মন্ত্রে) আমার যে-সকল অক্ষর পরিভ্রষ্ট ও মাত্রাহীন হয়েছে, তোমার কৃপায় সে-সকল সম্পূর্ণ হোক।

হে জগদম্বিকে, এই পাঠে আমি যে বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু বা অক্ষরবিহীন (মন্ত্রে) উচ্চারণ করেছি, তা তোমার কৃপায় সম্পূর্ণ হোক এবং যেন আমার সঙ্কল্প সদাই সিদ্ধ হয়।

হে জগদম্বে, সদ্যই তোমার এই স্তব পাঠ করার সময় ভক্তিতে বা অভক্তিতে, তাড়াতাড়ি পড়ার ফলে, স্পষ্ট বা অস্পষ্ট উচ্চারিত হওয়ায়

এবং অনুস্বার, বিগর্স, পদ, সমাস বা বর্ণাদির যে বিচ্যুতি ঘটেছে—যা মোহরূপে বা অজ্ঞানতার কারণে পাঠ করা হয়েছে বা পাঠ করা হয়নি, হে বরদায়িনি দেবি ভগবতি, তোমার প্রসাদে সে সকলই পূর্ণ হোক। হে দেবি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও।

হে জননি ভগবতি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে ভক্তবৎসলে, আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে দেবি আমাকে কৃপা কর। হে দেবি দুর্গে, তোমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি।

হে শঙ্করপ্রিয়ে, তোমার এই মাহাত্ম্য—যার জন্য পাঠ করা হল, তার বাড়ীর ও শরীরের সর্বদা কল্যাণ বা শান্তি হোক।

—ঃঃ—

## শ্রীশ্রীদুর্গার অষ্টোত্তর-শতনাম স্তোত্র

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুর্গানাম জানিবে অন্তরে। ১
দুঃখহরা নাম মোর হয় তার পরে॥ ২
আর নাম ধরি আমি কৃতান্তদমনী। ৩
অনেকে আমারে ডাকে নামে কাত্যায়নী॥ ৪
ভবেশ-গৃহিণী হয় মোর এক নাম। ৫
জগতজননী নাম খ্যাত সর্ব্বধাম॥ ৬
আর এক নাম মম হয় মহামায়া। ৭
আমারে জানিবে দোঁহে নামে কালজায়া॥ ৮
ত্রিদিব-জননী নামে অনেকেই ডাকে। ৯
ভক্তগণ ডাকে বলি জয় মা কালীকে॥ ১০
করালিনী এক নাম জানিবে আমার। ১১
কপালমালিকা নাম খ্যাত ত্রিসংসার॥ ১২
কালরাত্রি নাম মোর আগম-ভিতরে। ১৩
কৃপাময়ী নাম মোর সর্ব্বদুঃখ হরে॥ ১৪
উমা নামে হিমালয়ে আমি বিরাজিতা। ১৫
মহোদরী নামে হই সর্ব্বত্র পূজিতা॥ ১৬
অন্নপূর্ণা নামে করি অন্ন বিতরণ। ১৭
মাতঙ্গী নামেতে সবে করয়ে অর্চ্চন॥ ১৮
সত্যসনাতনী নাম বিদিত ভুবনে। ১৯
ব্রহ্মাণ্ড-জননী নামে পূজে বহু জনে॥ ২০
সর্ব্বত্র বিখ্যাত হই নামেতে শিবানী। ২১
আর নাম হয় মম জগত-তারিণী॥ ২২
ইন্দ্রাণী নামেতে পূজে বহু বহু জন। ২৩
সর্ব্বাণী নামেতে আমি খ্যাত ত্রিভুবন॥ ২৪
গণেশ-জননী নাম গণপতিপুরে। ২৫
রাজরাজেশ্বরী নাম খ্যাত চরাচরে॥ ২৬
বগলা নামেতে পূজে বহু ভক্তগণ। ২৭
কমলা নামেতে করি মঙ্গল-সাধন॥ ২৮
ভুবন ঈশ্বরী নাম সর্ব্বত্র প্রচার। ২৯
শুভঙ্করী নামে হয় শুভের সঞ্চার॥ ৩০

ছিন্নমস্তা নামে আমি দানবে সংহারি। ৩১
মহিষমর্দ্দিনী নাম রণমাঝে ধরি ॥ ৩২
ষোড়শী নামেতে আমি সদা বিরাজিতা। ৩৩
আর এক নাম মম শ্রীঅপরাজিতা ॥ ৩৪
দৈত্যযুদ্ধমাঝে নাম ধরি উগ্রচণ্ডা। ৩৫
দুষ্টের দমনকালে নাম মোর চণ্ডা ॥ ৩৬
বিরিঞ্চিনন্দিনী নামে পাপ নাশ করি। ৩৭
শিব-সীমন্তিনী নামে শিবসহচরী ॥ ৩৮
মহেশঘরণী মোরে বলে ভক্তগণ। ৩৯
চন্দ্রচূড়া নামে করি চন্দ্রেরে ধারণ ॥ ৪০
হররাণী নাম মোর হরের আদরে। ৪১
কামাখ্যা আমার নাম কোচবধূপুরে ॥ ৪২
এক নাম হয় মোর মৃগেশবাহিনী। ৪৩
সর্ব্বত্র পূজিতা হই শ্যামা নামে আমি ॥ ৪৪
এলোকেশী নাম মম জগতে প্রচার। ৪৫
শবাসনা নামে পূজা পাই সবাকার ॥ ৪৬
দিগম্বরী নাম করি আনন্দে ধারণ। ৪৭
পতিতপাবনী নামে পতিতে তারণ ॥ ৪৮
দক্ষরাজ ঘরে থাকি দাক্ষায়ণী নামে। ৪৯
শমনত্রাসিনী নামে শমন ভবনে ॥ ৫০
অরিষ্টনাশিনী নামে অরিষ্টরে নাশি। ৫১
সুখদাত্রী নামে সদা সুখনীরে ভাসি ॥ ৫২
দয়াময়ী নামে করি দয়া বিতরণ। ৫৩
নরকবারিণী নামে নরক-বারণ ॥ ৫৪
পর্ব্বত-তনয়া বলি আখ্যান পার্ব্বতী ॥ ৫৫
শাকম্ভরী নাম মম খ্যাত বসুমতী ॥ ৫৬
গুণের আধার বলি নাম গুণাত্মিকা। ৫৭
জগতের মাতা তাই আখ্যান অম্বিকা ॥ ৫৮
বিমলা নামেতে করি চিত্তমল দূর। ৫৯
অভয়া নামেতে রক্ষা করি সুরপুর ॥ ৬০
হরের ঘরণী বলি নাম ভবরাণী। ৬১
শঙ্কর-সুন্দরী নামে ভজি শূলপাণি ॥ ৬২
দানবদলনী নাম দানবে বধিয়া। ৬৩
মন্মথমথিনী নাম মদনে শাসিয়া ॥ ৬৪
অশিব-খণ্ডিকা নামে অশুভ বিনাশি। ৬৫
দানবসূদনী নামে দৈত্যগণে শাসি ॥ ৬৬
মেনকা-দুলালী নাম রাখিলা মেনকা। ৬৭
বিজয়া নামেতে আমি অশিব-খণ্ডিকা ॥ ৬৮
গোপেশকুমারী নাম গোকুল নগরে। ৬৯
গোবিন্দ-ভগিনী নামে ছলিনু কংসেরে ॥ ৭০
যোগেশ-যোগিনী নাম যোগীর গোচর। ৭১
মৃগাঙ্ক-বদনী নাম শশাঙ্ক-নগর ॥ ৭২
গোমাতা নামেতে আমি রক্ষি গো গোধন। ৭৩
গান্ধারী নামেতে করি আর্ত্তেরে পালন ॥ ৭৪
দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসি নাম যজ্ঞবিনাশিনী। ৭৫
হিমালয়ে জন্মি তাই গিরিশ-নন্দিনী ॥ ৭৬
নৃমুণ্ডমালিনী নাম নৃমুণ্ড ধরিয়া। ৭৭
কপালিনী নাম ধরি আনন্দে মজিয়া ॥ ৭৮
শিবের প্রেয়সী বলি নাম শিবদারা। ৭৯
কপালমালিকা নামে কালভয়হরা ॥ ৮০

কালরাত্রি নামে করি কালেরে দমন। ৮১
ত্রিদিব-জননী নামে রক্ষি সুরগণ ॥ ৮২
ভক্তিবিধায়িনী নামে ভক্তি দান করি। ৮৩
সর্ব্বার্থসাধিনী নামে অনর্থ নিবারি ॥ ৮৪
লীলাবতী নামে করি লীলায় বিহার। ৮৫
চন্দ্রমুখী নাম খ্যাত বিশ্বের মাঝার ॥ ৮৬
অনুপমা নাম ধরি তন্ত্রের ভিতরে। ৮৭
সর্ব্বযোগেশ্বরী নাম যোগীর গোচরে ॥ ৮৮
কলুষনাশিনী নাম রাখে দেবঋষি। ৮৯
সখীগণপাশে আমি হই শ্যামা-শশী ॥ ৯০
বিকারবিহীনা মোরে বলে সিদ্ধগণ। ৯১
জলধি-নন্দিনী আমি জলধি-সদন ॥ ৯২
সত্যলোকে হই আমি সত্যস্বরূপিণী। ৯৩
আমিই কালের পাশে কাল-সীমন্তিনী ॥ ৯৪
বাঞ্ছা পূর্ণ করি বলি বাঞ্ছাদাত্রী নাম। ৯৫
গুণময়ী নাম মোর খ্যাত সর্ব্বধাম ॥ ৯৬
অমলা নামেতে আমি খ্যাত চরাচরে। ৯৭
অজয়া নামেতে খ্যাত পাতাল নগরে ॥ ৯৮
অষ্টকলা নামে ডাকে ভুজঙ্গমগণ। ৯৯
তক্ষকেশী নাম মোর তক্ষক-সদন ॥ ১০০
কর্কোটক নাগ মোরে কর্কটেশী কয়। ১০১
ধনঞ্জয়েশ্বরী নাম কহে ধনঞ্জয় ॥ ১০২
মহাপদ্ম নাগ ডাকে পদ্মেশ্বরী বলি। ১০৩
কুলীর-ঈশ্বরী বলি ডাকে মোরে কুলী ॥ ১০৪
শঙ্খেশ্বরী নাম রাখে শঙ্খ ভুজঙ্গম। ১০৫
ডাকিনীদমনী কহে ডাকিনীর গণ ॥ ১০৬
হাকিনীগণেরা কহে হাকিনী-ঈশ্বরী। ১০৭
ডামর তন্ত্রেতে নাম জানিবে ডামরী ॥ ১০৮
অষ্টোত্তর-শতনাম করিনু কীর্ত্তন।
জয়া বিজয়া এবে-করিলে তো শ্রবণ ॥

## ফলশ্রুতি

অষ্টোত্তর-শতনাম করিলে শ্রবণ।
ভক্তিভরে কিম্বা যদি করে অধ্যয়ন ॥
শোক তাপ কভু নাহি থাকে তার ঘরে।
রাজভয় ব্যাধিভয় চলি যায় দূরে ॥
দীর্ঘজীবী হয় ইহা করিলে শ্রবণ।
অন্তকালে গতি তার অমর-ভবন ॥
শমন তাহার পাশে আসিতে না পারে।
ডঙ্কা মারি যায় চলি ভবপারাপারে ॥
তাই বলি ভক্তি করি শুন সর্ব্বজন।
দুর্গা দুর্গা বলি কর সফল জীবন ॥

সমাপ্ত

ঋণ-স্বীকার :—
পণ্ডিত শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সঙ্কলিত ও অক্ষয় লাইব্রেরী, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯ প্রকাশিত, শ্রীশ্রীদুর্গার অষ্টোত্তর শতনাম থেকে সংগৃহীত।

## গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থাবলী—

ছোটদের প্রণবানন্দ

সংক্ষেপে যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজীর জীবন ও তাঁর সঙ্ঘের কর্ম-পরিচিতি

শ্রীরাম-চরিত্রে পাঁচটি প্রশ্ন

কাশী-মাহাত্ম্য ও কাশীতীর্থের কথা

উপনিষদের গল্পগুচ্ছ

চরিত্রগঠনে চাই ধর্মশাস্ত্র

শ্রীশ্রীপ্রয়াগ মাহাত্ম্য ও প্রয়াগকৃত্য

হিন্দু মিলন মন্দির

প্রশ্নোত্তরে প্রণবানন্দ

হিন্দু রক্ষিদল

জপ-প্রসঙ্গ

রুদ্রাক্ষ মহিমা

শ্রীশ্রীতুলসী মহিমা

শ্রীশ্রীচণ্ডী (নিত্যসাথী)

শ্রীক্ষেত্র-মহিমা ও শ্রীক্ষেত্র-সংবাদ

প্রয়াগ মাহাত্ম্য (ওড়িয়া)

স্বামী প্রণবানন্দজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী (ওড়িয়া)

ভক্তশিরোমণি শ্রীশ্রীহনুমান

পুরুষসিংহ শ্রীচৈতন্য

সিউড়ী শাখার ইতিবৃত্ত

শ্রীশ্রীএকাদশী মহিমা

শ্রীশ্রীশালগ্রাম ও শঙ্খ-মাহাত্ম্য

ওঁ নমঃ শিবায়

Pranavananda for Juniors

In short life of Pranabananda

बच्चों के प्रणवानन्द

युगाचार्य स्वामी प्रणवानन्दजी महाराज की जीवनी तथा उनके संघ की गतिविधियां